মানুষের ইতিহাস

আধুনিক ইউরোপ

১৪৫৩-১৬৪৮

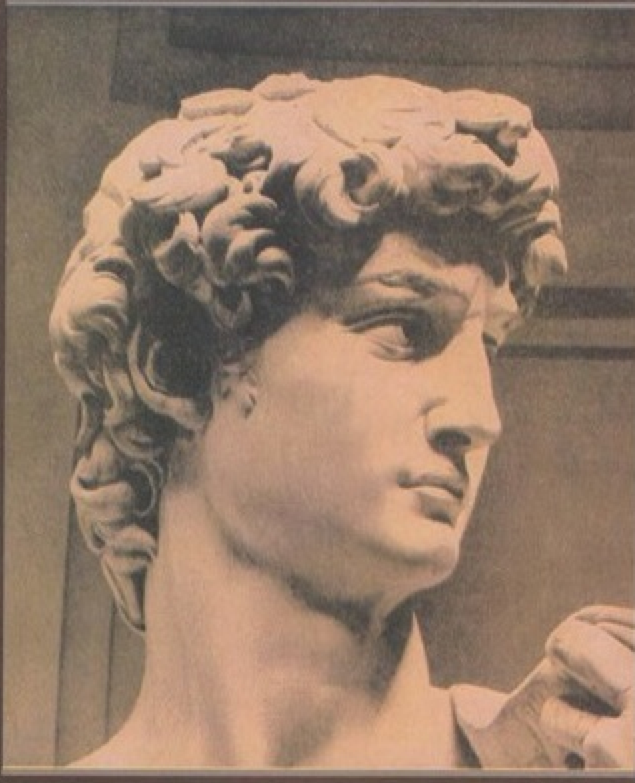

আবদুল হালিম | নূরুন নাহার বেগম

মানুষের ইতিহাস : আধুনিক ইউরোপ
(১৪৫৩–১৬৪৮)

www.icsbook.info

প্রথম প্রচ্ছদের ছবি : ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে মাইকেল এঞ্জেলো কর্তৃক নির্মিত ভাস্কর্য
শেষ প্রচ্ছদের ছবি : লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির দুটি শিল্পকর্ম *উপরে* দি ভারজিন অব দি রকস্ *মাঝে* মোনালিসা। *নিচে* তিজিয়ান-এর (১৪৭৭-১৫৭৬) পোপ ৩য় পল এবং তার দুই ভাগিনা।

www.icsbook.info

মানুষের ইতিহাস : আধুনিক ইউরোপ
(১৪৫৩–১৬৪৮)

আবদুল্ল হালিম
নূরুন নাহার বেগম

আগামী প্রকাশনী

www.icsbook.info

মানুষের ইতিহাস : আধুনিক ইউরোপ (১৪৫৩–১৬৪৮)

প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪১২ অক্টোবর ২০০৫
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
স্বত্ব নূরুন নাহার বেগম
প্রচ্ছদ মানবেন্দ্র সুর
বানান সমন্বয় আলমগীর সোবহান
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা
মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Manusher Itihas : Adhunik Europe :: (1453-1648)
by Abdul Halim & Nurun Nahar Begum
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
e. mail : agamee@bdonline.com
First Published in October 2005
Price : Tk. 150.00

ISBN 984 401 877 3

www.icsbook.info

উৎসর্গ

বাংলাদেশের অগণিত তরুণদের জন্য
যারা এ বইটি পাঠে উপকৃত হবে
বলে আশা রাখি।

www.icsbook.info

অলরিচ জিংলির পোট্রেট (১৪৮৪-১৫৩১)

মার্টিন লুথার, মেলচিয়র লর্ক ১৫৪৮

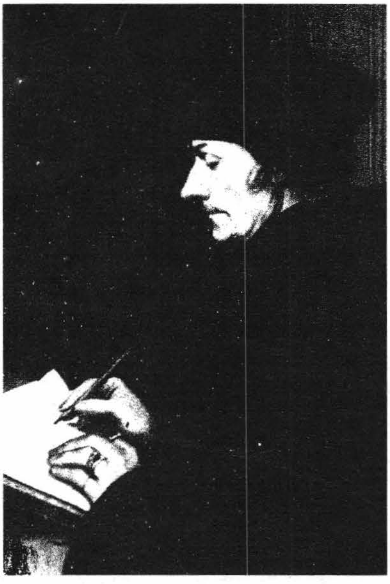

এরাসমাস, হ্যান্স হবলিন দ্য ইয়ংগার
(১৪৯৭-১৫৪৩)

জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪)

www.icsbook.info

ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ (১৭৮৯-১৯১৯) ইতোমধ্যেই তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান *মানুষের ইতিহাস : আধুনিক ইউরোপ* গ্রন্থটিতে ১৪৫৩ থেকে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এটির সম্পূর্ণ ইতিহাস ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত লেখা সম্ভব হলনা। এ গ্রন্থের অন্যতম লেখক অধ্যাপক আবদুল হালিম নয় ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল এ গ্রন্থটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত অবস্থায় দেখে যাওয়া। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় দুঃখ তাই রয়েই গেল।

এ গ্রন্থে ইউরোপের ইতিহাস কেবলমাত্র লিপিবদ্ধ করা হলেও এই সময়কালেই পৃথিবীর অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনাগুলো ঘটেছে। এ সময়কালেই ইউরোপ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সংঘটিত হয়েছে ভৌগোলিক আবিষ্কার, রেনেসাঁ, ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মত প্রধান ঘটনা। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এ সময়েই শুরু হয় এবং ইউরোপ পুঁজিবাদে উত্তরণের স্বার্থে যেমন অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো ঘটিয়েছিল তেমনি সারা পৃথিবীকে উপনিবেশবাদের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। আজকের পৃথিবী সে সময়কালের পরবর্তী রূপ।

বইটি আশা করি ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে।

নূরুন নাহার বেগম

www.icsbook.info

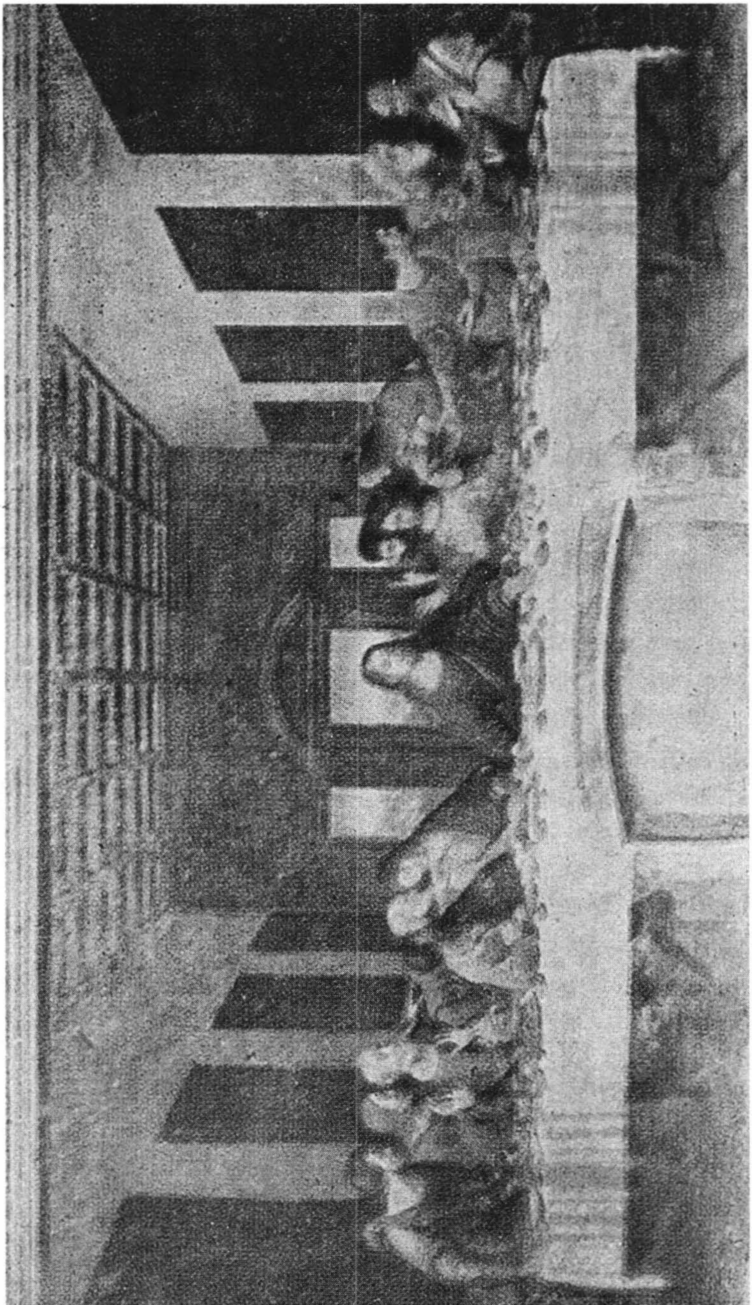

দি লাস্ট সাপার, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)

www.icsbook.info

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ১৭–২৬

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

(ক) শহরগুলোর উৎপত্তি (খ) ক্রুসেডের পরিণাম (গ) ম্যানরগুলোর ভাঙন (ঘ) শ্রম শক্তির অভাব (ঙ) এনক্লোজারের পরিণতি (চ) ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদের উন্মেষ, গিল্ডপ্রথা ও তার ভাঙন (ছ) অবাধ বাণিজ্যের বিকাশ (জ) ভৌগোলিক আবিষ্কার

২. সামাজিক পরিবর্তন

(ক) বার্গার বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ

৩. ধর্মীয় পরিবর্তন

(ক) পোপের ক্ষমতা হ্রাস : পোপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহিত্যে প্রতিবাদ (খ) প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন

৪. রাজনৈতিক পরিবর্তন

(ক) ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের জন্ম (খ) বুর্জোয়াদের ভূমিকা (গ) আঞ্চলিক ভাষা জাতীয় ভাষায় রূপান্তরিত (ঘ) শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিকাশ (ঙ) ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব (চ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ

৫. বিজ্ঞান ও কারিগরি আবিষ্কার

(ক) অশ্বশক্তির ব্যবহার (খ) পানি ও বায়ুকল (গ) জাহাজের হাল ও কম্পাস (ঘ) বারুদের আবিষ্কার (ঙ) কাচের আবিষ্কার (চ) কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র (ছ) ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌগোলিক আবিষ্কার ২৭–৪৭

১. ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ

অর্থনৈতিক কারণ (ক) প্রচলিত বাণিজ্যপথ (খ) বাণিজ্যদ্রব্য

২. কনস্টান্টিনোপলের পতন

৩. ইউরোপে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা

৪. ধর্মীয় কারণ

৫. অ্যাডভেঞ্চারের নেশা

৬. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার

ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযান

পর্তুগালের অভিযান । স্পেনের অভিযান

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার

কলম্বাসের অভিযান। ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার । অন্যান্য ভূখণ্ড আবিষ্কার । ম্যাগেলানের অভিযান

পর্তুগাল ও স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন

পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

আলবুকার্ক । এশিয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশ । আফ্রিকায় পর্তুগিজ উপনিবেশ।

www.icsbook.info

স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য
মেক্সিকো দখল ॥ পেরু দখল ॥ আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, চিলি ও ইকুয়েডর দখল ॥
ফিলিপাইনে ইউরোপীয়করণ
ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অভিযান
ক্যাবটের অভিযান ॥ জন হকিন্সের অভিযান
ফ্রান্সের ভৌগোলিক অভিযান
ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল
অর্থনৈতিক ॥ বণিক পুঁজিবাদের জন্ম ॥ গিল্ডপ্রথার ভাঙন : অবাধ বাণিজ্য ॥
সামাজিক ফলাফল
বার্গারশ্রেণীর জন্ম
রাজনৈতিক ফলাফল
গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা সংগ্রাম
সাংস্কৃতিক ফলাফল
রেনেসাঁর জন্ম

তৃতীয় অধ্যায়
ধনতন্ত্রের বিকাশ ৪৮–৫৭
ধনতন্ত্রের উন্মেষস্থল : ইতালি
ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা : পর্তুগাল ও স্পেন
ধনতন্ত্রের প্রথম প্রয়োগ : নেদারল্যান্ডস
ধনতন্ত্রের সফল জন্মভূমি : ইংল্যান্ড

চতুর্থ অধ্যায়
রেনেসাঁ বা নবজাগরণ ৫৮–৮১
রেনেসাঁর অর্থ :
ক. ইহজাগতিকতা খ. মানবতাবাদ গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ঘ. সৌন্দর্যবোধ
ঙ. বিজ্ঞানমনস্কতা
ইতালির রেনেসাঁ
ইতালিতে রেনেসাঁর উৎপত্তির কারণ
ইতালির রেনেসাঁ-যুগের শিল্পকলা (চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য)
চিত্রশিল্প
Trecento যুগ ॥ Quttrocento যুগ ॥ ম্যাসাচ্চিও ॥ সান্দ্রো বত্তিচেল্লি ॥ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি॥ টিশিয়ান, গির্গিওন, তিনতোরেত্তো ॥ রাফায়েল ॥ মাইকেল এঞ্জেলো ॥
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য
দোনাতেল্লো ॥ মাইকেল এঞ্জেলো ॥
রেনেসাঁর সাহিত্য
দান্তে ॥ পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭০) ॥ বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫) ॥
অন্যান্য সাহিত্য
মহাকাব্য ॥ নাটক ॥
ইতিহাস
রেনেসাঁর বিজ্ঞান
রেনেসাঁর মূল্যায়ন
রেনেসাঁর সীমাবদ্ধতা

www.icsbook.info

পঞ্চম অধ্যায়
ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ৮২–৯৯
ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ
১. চার্চের দুর্নীতি :
(ক) পোপের বিলাসিতা (খ) নিয়ুক্তিপত্র বিক্রয় (গ) অবৈধ বিবাহ সম্পর্কিত ফি (ঘ) পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রি (ঙ) চার্চের জাঁকজমক (চ) পবিত্রবস্তু প্রদর্শন (ছ) মঠের দুর্নীতি
২. মতাদর্শগত কারণ
৩. রাজনৈতিক কারণ
(ক) জাতীয় চেতনার উন্মেষ (খ) পোপের বিরুদ্ধে রাজার বিরোধিতা
৪. অর্থনৈতিক কারণ
(ক) চার্চ ও মঠের সম্পত্তি দখল (খ) পোপের বিভিন্ন কর ও সম্পদ বাইরে পাচার
৫. প্রত্যক্ষ কারণ
জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল?
ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও মার্টিন লুথার
পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রি ॥ লুথারের পঁচানব্বইটি থিসিস ॥ লুথারের বিরুদ্ধে পোপের বুল ॥
মার্টিন লুথারের ধর্মমত
কৃষকবিদ্রোহ :
জুইংলি ও ক্যালভিন মতবাদ
জন ক্যালভিন
ক্যালভিনের ধর্মমতের সারকথা
লুথার ও ক্যালভিনের মতবাদের পার্থক্য

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার বা ধর্মীয় প্রতিসংস্কার ১০০–১১৩
প্রতিসংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ-সংগঠন
১. ট্রেন্ট এর সাধারণ সভা
কার্যাবলী ॥ পুস্তকের তালিকা (Index) প্রস্তুত করা
২. ধর্মীয় আদালত (ইনকুইজিশন)
কার্যাবলী :
৩. যিশুর সমিতি (Society of Jesus)
লয়োলার জীবনী ও কার্যাবলী ॥ জেসুইটদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
জেসুইটদের সাফল্য
জেসুইট সংঘের অবসান

সপ্তম অধ্যায়
স্পেনের ইতিহাস ১১৪–১২৫
পঞ্চম চার্লস
চার্লস-এর শৈশব
স্পেনের সিংহাসনে পঞ্চম চার্লস
চার্লস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
চার্লস-এর নীতি
পঞ্চম চার্লস-এর জার্মানি গমন ॥ পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ॥ ফরাসিদের বিরুদ্ধে
পঞ্চম চার্লস-এর লড়াই
স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার যুদ্ধ
ইতালিতে চার্লস এর সৈন্যদের তাণ্ডব

www.icsbook.info

তুরস্কের সাথে বিরোধ
পঞ্চম চার্লস এর অবসরগ্রহণ
দ্বিতীয় ফিলিপ
স্পেনের উপনিবেশের স্বরূপ

অষ্টম অধ্যায়
নেদারল্যান্ডস-এর ইতিহাস ১২৬–১৪৩
নেদারল্যান্ডস-এর পরিচয়
নেদারল্যান্ডস-এর অর্থনীতি
নেদারল্যান্ডস এর স্বাধীনতাযুদ্ধ
ক. রাজনৈতিক কারণ খ. অর্থনৈতিক কারণ গ. ধর্মীয় কারণ ঘ. ব্যক্তিগত বিষয় : এন্টওয়ার্পে বিদ্রোহ
ডিউক অব আলভা
ওলন্দাজদের সাফল্যের কারণ
নেদারল্যান্ডস-এর পরবর্তী ইতিহাস
নেদারল্যান্ডস্-এর উপনিবেশ বিস্তার
নেদারল্যান্ডস প্রজাতন্ত্রের অবসান

নবম অধ্যায়
ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ ১৪৪–১৫৭
কনকরডাট-এর ফলাফল
সম্রাট চতুর্থ হেনরি
ডিউক অফ সালি
সালির অর্থ ব্যবস্থা
উপনিবেশ স্থাপন

দশম অধ্যায়
চতুর্থ হেনরি-পরবর্তী ফ্রান্স ১৫৮–১৬৭
কার্ডিনাল রিশল্যু
রিশল্যুর উদ্দেশ্য। হিউগনোদের দমন। অভিজাতদের দমন। শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন।
রিশল্যুর বৈদেশিক নীতি
রিশল্যুর কৃতিত্ব
ম্যাজারিন
প্রথম ফ্রন্ড বিদ্রোহ। দ্বিতীয় ফ্রন্ড বিদ্রোহ। ম্যাজারিনের ব্যর্থতা

একাদশ অধ্যায়
ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ১৬৮–১৭৫
যুদ্ধের কারণসমূহ
প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সূত্রপাত
বোহেমিয়ান পর্ব। ডেনিশ পর্ব। সুইডিশ পর্ব। ফরাসি পর্ব।
যুদ্ধের ফলাফল
(ক) ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি (খ) মূল্যায়ন (গ) আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি
(ঘ) আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম

www.icsbook.info

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির আঁকা কয়েকটি স্কেচ

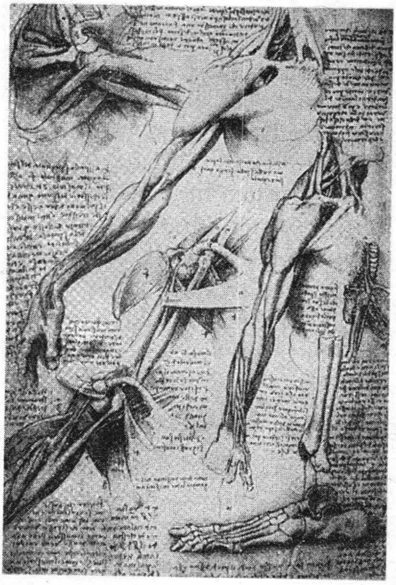

সৈন্য প্রশিক্ষণ

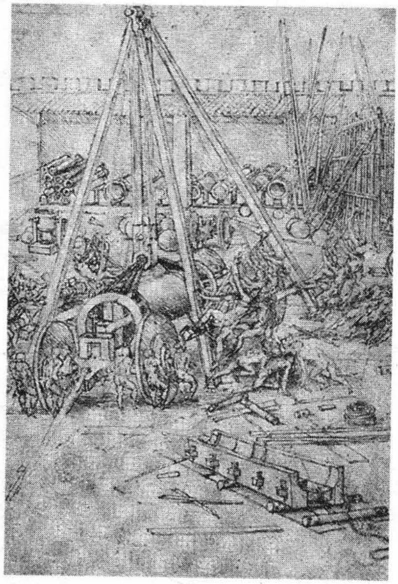

কামান কারখানা

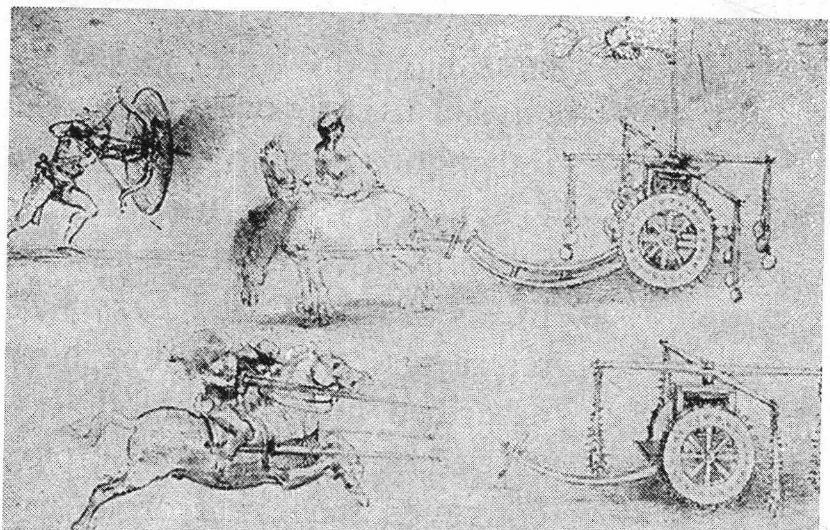

যুদ্ধ সরঞ্জাম

www.icsbook.info

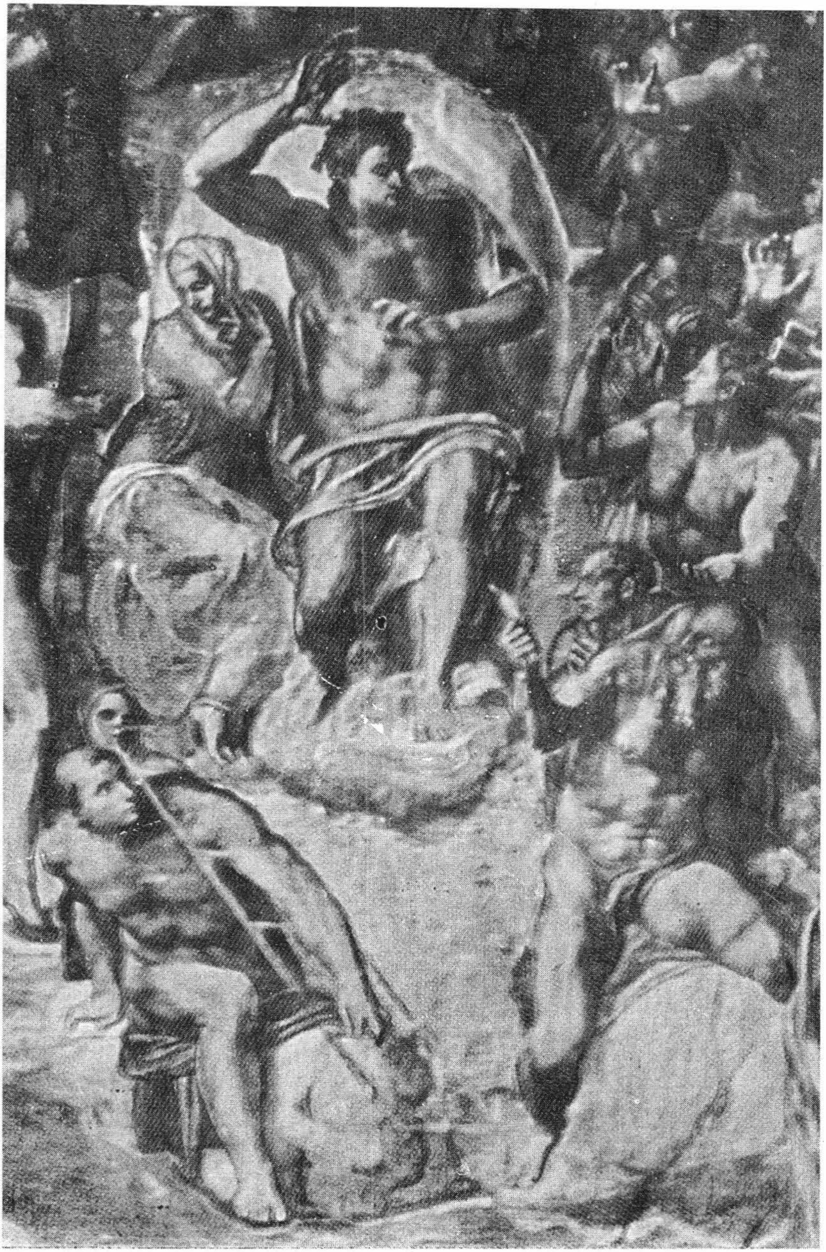

শেষ বিচার, মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)

www.icsbook.info

ম্যাডোনা, র‍্যাফেল (১৪৮৩-১৫২০)

পিয়েতা, মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)

www.icsbook.info

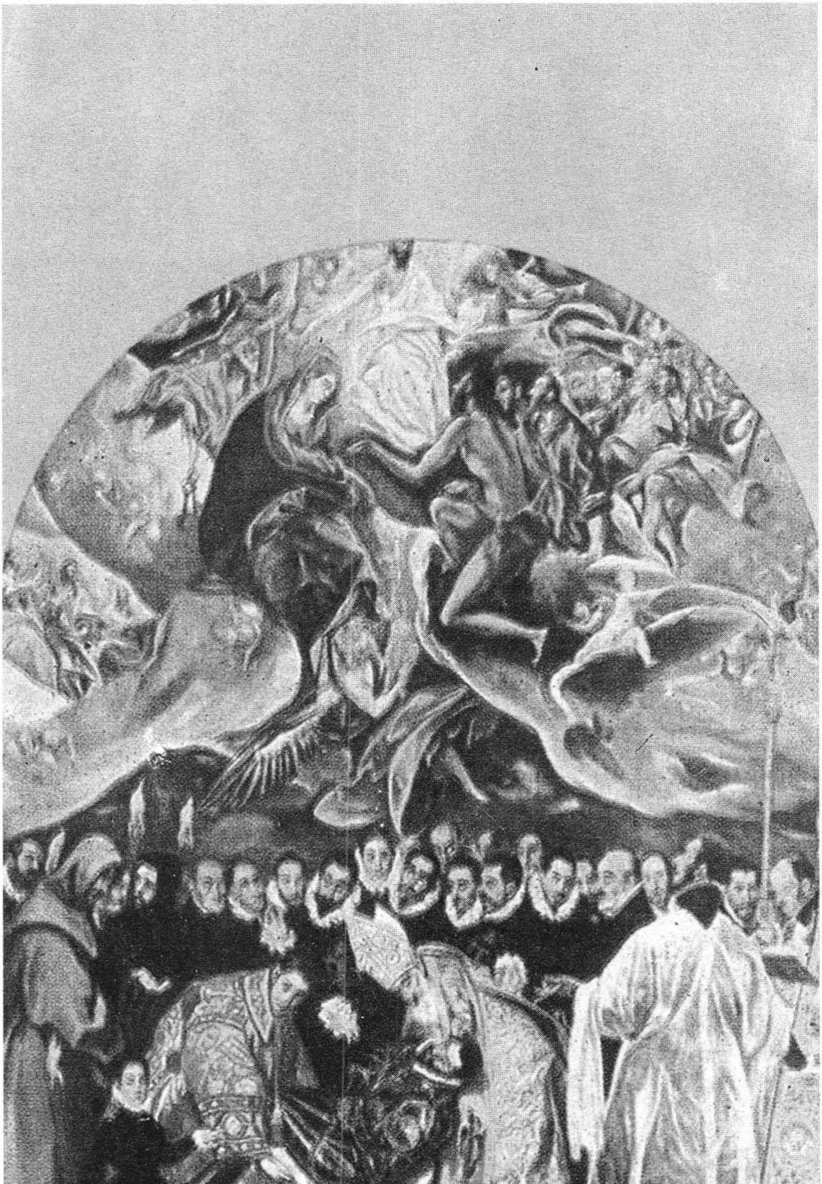

কাউন্ট অরগাজ এর সমাধিস্থল, এল গ্রীকো (১৫৪১-১৬১৪)

www.icsbook.info

প্রথম অধ্যায়
মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইউরোপের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, কারিগরি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ইতিহাসের এই সময়কালকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্রান্তিকাল বলা হয়।

এ দীর্ঘ সময়ে যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন সূচিত হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। মধ্যযুগের বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্তপ্রথার অবসান ঘটাতে শুরু করে। সামন্তপ্রথার ভাঙন অবশ্য অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রথমত শহরগুলোর উৎপত্তির মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয়ত দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের ব্যাপক অভিযানের ফলে।

(ক) শহরগুলোর উৎপত্তি : মধ্যযুগের শহরগুলো যদিও প্রথমে সামন্তপ্রভুদের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই গড়ে উঠেছিল, তথাপি দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শহরবাসীরা নিজেদের ক্রমশ সামন্তপ্রভুদের অধীনতা থেকে মুক্ত করে নেয়। সামন্তপ্রভুদের ম্যানর অর্থনীতির বাইরে এক নতুন অর্থনীতির উন্মেষ ঘটতে থাকে। গিল্ডপ্রথার কঠোর নিয়ন্ত্রণে শহরগুলোতে যে নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে, তার মূল উদ্যোক্তা ছিল কারিগর ও ধনিকরা। এরা নতুন ধরনের অর্থনীতি তথা ধনতন্ত্রের প্রথম সূত্রপাত ঘটায়।

(খ) ক্রুসেডের পরিণাম : দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র আর এক ধাপ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়। প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদনার বশবর্তী হয়ে ইউরোপের সকল শ্রেণীর জনগণ এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। প্রাচ্যের মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম নগরী উদ্ধারের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সকল সুফল লাভ করা যাবে —ধর্মগুরু পোপের এই বাণীতে ইউরোপের প্রায় সকল খ্রিস্টানই আস্থা স্থাপন করেছিল। সামন্তপ্রভুদের সীমাহীন শোষণ থেকে মুক্তিলাভ এবং ে ্সাথে নূতন দেশে

www.icsbook.info

জমিদখল করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আগ্রহে অসংখ্য ভূমিদাস এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অধিকাংশই পথিমধ্যে এবং যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর ফলে ভূমিদাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ম্যানর অর্থনীতির মূলভিত্তিই প্রায় ধসে পড়ে। একই সাথে ইউরোপের অনেক সামন্তপ্রভুও এই অভিযানে অংশ নেন নূতন অধিকৃত ভূখণ্ডে ভূমি দখল করে সেখানে সামন্ত-অর্থনীতি প্রবর্তনের দ্বারা নিজেদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করার আশায়। এঁদের অনেকেই অভিযানের অর্থ সংগ্রহের জন্য নগদ অর্থপ্রাপ্তির আগ্রহে ভূমিদাসের কাছ থেকে এককালীন অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের অনেককেই মুক্ত করে দেন। অনেকে আবার গোটা জমিদারি বিক্রি করে দেন স্থানীয় অন্য কোন ভূস্বামী বা রাজার কাছে। ধর্মযুদ্ধে এঁদের অধিকাংশই নিহত হন। যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁরা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে আসেন। এর ফলেও সামন্তপ্রথা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) ম্যানরগুলোর ভাঙন : ক্রুসেডের মাধ্যমে প্রাচ্যদেশগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে এসব দেশ থেকে প্রচুর বিলাসদ্রব্যের আমদানি হতে থাকে। সামন্তপ্রভুদের মধ্যে বিলাসিতার পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে তাঁরা বিলাসদ্রব্য কেনার জন্য নগদ অর্থপ্রাপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা এখন ভূমিদাসদের কাছ থেকে কৃষিপণ্যরূপে কর আদায়ের পরিবর্তে নগদ অর্থে কর আদায়ে অধিকতর আগ্রহী হন। কৃষিকার্যের অগ্রগতির দরুন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের হাতেও কিছু নগদ অর্থ জমতে থাকে। এর ফলে কিছু সম্পন্ন ভূমিদাস জমিদারের সাথে নগদ অর্থে কর প্রদানের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নেয়। এরা এখন ফ্রি-টেনান্ট বা স্বাধীন রায়ত নামে পরিচিত হয়। নগদ অর্থ প্রদানের ফলে এরা অন্যান্য সামন্তবন্ধন থেকেও মুক্তিলাভ করে। সপ্তাহে দু দিন বা তিন দিন বেগার খাটার হাত থেকে তারা অব্যাহতি লাভ করে। জমিদারের অনুমতি ছাড়া ম্যানর ত্যাগ করা, ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়া বা গবাদি পশু বিক্রি করা— প্রভৃতির অধিকারও তারা প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) শ্রম শক্তির অভাব : নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা অনেক ভূমিদাস শহরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। অনেকে আবার পালিয়েও শহরে চলে যায়। একবার চলে গেলে তাদের আর ধরে আনা সম্ভব হয় না। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্লেগ রোগের (কালো মৃত্যু) ব্যাপক আক্রমণের ফলে ইউরোপের জনশক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। একমাত্র ইংল্যান্ডেই এক-তৃতীয়াংশ লোক এই রোগে মৃত্যুবরণ করে।

এর ফলে শ্রমশক্তির অভাব ঘটে। সার্ফদের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে জমিদারদের ম্যানর থেকে আয়ও কমে যেতে থাকে। এর ফলে, ম্যানরের অবশিষ্ট ভূমিদাসদের উপর জমিদাররা তাঁদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এসব হতভাগ্য ভূমিদাসরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এবং উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটুকুই সামন্তপ্রভুর হাতে তুলে দিয়েও তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। ফলে এরা ক্রমশ তাদের অধীনস্থ জমিখণ্ডটি হারাতে থাকে। শুধুমাত্র মাথা গোঁজার জন্য কুঁড়েঘরখানাকে আশ্রয় করে এরা জমিদারের জমিতে ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হয়।

www.icsbook.info

(ঙ) এনক্লোজারের পরিণতি : ষোড়শ শতাব্দীর দিকে পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসপ্রথা ভূমিদাস এবং জমিদার কারও পক্ষেই আর লাভজনক থাকে না। জমিদাররা ভূমিদাস নিয়োগের পরিবর্তে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগই অধিকতর লাভজনক বলে মনে করে। ইংল্যান্ডে অনেক জমিদার আবার ম্যানরগুলো থেকে সরাসরি প্রজাদের উচ্ছেদ করে সেগুলোকে বেড়া দিয়ে (Enclosure) ঘিরে ভেড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশুর চারণক্ষেত্রে পরিণত করেন। ভেড়া থেকে উৎপন্ন পশমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমিদাররা ক্রমশ এদিকেই মনোনিবেশ করেন। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই ইংল্যান্ড থেকে ভূমিদাসপ্রথা একপ্রকার উচ্ছেদ হয়ে যায়। ফ্রান্সে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক ভূমিদাস মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করে নিলেও অনেক স্থানে ভূমিদাসপ্রথা পুরো শক্তিতে বহাল রইল। একই ভাবে স্পেনেও জমিদারদের ম্যানরে আটকে রইল বহুসংখ্যক কৃষক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে প্রুশিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং রাশিয়াতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভূমিদাসপ্রথা আরও জোরদার হল।

অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে ম্যানর থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ভূমিদাসরা এখন শহরে গিয়ে ভিড় জমাল। এদের কেউ কেউ কারিগরি পেশাকে অবলম্বন করলেও এবং অন্যরা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলেও বিপুল সংখ্যক অবশিষ্ট লোকজন নিঃস্ব ভবঘুরেতে পরিণত হয়ে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব সংঘটিত না-হওয়া পর্যন্ত এ উদ্বৃত্ত জনগণের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ভবঘুরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে শেষপর্যন্ত এদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন তৈরি করতে হয়।

(চ) ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদের উন্মেষ, গিল্ডপ্রথা ও তার ভাঙন : সামন্তপ্রথা একদিকে যেমন ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আরেক দিকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল আরেকটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার নাম ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। মধ্যযুগের শেষের দিকে শহরগুলো গড়ে ওঠার সাথে কারিগরশ্রেণী ম্যানরের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারিগররা নিজেরাই গড়ে তোলে বিভিন্ন কারিগরি গিল্ড। শহরগুলো ছিল গিল্ডের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। গিল্ডগুলো শহরের কারিগরি ও বাণিজ্যিক, উভয় দিকই নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে গিল্ডপ্রথার কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে কারিগরি কৌশলের আর কোনো অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাণিজ্যের উপর গিল্ডগুলো কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে এরা ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে বণিকদের সাথে গিল্ড মাস্টারদের সংঘাতের সৃষ্টি হল। পরিণামে অবশ্য বণিকরাই জয়লাভ করল। ষোড়শ শতাব্দীর পরে গিল্ডের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপের অর্থনীতি অবাধ পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ পুঁজিবাদকে বলা হয় বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ। ইউরোপের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক বিস্তৃতির উপর এ পুঁজিবাদ ছিল পুরোপুরি নির্ভরশীল।

www.icsbook.info

(ছ) অবাধ বাণিজ্যের বিকাশ : ক্রুসেডের মাধ্যমে প্রাচ্যদেশগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ইউরোপের বহির্বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন ধরনের বিলাসদ্রব্যে ইউরোপের বাজার ছেয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী নগর-বন্দরগুলো, যেমন ইতালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে।

(জ) ভৌগোলিক আবিষ্কার : ইউরোপের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরও প্রসারিত হয় অন্য দুটি কারণে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হয় এবং পরে সমগ্র মহাদেশ ইউরোপীদের দখলে আসে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

এর ফলে ইউরোপের বাণিজ্যকেন্দ্রস্থল ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হয়। নূতন ভূখণ্ড অধিকার এবং নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ প্রচুর ধনরত্ন ও অন্যান্য সম্পদের অধিকারী হয়। স্পেন, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের হাতে কুক্ষিগত হয় অজস্র সম্পদ। এ সম্পদ শুধুমাত্র বিলাসদ্রব্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সোনা, রুপা থেকে শুরু করে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পেতে লাগল। সামগ্রিকভাবে যুগটাই ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ। ইউরোপের সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেল—শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রেই নয়, কৃষিক্ষেত্রেও। শস্যের উৎপাদন, গবাদি পশু ও মাছের উৎপাদন বেড়ে গেল প্রচুর পরিমাণে। সেইসাথে উন্নতি হতে লাগল শিল্প ও কৃষিযন্ত্রের। বস্তুত এসকল ক্ষেত্রে কারিগরি উন্নতি ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিদেশ থেকে আনীত কাঁচামালেও ইউরোপের বাজারগুলো ছেয়ে গেল। তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল ইউরোপের কুটিরশিল্পে ব্যবহৃত হতে থাকল। উৎপাদিত হল বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত সময়কাল ইউরোপের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের কালরূপে পরিচিত। এ সময়ের মধ্যে সামন্ত অর্থনীতির গণ্ডি কাটিয়ে ইউরোপ ক্রমশ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করল।

২. সামাজিক পরিবর্তন

সামন্তপ্রথা ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে ইউরোপের এতকালের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও ভেঙে যেতে থাকে। সামন্তপ্রভু ও তাঁদের ভ্যাসালদের মধ্যকার আনুগত্য ও কর্তব্যের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সামাজিক শক্তি হিসাবে সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা ক্রমশ খর্ব হয়। অন্যদিকে ভূমিদাসপ্রথার অবক্ষয়ের সাথে সাথে কৃষকশ্রেণীও আগের মতো সামাজিকশ্রেণী হিসাবে টিকে রইল না।

(ক) বার্গার বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ : সামন্তশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্য দিয়ে আরেকটি নূতন শ্রেণীর জন্ম হল। এর নাম বার্গারশ্রেণী। নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ-শ্রেণীর জন্ম দেয়। ফ্রান্সে এ-শ্রেণীর নাম হল বুর্জোয়া (Bourgeoisie)। সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণীকেই বুর্জোয়া বলা হলেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্রমিক,

www.icsbook.info

কারিগর, ছোটখাটো কারখানার মালিক, দোকানদার, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত শহরবাসী।

এ শ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনো উপায়ে অর্থবান হওয়া। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে অর্থসঞ্চয়ই ছিল এ বুর্জোয়া বা বার্গারশ্রেণীর লক্ষ্য।

প্রথমদিকে এ-শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে কৃষকসমাজের মধ্য থেকে। পরবর্তীকালে শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে সামন্তসমাজও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নূতন শ্রেণীই ইউরোপের নবজাগরিত শক্তি। অর্থ, সৈন্য ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করে এরাই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ রাজশক্তিকে সাহায্য করে। নবোদিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এরাই মূল ধারক ও বাহক। এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও চিন্তাবিদ। মধ্যযুগের ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে এঁরাই জন্ম দিয়েছিলেন নূতন চিন্তা, নূতন ভাবনা ও নূতন চেতনার। এই চিন্তা জাগতিক চিন্তা (secular)। এ চেতনার নাম গণতান্ত্রিক চেতনা।

৩. ধর্মীয় পরিবর্তন

মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা নিয়ে ইউরোপের সকল শ্রেণীর লোকের মনোজগতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যযুগের শেষদিকে পবিত্র রোমান সম্রাট ও পোপের মধ্যকার সংঘর্ষের ফলে উভয়ের শক্তিই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পোপ এ হৃতশক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের ডাক দেন। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে পোপ তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ পোপ অষ্টম বনিফেস-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বনিফেস-এর উত্তরাধিকারী পঞ্চম ক্লিমেন্ট রোম থেকে পোপের কার্যালয় ফ্রান্সের এভিগনন-এ নিয়ে আসেন। 'ব্যাবিলনীয় বন্দীদশা' নমে পরিচিত প্রায় সত্তর বছরব্যাপী (১৩০৫-৭৭) সময়কালে পোপরা সম্পূর্ণভাবে ছিলেন ফ্রান্সের রাজাদের অধীনে।

(ক) পোপের ক্ষমতা হ্রাস : পোপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহিত্যে প্রতিবাদ : ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে পোপের কার্যালয় আবার রোমে স্থানান্তরিত হলেও মহাবিভেদ (Great Schism) নামে পরিচিত বিরাট কলহে পোপরা আবার নিমগ্ন হলেন (১৩৭৩-১৪১৭ খ্রি.)। প্রথমে দুজন ও পরে তিনজন পোপ নিজকে প্রকৃত পোপ বলে দাবি করেন। অবশেষে পোপ পঞ্চম মার্টিনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কনস্ট্যান্স-এর কাউন্সিল এই বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু ততদিনে মানুষের মন থেকে পোপের ভাবমূর্তি অপসারিত হয়েছে। পোপের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য আর ফিরিয়ে আনা গেল না। উপরন্তু চার্চের দুর্নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে লোকজন এখন সমালোচনায় লিপ্ত হল। স্থানীয় সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটল। বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরন' ও চসার-এর 'ক্যান্টারবেরি

www.icsbook.info

টেল্‌স' পোপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশেষ দলিলরূপে পরিচিত। ইংল্যান্ডের ওয়াইক্লিফিট আন্দোলন ও জার্মানির বোহেমিয়ার হাসাইট আন্দোলন একাধারে ছিল গণআন্দোলন ও চার্চের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সরকারগুলো পোপের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। ইংল্যান্ডে চতুর্দশ শতাব্দীতেই পোপের ক্ষমতার বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট আইন পাস করে।

(খ) প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন : পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশ পোপের অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথারের প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় চরম আঘাত হানে এবং সমগ্র খ্রিস্টান জগতকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে দেয়।

৪. রাজনৈতিক পরিবর্তন

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এর একটি হল জাতীয় চেতনার উন্মেষ; আরেকটি, শক্তিশালী জাতীয় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা।

মধ্যযুগে সমগ্র খ্রিস্টান ইউরোপ ছিল পোপ এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মিলিত ছত্রছায়ায় আশ্রিত। সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপবাসী নিজেদের খ্রিস্টজগতের অধিবাসী এবং পবিত্র রোমান সম্রাটের প্রজা—এই দুই পরিচয়ে পরিচয় দিত। ল্যাটিন ভাষা ছিল সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপের শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের এবং জ্ঞানচর্চার সাধারণ ভাষা। ভাষার ঐক্য এলাকার জনগণকে মোটামুটি ভাবে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্ব-ইউরোপের অবস্থা ছিল অন্যরকম। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের অধীনস্থ পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসীগণ পোপের আধিপত্য স্বীকার করত না। ক্রুসেডের মাধ্যমে পোপ পূর্ব - ইউরোপের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও অচিরেই তা মিলিয়ে যায়। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের ক্ষীণ যোগসূত্র আবার ছিন্ন হয়ে যায়।

(ক) ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের জন্ম : জাতীয় চেতনার উন্মেষই জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। মধ্যযুগের শেষের দিকে বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ভাষাকে ভিত্তি করে জন্ম নেয় ভাষাভিত্তিক জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় চেতনা। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিচয় দিতে থাকে। এই জাতীয়তাবোধ একাধারে আঘাত হানে পোপতন্ত্রকে এবং অন্যদিকে সামন্তবাদকে।

সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপের ধর্মগুরু হিসাবে পোপ বিভিন্ন দেশ থেকে যে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন, অর্থ কর, সম্মানী ও উপঢৌকন বাবদ লাভ করতেন তা এখন কতকাংশে কমে গেল এবং অনেকাংশে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। রোমের পোপকে কর দেওয়ার অর্থ হল প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া। নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার এটা ঘোরতর পরিপন্থী। এ কারণেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চার্চকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অধীনে নিয়ে আসা হল।

www.icsbook.info

(খ) বুর্জোয়াদের ভূমিকা : জাতীয়তাবোধ সামন্ততন্ত্রকেও আঘাত হানে জাতীয়তাবোধের মূলশক্তি ছিল নবোদিত বার্গার বা বুর্জোয়া শ্রেণী। এদের বিকাশকে বাধা দিচ্ছিল সামন্তপ্রথা। বার্গাররা তাদের ব্যবসা চালাতে গিয়ে প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল সামন্তপ্রভুদের দ্বারা। স্থানে স্থানে কর দিতে গিয়ে, বিভিন্ন সামন্তপ্রভুর এলাকায় বিভিন্ন মুদ্রায় বেচাকেনা করতে গিয়ে এবং উপরন্তু সামন্ত নাইটদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। একক মুদ্রা, একক করব্যবস্থা এবং বার্গারদের স্বার্থে গঠিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে তারা জাতীয় চেতনাকে জোরদার করল। জাতীয়তাবোধ জন্ম দিল জাতীয় রাষ্ট্রের, জাতীয় রাজতন্ত্রের। কিন্তু এই জাতীয় চেতনাই আবার পথ খুলে দিল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হানাহানি ও সংঘর্ষের। প্রতিটি রাষ্ট্রের বণিকশ্রেণী চায় সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হতে। জাতীয় চেতনা জাতীয় পোশাক, রুচি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও বিশ্বাসের জন্ম দিল।

(গ) আঞ্চলিক ভাষা জাতীয় ভাষায় রূপান্তরিত : বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষা কোনো কোনো দেশের জাতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হল। ইতালিতে ফ্লোরেন্স-এর তাসকান ভাষা, ফ্রান্সে উত্তর-ফ্রান্সের আঞ্চলিক ভাষা, জার্মানিতে স্যাক্সনির ভাষা, স্পেনের ক্যাস্টিল-এর আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংল্যান্ডে পুরাতন ইংরেজি ও স্যাক্সন ভাষা একত্রিত হয়ে সেদেশের জাতীয় ভাষায় পরিণত হল। ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে এসকল জাতীয় ভাষায় সাহিত্য রচিত হল।

জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠার পর্বটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে জাতীয় চেতনা এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় যে ক্যাথলিক চার্চও একে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কনস্টান্সের কাউন্সিলে মাথাপিছু ভোটদান পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রভিত্তিক ভোটদান পদ্ধতি চালু হয়। আন্তঃইউরোপীয় ও আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যের সিংহভাগ করায়ত্ত করতে চায় প্রত্যেকটি দেশের বার্গারশ্রেণী। তাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নূতন ভূখণ্ড দখলের প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক দেশ চায় যত বেশি সম্ভব উপনিবেশ দখল করে সেগুলোকে নিজেদের পণ্যের বাজারে পরিণত করতে। পরিণামে শুরু হল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

(ঘ) শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিকাশ : মধ্যযুগের শেষের দিকে জাতীয় চেতনা একদিকে যেমন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে গড়ে তুলেছে শক্তিশালী রাজতন্ত্র। সামন্তপ্রথায় রাজার কোনো শক্তি ছিল না। প্রজার সাথে রাজার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। প্রজারা খাজনা দিত জমিদারকে এবং চার্চকে। রাজার আয়ের উৎস ছিল তাঁর নিজস্ব জমিদারদের (Tenants-in-Chief) থেকে প্রাপ্ত কর। এঁদের উপর রাজা ছিলেন একান্তভাবেই নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় এঁরাই রাজাকে অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। এসকল রাজাদের উপরে ছিলেন পবিত্র রোমান সম্রাট—সমগ্র ইউরোপবাসীর ইহজাগতিক প্রভু। কিন্তু পোপের সাথে সংঘর্ষে তিনি ক্রমশ শক্তিহীন

www.icsbook.info

হয়ে পড়েন। এ সুযোগে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র। কতকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা এ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করে।

(ঙ) ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব : ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ফ্রান্সের সকল প্রজাকে একত্রিত করে সেদেশের রাজশক্তিকে সংহত করে। অন্যদিকে এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংল্যান্ডের রাজারা ফ্রান্সে অবস্থিত তাঁদের ভূখণ্ডের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দেশে শক্তি সঞ্চয়ে অধিক মনোনিবেশ করেন। গোলাপের যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের সামন্তপ্রথা একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে টিউডর রাজাদের শাসনকালে ইংল্যান্ডে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়।

স্পেনে ক্যাস্টিল ও অ্যারাগন প্রদেশদুটি একত্রিত হয় প্রথমে ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ডের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ফলে। স্পেনের একত্রীকরণের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ম্যুরদের বিতাড়ন করে গ্রানাডা দখল এবং ন্যাভারে প্রদেশদুটি অধিকারের মাধ্যমে স্পেনের একত্রীকরণ ও রাজতন্ত্র সংহত করার কাজ আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তী রাজাদ্বয় পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনকালেই স্পেনে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটে।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল সামন্তশক্তিকে খর্ব করে। সামন্তপ্রভুদের দমন না করে রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটান সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে রাজারা সাহায্য নিয়েছিলেন বার্গারদের। বার্গারশ্রেণীও আবার রাজাকে সাহায্য করেছে নিজেদের স্বার্থে। অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে রাজার সৈন্যদলে নিজেদের মধ্য থেকে লোক সরবরাহ করে তারা রাজার হাতকে শক্তিশালী করেছে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে। এই বার্গারশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না বলেই জার্মানি ও ইতালিতে একক রাজশক্তি গড়ে উঠতে পারেনি।

এই বার্গারশ্রেণীর সাথে রাজার মিত্রতা ততদিন পর্যন্ত টিকে ছিল, যতদিন-না রাজা নিজের শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি এখন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। রাজা নিজের নামে মুদ্রা জারি করতে পারেন, যে-কোনো ধরনের কর আরোপ করতে পারেন, নিজের সৈন্যদল গঠন করতে পারেন, যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে পারেন, এমনকি যে-কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এভাবেই রাজশক্তি গড়ে ওঠে। বার্গারদের সাহায্য নিয়ে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে এসকল দেশের রাজারা নিজেদের শক্তি সংহত করে পরিশেষে আবার সকল শ্রেণীর উপরই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

(চ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ : সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়েছিল, পরিশেষে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারাই রুখে দাঁড়িয়েছিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা শামিল হয়েছিল তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মন্ত্রে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গণতন্ত্রের বীজ রোপণ করেছিল। ষোড়শ শতক থেকে যেসব গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ইউরোপের জনগণকে সাম্য, মৈত্রী ও

www.icsbook.info

স্বাধীনতার সংগ্রামের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা দীক্ষিত হয়েছিল গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে।

৫. বিজ্ঞান ও কারিগরি আবিষ্কার

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের উত্তরণে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের গুরুত্ব কম নয়। এই কারিগরি আবিষ্কারগুলো ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের পথ সুগম করেছে। এ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে অশ্বশক্তি, জলশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার; সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য জাহাজের হাল ও কম্পাসের আবিষ্কার, বারুদের আবিষ্কার; কাচ, কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার।

(ক) অশ্বশক্তির ব্যবহার : অশ্বশক্তির ব্যবহার মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পশুশক্তি নিয়োগের দ্বারা মানুষকে অমানুষিক পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মধ্যযুগে ঘোড়াচালিত লাঙলের প্রচলনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়। ঘোড়ার লাগাম ও ঘোড়ার খুরের আবিষ্কারের ফলে ঘোড়ার দৌড়ের শক্তি বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারী মালবাহী যানবাহন টানার ব্যাপারে ঘোড়াকে আরও বেশি কাজে লাগানো যায়।

(খ) পানি ও বায়ুকল : মধ্যযুগের ইউরোপে প্রায় প্রতিটি ম্যানরেই পানি ও বায়ুচালিত কলের প্রচলন হয়। এ কলগুলো দ্বারা গমপেষার কল, আঙ্গুরপেষার কল, করাতের কল ও লোহা ঢালাই-এর কল চালানো হত। এসকল কলে কার্যরত কারিগরেরাই ছিল আধুনিক যুগের মেকানিকদের পূর্বসূরী। মধ্যযুগের শেষের দিকে কৃষি ও পণ্য উৎপাদনে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়, পানি ও বায়ুচালিত কলের ব্যবহার তার অন্যতম প্রধান কারণ।

(গ) জাহাজের হাল ও কম্পাস : আধুনিক যুগের আবির্ভাবের পশ্চাতে আর একটি অবদান ছিল জাহাজের হাল ও দিকনির্ণয়যন্ত্রের। সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজের হারের প্রবর্তনের ফলে মাঝিমাল্লাদের অমানুষিক পরিশ্রম লাঘব হয়। এ ছাড়া কম্পাস বা দিকনির্ণয়যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে অকূল সমুদ্রে জাহাজ চালানো সম্ভব হয়। এ দুটি আবিষ্কারের ফলে কলম্বাস কর্তৃক অজানা পথে অকূল সমুদ্র পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

(ঘ) বারুদের আবিষ্কার : মধ্যযুগের শেষের দিকের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের মধ্যে বারুদের আবিষ্কারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বারুদের দ্বারা নির্মিত বন্দুক ও কামানের সাহায্যেই সামন্তপ্রথার ধ্বংসসাধন করে রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। রাজাদের কামানের গোলার আঘাতে সামন্তপ্রভুদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই কামান ও বন্দুকের সাহায্যেই ইউরোপ তার উপনিবেশগুলো দখল করতে সক্ষম হয়। এই আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের উপর ইউরোপ তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে নিজের শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করে। সামন্ত সেনাবাহিনীর পরিবর্তে নতুন ধরনের

www.icsbook.info

সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ফলে ব্যয় বেড়ে গেল। প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হল ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনা ও রুপার। ফলে, একদিকে যেমন খনিবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যার প্রসার ঘটল, তেমনি আরেক দিকে দলে দলে ছুটল দিকে দিকে এগুলোর সন্ধানে।

(ঙ) কাচের আবিষ্কার : মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কাচের আবিষ্কার। কাচ ইউরোপের অন্ধকারকে দূর করেছে। দরজা ও জানালায় কাচের ব্যবহারের ফলে ঘরবাড়ি আলোকিত হয়েছে। এছাড়া চশমায় কাচের ব্যবহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। সর্বোপরি কাচের দ্বারা নির্মিত টেলিস্কোপের দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ চালানো হয়, তা সমগ্র মধ্যযুগের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়।

(চ) কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র : এ যুগের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র। এ দুটি আবিষ্কার প্রথমত চীনদেশে হলেও ইউরোপে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে মধ্যযুগের শেষে। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির জোহান গুটেনবার্গ প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করেন। এ কাজটি মানবসভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বই ছাপার ফলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণ মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিমেষেই দূর হয়ে গেল। ছাপানো দলিল সামন্তযুগের মৌখিক শর্তের হাত থেকেও মানুষকে মুক্তি দিল। পারস্পরিক পরিচয় ও আনুগত্যের ভিত্তিতে যে সামন্ত-সম্পর্ক এতদিন রচিত হয়েছিল, কাগজ ও ছাপাখানার বদৌলতে এখন লিখিত দলিলই তার স্থান দখল করল।

(ছ) ফলাফল : অন্যদিকে জ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে মানুষের মন থেকে দূরীভূত হল একদিনের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ইউরোপবাসী এখন যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দ্বারা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। ইতিহাসে এরই নাম রেনেসাঁ।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে চিন্তার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তা রেনেসাঁরই অবদান। রেনেসাঁ ছাড়াও আরও দুটি বিশেষ ঘটনা এ উত্তরণের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এর একটি হল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং অপরটি ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এসকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভৌগোলিক আবিষ্কার

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যেসকল ঘটনা সমগ্র ইউরোপকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, ভৌগোলিক আবিষ্কার তাদের মধ্যে অন্যতম।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। ভূমধ্যসাগর এবং তার দক্ষিণদিকস্থ আফ্রিকার উত্তর উপকূলের কিছু অংশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ বা মহাদেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে অজানা। এশিয়া সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বিখ্যাত ভেনেসীয় পর্যটক মার্কো পোলোর (১২৫৪–১৩২৪ খ্রি.) গ্রন্থেই আবদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মার্কোপোলো অনেকগুলো বছর চীনের শাসক 'মহান খান'দের রাজদরবারে কাটিয়ে আসেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Book of Sir Marco Polo concerning the Kingdoms and Marvels of the East মার্কো পোলোর অভিযান সম্বন্ধে অদ্ভুত এবং লোমহর্ষক বিবরণে পরিপূর্ণ হলেও প্রকৃত ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারে এ গ্রন্থ বিশেষ কোনো সাহায্য করেনি। তবুও ভৌগোলিক আবিষ্কার উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

১. ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ

অর্থনৈতিক কারণ :

ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও প্রাচ্যদেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল দ্বাদশ শতক থেকেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাতের পূর্ব পর্যন্ত এই বাণিজ্য মূলত তিনটি প্রধান পথে পরিচালিত হত।

(ক) প্রচলিত বাণিজ্যপথ : প্রথম পথে ভারতের পশ্চিমদিকের মালাবার উপকূল থেকে বাণিজ্যবহরগুলো রওনা হয়ে ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে গমন করে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব উপকূলে মিশরের কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে মাল পৌঁছে দিত।

দ্বিতীয় বাণিজ্যপথটিও মালাবার উপকূল থেকে শুরু করে আরও একটু উত্তরাংশ দিয়ে অগ্রসর হত। পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভারত মহাসাগর পার হয়ে পারস্য উপসাগরের সর্বউত্তর প্রান্তে মাল খালাস করত। সেখান থেকে স্থলপথে বণিকেরা মাল নিয়ে যেত কৃষ্ণসাগর বা ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত।

www.icsbook.info

তৃতীয় পথে মাল আসত প্রথমত চীনদেশ থেকে গোবি মরুভূমি পার হয়ে, মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ বা বোখারার মধ্য দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত। এখান থেকে একটি বাণিজ্যশাখা চলে গিয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এশিয়ামাইনর ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের দিকে। আরেক শাখা উত্তরে বিস্তৃত হয়ে কাস্পিয়ানসাগর ঘুরে কৃষ্ণসাগরের দিকে এবং তৃতীয় শাখা গিয়েছিল রাশিয়ার দিকে। বাণিজ্যপথগুলো দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল এবং কষ্টকর ছিল বলে বণিকরা হালকা অথচ মূল্যবান লাভজনক পণ্যই বহন করত।

উপরোক্ত বাণিজ্যপথগুলোতে মাল আমদানি রপ্তানি করত মূলত আরব বণিকেরা। তারা নিয়ে আসত প্রাচ্যদেশগুলো থেকে প্রধানত গোলমরিচ, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা, কাশ্মিরির শাল, পারস্যের কম্বল ও গালিচা। এ ছাড়া আনত হীরা, মুক্তা, অন্যবিধ মূল্যবান পাথর, বিভিন্ন প্রকারের রঙ, রেশম, সুগন্ধিদ্রব্য প্রভৃতি।

(খ) বাণিজ্যজ্যব্য : আরব বণিকেরা এগুলোকে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে পৌঁছে দিত। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থার দরুন ইতালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা এবং ফ্লোরেন্সের বণিকরাই এই বাণিজ্যের সিংহভাগ করায়ত্ত করেছিল। ইতালির বণিকরা এ মাল পৌঁছে দিত জার্মানির নুরেমবুর্গ, আউগ্স্বুর্গ, উলম্, রিজেন্সবুর্গ ও কনস্টান্সে এবং রাইন ও দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শহরগুলোতে। এ ছাড়া ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, পোলান্ড এবং বাল্টিক সাগরের উপকূলের দেশগুলোতেও এ মাল পৌঁছে যেত। যদিও বিভিন্ন ধরনের মশলা ও বিলাসদ্রব্য কেনার সামর্থ্য কেবলমাত্র ধনীদেরই ছিল, তবুও ভেনিসীয় বণিকরা প্রতি বছর ৪২০,০০০ পাউন্ড ওজনের পরিমাণ গোলমরিচই ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। এসব তারা কিনত মিশরের সুলতানের নিকট থেকে। মিশর এগুলো আমদানি করত শ্রীলঙ্কা, সুমাত্রা (ইন্দোনেশিয়া) এবং পশ্চিম ভারত থেকে। ঐসব এলাকা থেকে আরো আমদানি করা হত দারুচিনি। আদা আমদানি করা হত আরব ভূখণ্ড, ভারত ও চীন থেকে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চল থেকে আসত লবঙ্গ ও জায়ফল।

ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং ধর্মস্থানগুলোর অঙ্গসজ্জার জন্য দামি পাথর ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন ধরনের পান্না, হীরা, চুনি, মুক্তা ও অন্যান্য পাথর আনা হত পারস্য (ইরান), ভারত ও শ্রীলঙ্কা থেকে। কর্পূর ও কাবাব চিনি (জাভার বেরি গাছের শুকনো একজাতীয় ফল) আসত বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া) ও সুমাত্রা থেকে। এসবের জন্মস্থান ছিল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলো।

এ ছাড়া চীন থেকে আমদানি করা হত কস্তুরী সুগন্ধ; আরবভূখণ্ড ও পারস্য থেকে ইক্ষুজাত চিনি; ভারত থেকে নীল, চন্দন কাঠ ও ঘৃতকুমারী কাঠ এবং এশিয়া মাইনর থেকে ফিট্‌কিরি আমদানি করা হত।

চীনদেশীয় মাটির দ্রব্যাদি, জাপানি ধাতুর দ্রব্যাদি, দামাস্কীয় লিনেন, পারস্যদেশীয় কার্পেট ও কম্বল, কাশ্মিরি শাল —এগুলো ছিল পরিচিত নাম, যার কদর বেড়ে উঠছিল প্রতিদিন।

www.icsbook.info

সে তুলনায় ইউরোপের রপ্তানিদ্রব্য তেমন কিছুই ছিল না। সে কেবল কিছু পশমি বস্ত্র, লোহা, টিন, তামা, দস্তা, পারদ (quick silver) প্রভৃতি ধাতু রপ্তানি করত। অবশ্য অসম বাণিজ্যিক ঋণ পরিশোধ করত সোনা ও রুপার মুদ্রায়, যার ফলে এসব ধাতু ক্রমশ ইউরোপে দুর্মূল্য হয়ে পড়ে। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পরই কেবলমাত্র ইউরোপে সোনা ও রুপা স্তূপীকৃত হতে শুরু করে। ইতালির বণিকরা এ বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থোপার্জন করত। সে-যুগের ইতালির সমৃদ্ধির পিছনে এ বাণিজ্যই ছিল মূল কারণ। তাদের এই সমৃদ্ধি ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর বণিকদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে ইতালির বণিকদের দখলে থাকার ফলে অন্যদের এক্ষেত্রে প্রবেশ করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। তাই তারা অন্য দিক দিয়ে বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হল। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযান শুরু হওয়ার পিছনে এসব বণিকদের অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণাই ছিল মূল কারণ।

২. কনস্টান্টিনোপলের পতন

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপীয় বণিকদের নিকট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই অটোমান তুর্কীরা সমগ্র এশিয়ামাইনর দখল করে নেয়। তারপরে তারা ক্রমশ দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় এবং পুরো বল্কান উপদ্বীপ অধিকার করে। পোলিশ, হাঙ্গেরীয় ও ভেনিসীয়দের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটের সর্বাত্মক প্রতিরোধ সত্ত্বেও তুর্কীরা ক্রমশ বলীয়ান হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৪৫৩ সালে তুর্কীর সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ ১৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। খ্রিস্টানগণ তাদের ৮,০০০ সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে শহর রক্ষার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ করে দিয়ে তুর্কী সৈন্যরা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল শহর অধিকার করে নেয়। তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল অধিকারের মধ্যদিয়ে এক হাজার বছরের বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবসান ঘটে। তুর্কীরা আরও অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে সিরিয়া ও দক্ষিণে মিশর দখল করে নিল। তুর্কী নৌবহর মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরের বিরাট এলাকায় নিজেদের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করে।

তুর্কীদের আক্রমণে ইতালির জেনোয়া ও ভেনিসের বাণিজ্যজাহাজগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ককেশাস এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তুর্কীরা কৃষ্ণসাগরকেও প্রায় নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। এ দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার হয়ে ইউরোপের ও প্রাচ্যের মধ্যকার বাণিজ্যের পথগুলো রুদ্ধ হয়ে গেল। ভূমধ্যসাগর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ইতালির সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হল। ইতালির সমৃদ্ধির যুগের অবসান ঘটল।

www.icsbook.info

৩. ইউরোপে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা

কিন্তু প্রাচ্যের বিলাসসামগ্রী ইউরোপের দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের মনে যে বিলাসী মনোবৃত্তির জন্ম দিয়েছিল, তার অবসান হল না। বরং পণ্য আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এগুলোর চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেল। ভূমধ্যসাগরের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সন্ধান চলল অন্য পথের। স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ও ফ্রান্স সকলে প্রচেষ্টা শুরু করল আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার। ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযানে এরাই ব্রতী হয়েছিল সর্বপ্রথম।

ভূমধ্যসাগরকে বাদ দিয়ে ইতালি ও আরবীয় বণিকদের এড়িয়ে, এরাই সরাসরি প্রাচ্যের সোনা, মশলা ও রেশমের সম্ভার করায়ত্ত করতে ছুটেছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পিছনে এটাই ছিল মূল কারণ।

৪. ধর্মীয় কারণ

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পিছনে অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণা ছাড়াও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ প্রায় সমানভাবেই কার্যকর ছিল।

প্রথম থেকেই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা এ ধর্মপ্রচারের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলোতে ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত হন। এরপরে এশিয়ার অভ্যন্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে মিশনারিদের ব্যাপক প্রচেষ্টা সংগঠিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোপ কর্তৃক মধ্যএশিয়ার মঙ্গোল রাজার (খানের) দরবারে দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। জন অব মন্টে কর্ভিনো নামে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী পারস্যের নেতৃস্থানীয় মঙ্গোলদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন এবং ভারতবর্ষের মাদ্রাজে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরে তিনি চীনের পিকিং বা বেইজিং-এ গমন করেন। ১৩০৭ সালে পোপ তাঁকে পিকিং-এ খ্রিস্টান চার্চের আর্চবিশপ নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন মিশনারি প্রেরণ করেন।

ভারতবর্ষ, চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোতে আবিষ্কারকদের প্রতিটি অভিযানের বণিকদের সাথে অংশ নিতেন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারিরা। যিশুখ্রিস্টের বাণী হিদেনদের (অখ্রিস্টান) মধ্যে প্রচার করে তাদের খ্রিস্টধর্মের পতাকাতলে সমবেত করাই ছিল এসকল ধর্মপ্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. অ্যাডভেঞ্চারের নেশা

অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় উন্মত্ত হয়েও অনেকে এসকল অভিযানে অংশ নেয়। দেশ আবিষ্কারের চাঞ্চল্যকর উন্মাদনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শিভালরির অবসানের সাথে সাথে ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের সুযোগ কমে যেতে থাকে। ভৌগোলিক আবিষ্কার সে সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল নতুন দেশ, নতুন পৃথিবী অভিযানে অংশ নিতে। 'ক্যাথে' নামে পরিচিত চীনদেশ এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ছিল

www.icsbook.info

অপরিসীম। এসব দেশের বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদের কাহিনী তখন লোকের মুখে-মুখে প্রচারিত ছিল। সেসব সম্পদ করায়ত্ত করার অদম্য বাসনার সাথে সাথে নতুন দেশ, নতুন মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আগ্রহও তাদের একাংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এ স্পৃহা আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল রেনেসাঁর আনুকূল্যে। রেনেসাঁ মানুষের মনের দিগন্ত প্রসারিত করেছিল—সৃষ্টি করেছিল অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার বিপুল আগ্রহ। তারই একাংশ প্রতিফলিত হয়েছিল ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযানের মধ্যদিয়ে। Gold, God ও Glory—এই তিনটি কারণই ভৌগোলিক আবিষ্কারের পশ্চাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

৬. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার

মধ্যযুগের অবসানের সাথে সাথে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের মধ্যে পৃথিবীর গোলকীয় আকৃতি সম্পর্কে ধারণা মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে ভারতবর্ষ বা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের অবস্থান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল অস্বচ্ছ।

আটলান্টিকের পশ্চিমপারেই ভারতবর্ষ অবস্থিত এবং সোজা পশ্চিমদিকে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যদেশগুলোতে পৌঁছানো যায়—এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে ছিল। আবার আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরেও হয়তোবা ভারতবর্ষে পৌঁছানো যাবে—এটাও তারা মনে করত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় নাবিকরা সমুদ্রাভিযান সম্বন্ধে কিছুটা পারদর্শী হয়ে ওঠে। এ সময়ে আবিষ্কৃত কয়েকটি যন্ত্র তাদের সমুদ্রাভিযানে বিশেষ সহায়তা করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিক্‌দর্শনযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেয়া সম্ভবপর হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে মানচিত্র তৈরিও সহজসাধ্য হয়। মধ্যসমুদ্রে বসেও উপকূল-রেখার অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়। অ্যাস্ট্রোল্যাব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যেত।

জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গণিত, সূর্যাস্ত সম্বন্ধীয় চার্ট, সময়-নিরূপকযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রাভিযান নিরাপদ ও সহজসাধ্য বলে বিবেচিত হয়।

এ যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলো যেমন ভৌগোলিক আবিষ্কারকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, তেমনি তৎকালীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর রাজন্যবর্গের আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য সমুদ্রাভিযানকারী নাবিকদের সহযোগিতা করেছিল সম্পূর্ণ অজানা সমুদ্র পাড়ি দিতে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযান

পর্তুগালের অভিযান

প্রথম যে দেশ ভৌগোলিক আবিষ্কারে অংশগ্রহণ করেছিল তার নাম পর্তুগাল।

আটলান্টিকের ইউরোপীয় উপকূলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই দেশটির রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সে-যুগের তুলনায় মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ।

www.icsbook.info

হেনরি দি নেভিগেটর : পর্তুগালের রাজা প্রথম জনের পুত্র রাজকুমার হেনরি এই অভিযানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। হেনরি যদিও নিজে কোনো অভিযানে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেননি, তথাপি তাঁর উদ্যম, উৎসাহ ও সংগঠন কাজের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ইতিহাসে 'হেনরি দি নেভিগেটর' বা নাবিক হেনরি নামে অভিহিত করা হয়। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগালে তিনি নাবিকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তিনি তৎকালীন ইউরোপের দক্ষ নাবিক, গণিতজ্ঞ, ভূগোল-বিশারদদের জড়ো করেন। বিখ্যাত নাবিক, নৌবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রের নির্মাতা এবং মানচিত্র নির্মাতা জেমিকে (Jayme of Majorca) তিনি অনেক অর্থ ব্যয়ে তাঁর কেন্দ্রের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন। এঁদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে অনেক নাবিক ভৌগোলিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বছরের-পর-বছর তাঁরা আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হন। এর আগে অবশ্য পর্তুগিজরা ম্যুরদের ধাওয়া করে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়। এখন তারা আরও দক্ষিণদিকে অভিযান চালানোর চেষ্টা করে। এসকল অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আফ্রিকা মহাদেশের আটলান্টিক উপকূলে পর্তুগিজদের জন্য নিজস্ব বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেসকল স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা।

এভাবে অভিযান চালিয়ে তারা ম্যাডিরা ও অ্যাজোর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। তারা এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে আরও দক্ষিণদিকে উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ উপকূল ঘুরে একদিন হয়তো ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে পৌঁছানো যাবে—এ আশায় তারা ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামে একজন পর্তুগিজ নাবিক আফ্রিকার সর্বদক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হন। এখানে পৌঁছে তিনি প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে আর এগুতে না পেরে ফিরে আসেন। দিয়াজ এ-স্থানের নাম দিয়েছিলেন 'ঝড়ের অন্তরীপ' (Cape of Storms)। কিন্তু পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন দিয়াজের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অন্তরীপ অতিক্রম করতে পারলে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। এজন্য তিনি এর নাম দিয়েছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)।

স্পেনের অভিযান

পর্তুগিজরা যখন আফ্রিকার উপকূল ধরে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন স্পেনীয়রা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যদেশে গমনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যিনি অংশগ্রহণ করেন, তাঁর নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

ইতালির জেনোয়ার অধিবাসী কলম্বাসের প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের অধীনে নাবিক হিসাবে যোগদান করেন। আটলান্টিকের অপর পারে ভারতবর্ষ ও চীনদেশ অবস্থিত—এমন একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে কলম্বাস পর্তুগালের রাজার কাছে আটলান্টিকে অভিযান চালানোর জন্য

www.icsbook.info

সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু পর্তুগিজরা তাদের আফ্রিকা উপকূল অভিযানেই ব্যস্ত ছিল। কাজেই কলম্বাস তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলেন না। এরপরে তিনি একে একে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেন প্রত্যেক দেশের রাজদরবারেও আবেদন জানালেন। অবশেষে, স্পেনের রাজা-রানী ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা কলম্বাসের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে জাহাজ ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন।

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার

কলম্বাসের অভিযান

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট কলম্বাস স্পেনের প্যালোস বন্দর থেকে তিনটি জাহাজ (সান্টামারিয়া, পিন্টা ও নীনা) ও সাতাশি জন নাবিক নিয়ে রওনা হলেন। সবচেয়ে বড় জাহাজটির ভারবহন ক্ষমতা ছিল একশ টন মাত্র। সাথে ছিল স্পেনের রাজা-রানি কর্তৃক 'ক্যাথের মহান খান' (চীনদেশের রাজা)-দের কাছে লিখিত পত্র।

সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধরে জাহাজ পশ্চিম-অভিমুখে চলল। কলম্বাসের সাথীরা অধৈর্য হয়ে উঠল। তারা বিদ্রোহ করল; কিন্তু কলম্বাস নির্বিকার। অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে তিনি জাহাজ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর উপকূল দেখা গেল। কলম্বাস তাঁর দলবল নিয়ে তীরে অবতরণ করলেন। তিনি মনে করলেন যে এশিয়ার উপকূলের কোনো এক স্থানে তিনি পৌঁছেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পৌঁছেছিলেন আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটি দ্বীপে—ভারতবর্ষ ও চীন থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে যার অবস্থান। কলম্বাস পার্শ্ববর্তী দু একটি দ্বীপ ঘুরে দেখেন এবং সেখানে অদ্ভুত ধরনের লোকদের সাক্ষাৎ পান। পর বৎসর তিনি স্পেনে ফিরে এসে বিবরণ পেশ করলেন যে তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন।

তিনবার কলম্বাস তাঁর নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে গমন করেন। সাথে নিয়ে যান বণিক, ধর্মপ্রচারক ও উপনিবেশ-দখলকারীদের। তারা ঘুরে ঘুরে সন্ধান করে চীন ও জাপানের সাম্রাজ্য, ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য এবং সে-সকল দেশের, যেখানে মশলা পাওয়া যায়। কিন্তু তারা শুধু পেল সামান্য সোনা। রেশম ও মশলার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। যে দেশটি কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা ছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। কলম্বাস সেটাকে ভারতবর্ষ ভেবে ভুল করে সেদেশের অধিবাসীদের নাম দিয়েছিলেন ভারতীয় (Indian)। কলম্বাসের প্রদত্ত ভুল নামকে গ্রহণ করেই পরে এসকল দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে নাম দেয়া হয়েছিল পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies) এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বোধন করা হয় রেড ইন্ডিয়ান (Red Indian) নামে।

কলম্বাসের প্রথম অভিযানের সাফল্য অনেককেই সমুদ্র-অভিযানে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৪৯৭ সালে জন ক্যাবট নামে একজন জেনোয়ার নাবিক ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরির আদেশে "এ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের দ্বারা অনধিকৃত ও অনাবিষ্কৃত যে-কোনো দেশ, দ্বীপ বা অঞ্চল আবিষ্কার" করার জন্য পশ্চিমাভিমুখে রওয়ানা হলেন।

www.icsbook.info

ক্যাবট ব্রিস্টল-বন্দর থেকে যাত্রা করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে কেপ ব্রিটন পৌঁছান। সে-বছরই ফিরে এসে তিনি বিবৃতি দেন যে তিনি "মহান খান"দের দেশ অর্থাৎ চীনে পৌঁছে গেছেন।

ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার

আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে যখন নতুন ভূখণ্ডের এক একটি অংশে ইউরোপীয়দের পদার্পণ ঘটছিল, তখন পূর্বদিকে পর্তুগিজদের অভিযান কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হন, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এরপর অভ্যন্তরীণ কারণে কিছুকালের জন্য পর্তুগিজরা তাদের অভিযানপর্ব স্থগিত রেখেছিল। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে গমনের জলপথ আবিষ্কারের সন্ধানে পর্তুগাল থেকে রওনা হন।

ভাস্কো-ডা-গামা : চারটি জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে উপনীত হন। এখানে একজন আরব বাণিজ্যজাহাজের নাবিকের সাক্ষাৎ পান। নাবিক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিমের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। এই প্রথম ভারতবর্ষে আসার জলপথ ইউরোপীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত হল। কালিকট বন্দরে পর্তুগিজরা মুসলিম বণিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। তাদের হাতে থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভাস্কো-ডা-গামা পার্শ্ববর্তী শহরে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি প্রচুর মশলা এবং মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করেন। ১৪৯৯ সালে ভাস্কো-ডা-গামা যখন পর্তুগালে ফিরে আসেন তখন তাঁর অভিযানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ষাট গুণ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে পর্তুগিজ বাণিজ্যজাহাজগুলো নিয়মিতভাবে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে প্রাচ্যদেশগুলোতে যাত্রা করত এবং প্রচুর পরিমাণে মশলা, রেশম ও মূল্যবান পাথর বহন করে দেশে ফিরে আসত। পর্তুগিজরা ভারতের গোয়া, দমন ও দিউতে তাদের বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো তদারক করার জন্য একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

পর্তুগিজরা ভারতবর্ষ ছাড়াও সিংহল, সুমাত্রা ও জাভায় তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে তারা চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবতরণ করে এবং ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে তারা জাপানে প্রবেশ করে। ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামে একজন প্রখ্যাত মিশনারির নেতৃত্বে পর্তুগিজরা সেসব দেশে সফলতার সাথে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। তাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে জাপানে প্রায় দুই লক্ষ লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পেড্রো ক্যাব্রাল নামে একজন পর্তুগিজ নাবিক ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পর্তুগাল থেকে যাত্রা করেন। প্রচণ্ড ঝড়ে এবং সমুদ্রস্রোতের টানে তাঁর জাহাজ পশ্চিমদিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে পৌঁছায়। ক্যাব্রাল তীরে

www.icsbook.info

অবতরণ করে সে-স্থানের নাম রাখেন ব্রাজিল এবং এটাকে পর্তুগালের অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যান্য ভূখণ্ড আবিষ্কার

ক্রমে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আটলান্টিকের অপর পারের আবিষ্কৃত দেশ এশিয়া নয়, সম্পূর্ণ নূতন ভূখণ্ড। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচি নামে একজন ইতালীয় পর্যটক নব-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ বলে দাবি করেন। চার বৎসর পরে জার্মানির একজন অধ্যাপক একটি ভূগোল বিষয়ক সাময়িকীতে লেখেন যে নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের নামকরণ করা হোক আমেরিকা, কেননা আমেরিকাস (আমেরিগোর ল্যাটিন নাম) এটা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর প্রস্তাবমতো সে মহাদেশের নাম 'আমেরিকা' রাখা হয়।

ম্যাগেলানের অভিযান : অনেকদিন পর্যন্ত এ ধারণা বলবৎ ছিল যে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান আমেরিকা থেকে বেশি দূরে নয়। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে বালবোয়া নামে একজন স্পেনীয় আবিষ্কারক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ পানামা যোজক অতিক্রম করে অপর পারে বিশাল জলরাশি দেখতে পান। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'বিরাট দক্ষিণ সমুদ্র'। আসলে এটাই প্রশান্ত মহাসাগর। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান নামে একজন পর্তুগিজ নাবিক স্পেনের রাজার অধীনে চাকুরি নিয়ে সমগ্র পশ্চিমদিকস্থ জলপথ সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে রওনা হয়ে, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন। এই সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত শান্ত রূপ দেখে তিনি এর নামকরণ করেন 'প্রশান্ত মহাসাগর'।

ম্যাগেলানের অভিযান এ পর্যন্ত পরিচালিত সকল অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলান রওনা হয়েছিলেন। আটলান্টিক পাড়ি দিতেই একটা জাহাজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে যায়; আরেকটি স্পেনে ফিরে যায়। অবশিষ্ট তিনটি জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলান দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছে একটি ক্ষুদ্র প্রণালীর মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। পরে তাঁরই নামানুসারে এই প্রণালীকে 'ম্যাগেলানের প্রণালী' বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দিনের-পর-দিন ম্যাগেলানের জাহাজ চলল। খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে এল। ক্ষুধায় কাতর নাবিকেরা পচা বিস্কিট, শুকনো গরুর চামড়া, কাঠের গুঁড়া, এমনকি ইঁদুর পর্যন্ত খেল। এসব খেয়ে এবং কখনও না-খেয়ে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় নানা রোগে ভুগে তাদের অনেকেই মারা গেল। অবশেষে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গুয়াম দ্বীপে পৌঁছুলেন।

সেখানে থেকে তাঁরা আরেকটি দ্বীপে পৌঁছান, ম্যাগেলান যার নাম দিয়েছিলেন 'সেন্ট ল্যাজারাস'। পরবর্তীকালে স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নামানুসারে এর নাম দেয়া হয় 'ফিলিপাইন'।

www.icsbook.info

এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষে ম্যাগেলান মারা যান (১৫২১ খ্রি.)। কিন্তু তাঁর সহচরবৃন্দ শেষপর্যন্ত একটি মাত্র অবশিষ্ট জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে পুনরায় স্পেনে এসে পৌঁছায়।

ম্যাগেলান ও তাঁর সহকর্মীদের অভিযান শেষপর্যন্ত এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করল যে পৃথিবী গোলাকার। সেই সাথে এটাও বোঝা গেল যে এতখানি বিস্তৃত পথ পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যদেশে আসা কোনোমতেই লাভজনক নয়। ভাস্কো-ডা-গামার প্রদর্শিত পথই সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ। ১৮৬৯ সালে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগকারী সুয়েজ খাল খনন না-করা পর্যন্ত এটাই ছিল ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে আগমনের সংক্ষিপ্ততম পথ।

১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের আবেদনক্রমে পোপ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত পূর্ব গোলার্ধের সকল ভূখণ্ড পর্তুগালকে দান করেন। এরপর থেকে এসকল অঞ্চলে পর্তুগাল একচ্ছত্রভাবে বাণিজ্য, উপনিবেশ বিস্তার ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা অর্জন করে।

কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের পর ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে আরেকজন পোপ স্পেনের আবেদনক্রমে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত অ্যাজোর দ্বীপপুঞ্জের একশত লীগ (প্রায় তিনশত মাইল) পশ্চিমদিকে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সীমারেখা টেনে দেন। এর পশ্চিমের সকল ভূখণ্ডের উপর স্পেনকে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও রাজনৈতিক অধিকার দান করা হয়।

১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। অতঃপর পর্তুগাল ও স্পেনের মিলিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সীমারেখাটি আরও দুশো সত্তর লীগ পশ্চিমে সরিয়ে দিয়ে ব্রাজিলকে পর্তুগালের অধীনে আনা হয়। এভাবে শেষপর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল পর্তুগালকে দিয়ে দেয়া হয় এবং উত্তর আমেরিকার সম্পূর্ণ ভাগ এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ (ব্রাজিল বাদে) স্পেনকে প্রদান করা হয়। ম্যাগেলান কর্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হলে পূর্ব গোলার্ধের ফিলিপাইনের উপর স্পেনের অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়।

পর্তুগাল ও স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন

পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

আলবুকার্ক : পূর্ব গোলার্ধের পর্তুগাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘাঁটিসমূহ পুরোপুরি উপনিবেশে পরিণত হতে পারেনি। পূর্বদিকে পর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য পর্তুগালের রাজা ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে আলফন্সো-ডা-আলবুকার্ককে গর্ভনর নিযুক্ত করে পাঠান।

আলবুকার্ক ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়াতে পর্তুগিজদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোচিনে আরেকটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবুকার্ক

www.icsbook.info

পারস্য উপসাগরে অরমুজ বন্দরটিও দখল করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক আধিপত্য ধ্বংস করা। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা দখল করে আলবুকার্ক আরও পূর্বদিকে মুসলিম বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করেন। এখান থেকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগিজদের বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করা হত। পূর্বদিকে পর্তুগিজরা সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপগুলোর সাথে বাণিজ্য করত, তবে এসব অঞ্চল তারা অধিকার করার চেষ্টা করেনি। আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা চীনের ক্যান্টন দ্বীপে পৌঁছে যায়। সেখানে তারা মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। পরে চীনের ম্যাকাও দ্বীপটি তারা দখল করে নিলেও চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পর্তুগিজরা বিশেষ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। একইভাবে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জাপানে পর্তুগালের বাণিজ্যঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে পর্তুগিজরা রাজনৈতিক দখল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি। শুধুমাত্র ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও তাঁর সহকারীরা জাপানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেই তাঁদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

এশিয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশ : ষোড়শ শতকে এশিয়াতে পর্তুগিজরা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা বাণিজ্যিক কার্যকলাপেই বেশি সাফল্য অর্জন করেছিল। পূর্বদেশের বাণিজ্যের সিংহভাগ তারা করায়ত্ত করেছিল। কিছুকালের জন্য হলেও পর্তুগালের রাজধানী লিসবন ইউরোপের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পর্তুগাল দেশটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের। অন্যদিকে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ শুধু আকারেই বড় নয়, অত্যন্ত সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। এসকল দেশ দখল করার মতো সামরিক শক্তি পর্তুগালের ছিল না। এমনকি এদেশের অধিবাসীদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে খর্ব করে সেখানে ইউরোপীয় শাসন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতাও পর্তুগালের ছিল না। বরং ভারতবর্ষের জলবায়ু ও জীবনযাত্রার সংস্পর্শে এসে পর্তুগিজরা শারীরিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়ে। একমাত্র ভারত মহাসাগর থেকে আরব বণিকদের বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সাফল্য অর্জন করে। আলবুকার্ক অরমুজ বন্দর দখল করে পারস্য উপসাগরে আরব বণিকদের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেও এডেন বন্দর অধিকার করতে না-পারার ফলে লোহিত সাগরে আরবদের প্রবেশে বাধা দিতে পারেননি। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক-এর মৃত্যুর দুবছর পরে তুর্কীরা মামলুক সুলতানদের নিকট থেকে মিশর অধিকার করে নেওয়ার পরেই কেবলমাত্র এ পথটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে পূর্বদেশের বাণিজ্যে পর্তুগিজদের একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবশ্য এই একচ্ছত্র অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পোপের নিষেধ অমান্য করে প্রথমে হল্যান্ড এবং পরে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড পূর্বদিকে তাদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে পর্তুগাল ক্রমশ হটে আসতে থাকে।

পূর্বগোলার্ধে পর্তুগালের একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশ কমতে থাকে। তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ শেষপর্যন্ত ভারতের গোয়া, দমন ও দিউ এবং চীনের ম্যাকাও

www.icsbook.info

বন্দরে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে জলদস্যুতার ক্ষেত্রে পর্তুগিজরা অনেকদিন পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে তাদের তৎপরতা বজায় রাখে। হুগলি নদীর মোহনা থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্তুগিজরা মগদের সাথে একত্রে যুক্ত হয়ে জলদস্যুতা চালায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এ জলদস্যুদের দমন করার জন্য বাংলাদেশে মুঘল সুবাদারদের সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।

আফ্রিকায় পর্তুগিজ উপনিবেশ : আফ্রিকা মহাদেশে পর্তুগিজরা ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে মোজাম্বিকে তাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। আবিসিনিয়াতেও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আফ্রিকার উপকূলে পর্তুগিজ ঘাঁটিগুলো মূলত ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আসার পথে বিশ্রামকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হত। এছাড়া আফ্রিকার সোনা, হাতির দাঁত ও নিগ্রো ক্রীতদাস ক্রয় এবং সংগ্রহের জন্যও এ ঘাঁটিগুলো ব্যবহৃত হত। অবশ্য পর্তুগিজরা আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি এবং তাদের উপকূলস্থ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ক্রমশ মুসলমান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের বণিকদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে যায়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তারা আবিসিনিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়।

আমেরিকায় পর্তুগিজ উপনিবেশ : অবশ্য আটলান্টিকের অপর পারে ব্রাজিলে পর্তুগিজরা সাফল্যের সাথে তাদের ঔপনিবেশিক রাজ্য গড়ে তোলে। এখানে তারা স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধ অতি সহজেই ভেঙে দেয় এবং ওলন্দাজ, স্পেনীয় ও ফরাসিদের আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়।

পর্তুগিজ জাহাজের অধিনায়কদের নেতৃত্বে উপনিবেশ বিস্তারকারীগণ এখানে সাফল্যের সাথে জমি দখল করে ঘাঁটি তৈরি করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাজিলের দক্ষিণে সাও পাওলো এবং উত্তরে পার্নাম্বুকো ও বাহিয়াতে পর্তুগিজ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো মূলত ছিল সামরিক ও ঔপনিবেশিক ঘাঁটি। ১৫৪৯ সালে পর্তুগালের রাজার নিযুক্ত একজন গভর্নরজেনারেল বাহিয়াতে তাঁর শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ব্রাজিল শাসন করতে থাকেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা ফরাসিদের কাছ থেকে রায়ো-ডি-জেনিরো দখল করে এটাকে ব্রাজিলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

ব্রাজিলে পর্তুগিজদের সাফল্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের কাছে এটাই প্রমাণ করে দিল যে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে আমেরিকা এশিয়ার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত স্থান। আমেরিকার অধিকাংশ এলাকাই ছিল স্পেনের অধিকারভুক্ত এবং স্পেন সেখানে সাফল্যের সাথে উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকা ছিল রেড ইন্ডিয়ান নামক একধরনের জাতিদের দ্বারা অধিকৃত মহাদেশ। রেড ইন্ডিয়ান কথাটা খুব অস্পষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের অধিকাংশ গোষ্ঠীই ছিল পশুশিকারি। কোনো কোনো স্থানে নতুন পাথরযুগের অনুরূপ কৃষিকাজের প্রচলন হয়েছিল। মেক্সিকো এবং পেরু অঞ্চলে

www.icsbook.info

মিশর, ব্যবিলনের প্রাচীন সভ্যতার তুল্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যদিও ব্রোঞ্জ বা লোহা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতির প্রচলন এখানে ঘটেনি।

ষোলো শতক পর্যন্ত আমেরিকা মহাদেশ ইউরোপ ও এশিয়ার উন্নত সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এসকল অঞ্চলে প্রচলিত উন্নত ধরনের সামরিক কৌশল তাদের অজ্ঞাত ছিল। অন্যদিকে স্পেনীয়দের হাতে ছিল বারুদের তৈরী বন্দুক ও কামান। তীর, ধনুক, বল্লম ও বর্শা নিয়ে রেড ইন্ডিয়ানরা স্পেনীয়দের সামরিক হাতিয়ারের কাছে অতি সহজেই পরাজিত হয়েছিল। স্পেনীয়রা তাদের দমন করেছে নির্মমভাবে, হত্যা করেছে নির্বিশেষে এবং লুণ্ঠন করেছে তাদের অপরিমিত সম্পদ। স্পেনীয়গণ কর্তৃক বর্বরভাবে আমেরিকা মহাদেশ দখলের কাহিনী মানব সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।

প্রথম স্পেনীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার সান ডমিঙ্গো দ্বীপে (পরে এর নাম হয় হিস্পানিওলা (Hispaniola)। এরপরে স্পেনীয়রা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। এর পরবর্তীতে ফ্লোরিডা থেকে ভেনিজুয়েলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্পেনীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মেক্সিকো ও পেরুতে স্পেনীয়রা অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পায়। তবে সেখানকার অধিবাসীদেরও তারা ক্যারিবীয় রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নির্মমভাবে দমন করে।

মেক্সিকো দখল : মেক্সিকোতে ছিল সুপ্রাচীন আজটেক সভ্যতা। হার্নান্দো কর্টেজ নামে একজন স্পেনীয় অভিযানকারী ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে দশটি জাহাজ, সাতশো সৈন্য, আঠারোটি ঘোড়া এবং কয়েকটি কামান নিয়ে সেখানে পৌছায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কর্টেজ-এর ঘোড়া, সৈন্য এবং জাহাজগুলো দেখে হতভম্ব হয়ে যায়, কেননা এ-ধরনের বস্তু তারা পূর্বে আর কখনও দেখেনি। তাদের আরও ভীত স্তম্ভিত করে দেয়া হল কামানের গোলার প্রচণ্ড শব্দে। তারা ভাবল কর্টেজ হয়তোবা কোনও দেবতা এবং তাঁকে প্রতিরোধ করা অর্থহীন। কর্টেজ এলাকাটি বিনা বাধায় দখল করে নিলেন এবং ভেরাক্রুজ শহরটি স্থাপন করলেন। তিনি নিজের জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিলেন। দলবল নিয়ে তিনি মেক্সিকোর আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আজটেক সভ্যতা তখন প্রায় পতনোন্মুখ। সম্রাট মন্টেজুমা তাঁর দেশদ্রোহী দলপতিদের দ্বারা বিপর্যস্ত। এদের কয়েকজন আবার কর্টেজকে সাহায্য করল। সামান্য বাধা অতিক্রম করে কর্টেজ তাঁর স্পেনীয় সহচর ও রেড ইন্ডিয়ান অনুগতদের নিয়ে মেক্সিকো শহরে সম্রাট মন্টেজুমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। মন্টেজুমা তাঁকে প্রথমে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি অকস্মাৎ স্পেনীয়দের হত্যা করার নির্দেশ দেন। এরপরে কর্টেজের আর কোনো অসুবিধা রইল না শহর আক্রমণ করার। স্পেনীয় আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে মন্টেজুমা পরাজয়বরণ করলেন। তাঁকে বন্দি করা হল। সম্রাট স্পেনের রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন এবং ছয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান পাথর কর্টেজকে দিতে বাধ্য হলেন। এর ফলে মেক্সিকোবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারা মন্টেজুমাকে স্পেনীয়দের অনুচর বলে তাঁকে হত্যা করে

www.icsbook.info

অন্য একজনকে সম্রাট নির্বাচিত করল। ওটুম্বার প্রান্তরে কর্টেজকে বাধা দেয়া হল। এখানেই সুপ্রাচীন আজটেক সভ্যতার শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গেল। বিপুল বিক্রমে কর্টেজ যুদ্ধে জয়লাভ করে সমগ্র দেশটিতে স্পেনের কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন।

পেরু দখল : একইভাবে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতার কেন্দ্রস্থল পেরু রাজ্যটি দখল করলেন স্পেনীয় সেনানায়ক ফ্রান্সিসকো পিজারো। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পানামা থেকে ১৮০ জন সৈন্য, ২৭টি ঘোড়া নিয়ে পেরু অধিকার করতে রওনা হন। সহজেই তিনি কুজকো (Cuzco) শহরটি দখল করে সকল রেড ইন্ডিয়ানকে বশীভূত করেন। ১৫৩৫ সালে পিজারো লিমা (Lima) শহরটি দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে স্থাপন করেন। মেক্সিকো এবং পেরু উভয় দেশেই স্পেনীয়রা বিপুল পরিমাণ সোনা, রুপা এবং বহু খনিজ সম্পদের অধিকারী হয়।

আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, চিলি ও ইকুয়েডর দখল : কর্টেজ ও পিজারোর সাফল্য এবং প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হওয়ার কাহিনী অন্যান্য স্পেনীয়দের প্রলুব্ধ করে। আমেরিকায় দেশ দখলের জন্য পেড্রো ডি মেন্ডোজা নামে একজন অভিজাত ব্যক্তি স্পেনীয় রাজার নিকট থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চল অনুদান হিসাবে লাভ করেন। সেখানে তিনি ভবিষ্যতের আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে দেশদুটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৫৩৫ সালে তিনি বুয়েনস এয়ারিস (Buenos Aires) শহরটি স্থাপন করেন। পিজারোর আরেকজন সহযোগী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের চিলি রাজ্যটি দখল করেন এবং ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে সান্টিয়াগো শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। পিজারোর অন্য এক সহযোদ্ধা ইকুয়েডর (Equador) রাজ্যটি দখল করে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে গুয়াইয়াকুইল (Guayaquil) শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলাম্বিয়া রাজ্যটি স্পেনীয়দের দ্বারা অধিকৃত হল। স্পেনীয়রা তা সাফল্যের সাথে সমাধা করেছে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে স্পেনীয়রা সেখানে খনিজ সম্পদ আহরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, গবাদি পশু পালন এবং প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে মহাদেশটিকে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের দখলে আনে। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা ক্রীতদাসদের নিযোগ করে আমেরিকায় জমি আবাদ করে স্পেনীয়রা তাদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকায় দুটি স্পেনীয় শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়—নূতন স্পেন (New Spain) ও পেরুতে। নূতন স্পেন থেকে মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ শাসন করা হত। পেরু থেকে শাসন করা হত পেরু, চিলি, ইকুয়েডর ও আর্জেন্টিনা দেশগুলোকে।

সমগ্র মহাদেশটিকে খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনা হল। শত শত খ্রিস্টান পাদ্রি, সন্ন্যাসীকে পাঠানো হল স্থানীয় অধিবাসীদের (যারা তখনও অবশিষ্ট ছিল) খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে লিমা এবং মেক্সিকো শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

www.icsbook.info

করা হল। স্পেনের কর্তৃত্বে এভাবে আমেরিকাতে ইউরোপীয়করণের কাজ চলল পুরোদমে।

ফিলিপাইনে ইউরোপীয়করণ : একইভাবে ইউরোপীয়করণ করা হল ফিলিপাইনকে। ম্যাগেলান এ দ্বীপটি দখল করেন। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নামানুসারে (পরে যিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ নামে পরিচিত হন) এর নামকরণ করা হল 'ফিলিপাইন'। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ম্যানিলা শহরটি স্থাপন করা হল। এশিয়া মহাদেশের এ দ্বীপটির অধিবাসীরা ভারতীয়, চীনদেশীয় অথবা জাপানীদের মতো অতখানি সুসভ্য ছিল না। কাজেই তাদের উপর স্পেনীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও খ্রিস্টধর্ম অতি সহজেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশে ফিলিপাইনের অধিবাসীরাই একমাত্র জাতি, যাদের পুরোপুরি ইউরোপীয়করণ করা সম্ভব হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অভিযান

পর্তুগাল ও স্পেনকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধ পোপ ভাগ করে দিলেও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো চুপ করে বসে রইল না। কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণের তিন বৎসর পরেই প্রথমে ইংরেজরা প্রাচ্যদেশের উদ্দেশে আটলান্টিক পাড়ি দেয়। পোপের নির্দেশ তারা সুকৌশলে অমান্য করে। ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরির আদেশক্রমে জন ক্যাবট নামে একজন ভেনিসীয় নাবিক ব্রিস্টল বন্দর থেকে রওনা হয়ে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-আমেরিকার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড (New Foundland)-এর উপকূলে পৌঁছান। তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি এশিয়ার কোনো দেশে পৌঁছেছেন। পরে অবশ্য জানা গেল যে দেশটি নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। পোপ পশ্চিম ও পূর্ব গোলার্ধকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর দিকটি কাউকে দেয়া হয়নি। অতএব উত্তরদিক দিয়ে অভিযানের চেষ্টা করল ইংরেজরা।

ক্যাবটের অভিযান : ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে জন ক্যাবটের পুত্র সেবাস্টিয়ান ক্যাবট উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম দিক প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা করেন। প্রচণ্ড বরফের চাড় ভেঙে তিনি অবশ্য বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে রাশিয়ার উপকূলে পৌঁছান। চ্যান্সেলর নামে আরেকজন ইংরেজ অভিযানকারী এপথে পাড়ি দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত রাশিয়ার উপকূলে পৌঁছান। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে মাস্কভি কোম্পানি নামে গঠিত একটি নূতন কোম্পানি ইংল্যান্ডের রানি মেরির নিকট থেকে রাশিয়াতে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করে।

জন হকিন্সের অভিযান : অন্য একদল ইংরেজ অভিযানকারী পূর্বদিকে পর্তুগাল ও পশ্চিমদিকে স্পেনের বাণিজ্যিক আধিপত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়। এদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন জন হকিন্স (১৫৩২–১৫৯৫ খ্রি.)। হকিন্স কয়েকবার আটলান্টিকের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে অভিযান চালান। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি হিসপানিওলা দ্বীপে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের বিপুল চাহিদার খবর পান। এরপরে তিনি আফ্রিকার গিনি উপকূলে অভিযান চালিয়ে ক্রীতদাস ধরে হিসপানিওলার স্পেনীয়

www.icsbook.info

খামার-মালিকদের কাছে বিক্রি করেন। স্পেনীয়দের নিষেধ অমান্য করেই তিনি এপথে বারবার আসা-যাওয়া করেন। এভাবে একবার আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পথে তিনি স্পেনীয় নৌবহর দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর বড় বড় তিনটি জাহাজ ভেঙে যায় এবং তিনি ও তাঁর সহকারী ফ্রান্সিস ড্রেক কোনও মতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন।

ড্রেক-এর অভিযান : ইংরেজরা এ অপমান ভুলতে পারেনি। ফ্রান্সিস ড্রেক-এর নেতৃত্বে এরপর একদল ইংরেজ নাবিক জলদস্যু তাঁর আশ্রয় নিয়ে স্পেনীয়দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়। এরপর থেকে তিনি ও তাঁর দলবল পানামা যোজক ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্পেনীয় মালবাহী জাহাজগুলোর উপর আক্রমণ চালান। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ড্রেক ম্যাগেলান প্রণালী অতিক্রম করে দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূল বরাবর জাহাজ চালিয়ে উত্তর-আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে পৌঁছে যান। সেখানে থেকে তিনি সোজা পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে ভারত মহাসাগরে উপনীত হন। তারপর আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে পৌঁছেন। তিনি এত পরিমাণ সোনা, রুপা, মশলা এবং রেশম নিয়ে এসেছিলেন যা স্পেনীয়রাও কখনও আনতে পারেনি। ড্রেক-এর এই কৃতিত্বের জন্য ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ তাঁকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন।

ড্রেক-এর এই অভিযান ইংল্যান্ডে পরবর্তীকালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বহন করেছিল। এতদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ছোটখাটো অথচ দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজগুলোকে পর্তুগাল ও স্পেনের বৃহৎ পরিসরের জাহাজের তুলনায় নগণ্য মনে করা হত, সেগুলোই দেখা গেল দূরপাল্লায় পাড়ি দেয়ার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। পোপের নিষেধাজ্ঞা সরাসরি অমান্য করে ইংরেজরা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই অভিযান চালায়। পশ্চিমদিকে ষোড়শ শতাব্দীর পরে বর্তমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা একে একে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্বদিকের অভিযানে তাদের প্রাথমিক তৎপরতা ছিল বাণিজ্যভিত্তিক। পর্তুগালকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজরা পূর্বদেশের বাণিজ্যে ভাগ বসায়। লন্ডন শহরের একদল বণিক ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারত-মহাসাগরে বাণিজ্যের জন্য কয়েকটি জাহাজ পাঠায়। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানে তারা বিপুল পরিমাণে মুনাফা লাভ করে। এরপরে প্রায় তিনজন ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকারের কাছে বাণিজ্যিক সনদের জন্য আবেদন করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পূর্বদিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ প্রদান করেন। ১৭৫৭ সালে এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে।

ফ্রান্সের ভৌগোলিক অভিযান

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ফ্রান্সও ভৌগোলিক অভিযানে তৎপর হয়। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফ্রান্সে মৎস্যশিকারিরা ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে গিয়ে মাছ ধরত। প্রচুর মাছ ধরে এনে

www.icsbook.info

বিক্রি করে তারা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করত। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস জিওভান্নি বেরাজানো (Giovanni Verazano) নামে একজন অভিযানকারীকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করেন। তিনি উত্তর-আমেরিকার নিউজার্সি (New Jersey) থেকে কেপ কড (Cape Cod) পর্যন্ত অঞ্চল আবিষ্কার করেন।

এক দশক পরে প্রথম ফ্রান্সিস জ্যাক কার্টিয়ার (Jacques Car:ier) কে পশ্চিমদিক দিয়ে চীনে যাওয়ার পথের সন্ধানে পাঠান। কার্টিয়ার প্রথমে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে পৌছেন। সেখান থেকে তিনি ক্রমশ বেলি দ্বীপ (Belle isle) এ পৌছান এবং পরে সেন্ট লরেন্স (St. Lawrence) নদীর মোহনা পর্যন্ত পৌছে যান। পরের বছর তিনি একই পথে গমন করে সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যদিয়ে অনেকদূর এগিয়ে একটি পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত যান। এখানকার নাম দেয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে মন্ট রিয়াল (Mont Real)। এর এখনকার নাম মন্ট্রিল (Montreal)। কার্টিয়ার ভেবেছিলেন যে তিনি এই পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে চীনে যাওয়ার রাস্তা আবিষ্কার করতে পারবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিফল হন। এরপরে অর্ধ-শতাব্দী ধরে ফ্রান্সের সরকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার দরুন এদিকে আর নজর দিতে পারেনি। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফ্রান্স আমেরিকার পোর্ট রয়্যাল (Port Royal) এবং ক্যানাডার কিউবেক (Quebec)-এ দুটি ঘাঁটি তৈরি করে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল

অর্থনৈতিক : ভৌগোলিক আবিষ্কারের সবচেয়ে প্রধান যে ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হল ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি। ভৌগোলিক আবিষ্কার অর্থনৈতিক কার্যকালাপের পরিসর বৃদ্ধি করেছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বিপুল পণ্যসম্ভার ইউরোপের মাটিতে জমা হল। এশিয়া থেকে এসেছিল মশলা, ঔষধ, তুলা, রেশম, হাতির দাঁত, নীল, চিনি, মেহগনি ও চন্দন কাঠ, কফি, চা, কার্পেট, কম্বল, চীনামাটির দ্রব্যাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ও মূল্যবান পাথরসমূহ।

আমেরিকা থেকে আনা হল বিপুল পরিমাণে সোনা ও রুপা। এ ছাড়া এসেছিল তামাক, কোকো, কুইনাইন (সিংকোনা গাছ থেকে তৈরী), ভুট্টা, আলু, মেহগনি, লিমা বীন্‌স্ (একধরনের শিম বা বরবটি) ইত্যাদি।

আমেরিকার মাটিতে ইউরোপীয়রা নিয়ে গিয়েছিল ঘোড়া, গাধা, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, লেবু, কমলা, কলা, জলপাই, আঙ্গুর এবং খাদ্যশস্য। পরবর্তীকালে ইউরোপ রপ্তানি করতে শুরু করল গম, সূতি ও পশমি বস্ত্র, বারুদ, লোহার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য তৈরী দ্রব্যাদি।

এশিয়া ও আমেরিকা থেকে ইউরোপ আমদানি করত প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল এবং রপ্তানি করত অল্প পরিমাণে তৈরী দ্রব্যাদি।

www.icsbook.info

বণিক পুঁজিবাদের জন্ম : ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে এশিয়া ও আমেরিকা থেকে ইউরোপ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূল্যবান ধাতবদ্রব্য সংগ্রহ করেছিল। এগুলো সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন উপায়ে। লুণ্ঠনের মাধ্যমে, অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে ও বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কর আরোপের মাধ্যমে। এ সম্পদ দ্বারা সঞ্চিত হয়েছিল প্রাথমিক পুঁজি, সূচনা হয়েছিল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। এ পুঁজিবাদ বণিক পুঁজিবাদ, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে এ পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ পুঁজিবাদের মাধ্যমে যে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল তার দ্বারা পরবর্তীকালের শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে যে শিল্প-পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছিল, সেখানে এই প্রাথমিক পুঁজিকে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

গিল্ডপ্রথার ভাঙন : অবাধ বাণিজ্য : ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে গিল্ডপ্রথার গণ্ডি ভেঙে অবাধ বাণিজ্য স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃহৎ বৃহৎ নৌবহর ছুটে চলল বিভিন্ন দিকে, পাড়ি দিতে শুরু করল আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর। আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত দেশগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল সর্বাধিক। এতদিন ইতালি যে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করেছিল তার ক্রমে ক্রমে অবসান ঘটল। পর্তুগাল, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবন্দরগুলো এখন সবচেয়ে গুরুত্ব পেল। জেনোয়া, ভেনিস ও পিসার স্থলে এখন আধিপত্য বিস্তার করল লিসবন, সেভিল ও অ্যান্টওয়ার্প বন্দর।

বণিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে গড়ে উঠল বিভিন্ন বণিক কোম্পানিগুলো। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমগ্র পৃথিবীকে বাণিজ্যের সূত্রে আবদ্ধ করে দিল। এগুলোর নাম : মাস্কভি কোম্পানি (১৫৫৪), টার্কি-লেভান্ট কোম্পানি (১৫৮১), মরক্কো কোম্পানি (১৫৮৫), গায়েনা কোম্পানি (১৫৮৮), ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০), ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, কোম্পানি অব নিউ ফ্রান্স (১৬২৮) ইত্যাদি।

সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা ছাড়াও এগুলো ব্যবসায়ীদের ট্রেনিং দেয়া, উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রভৃতিতে অবদান রেখেছিল।

ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসে গড়ে উঠল ছোটখাটো কুটিরশিল্পভিত্তিক কারখানা : এর মালিকদের ব্যবসায়ীরা ঋণ প্রদান করত এবং সেইসাথে যোগান দিত কাঁচামাল। তারাই আবার এসব কারখানা থেকে পণ্য সংগ্রহ করত। এভাবে গিল্ড মালিকদের কর্তৃত্ব বিতাড়ন করে স্থাপিত হল ব্যবসায়ীদের আধিপত্য। আমেরিকা থেকে সোনা ও রুপার ব্যাপক আমদানি মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিকে আবার ফিরিয়ে আনল। সাথে সাথে দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি এবং একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা দিল মুদ্রা সঞ্চয়ের প্রবণতা।

www.icsbook.info

বণিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের সাথে আরও গড়ে উঠল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ইনসিওরেন্স বা বীমা কোম্পানি এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। পুঁজিবাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এরাই গ্রহণ করল। এ পুঁজিবাদের স্বার্থে সৃষ্ট হল ক্রীতদাস প্রথার। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া নিগ্রোদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া হল আমেরিকার বাজারে। তাদের নিযুক্ত করা হল ক্ষেতে, খামারে, খনিতে, রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে। স্পেন, পর্তুগাল ও ইংল্যান্ডের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল দাস-ব্যবস্থা।

সামাজিক ফলাফল

বার্গারশ্রেণীর জন্ম : বণিক পুঁজিবাদ সৃষ্টি করল বার্গার বা বণিকশ্রেণীর। এদের হাতে সঞ্চিত হল বিপুল ধনসম্পদ। সামন্তব্যবস্থাকে এরা ভাঙতে উদ্যত হল। সামন্তপ্রভুদের মধ্যে কেউ কেউ বার্গারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল। আবার কেউ কেউ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ভূমিদাসরা অধিকাংশ এসে ভিড় জমাল শহরে। ছোটখাটো কারখানায় এরা নিযুক্ত হল শ্রমিকরূপে। যারা গ্রামে থেকে গেল তারাও আবার ভাড়াটে শ্রমিকরূপে ক্ষেতে খামারেও নিয়োজিত হল।

মধ্যযুগের গিল্ডগুলো ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সঙ্গতি না রাখতে পেরে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ছোটখাটো শিল্প-কারখানা থেকে প্রস্তুত হল বিভিন্ন দ্রব্যাদি। এগুলোর কিছু কিছু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে চালান দেয়া হল। অবশিষ্ট পণ্য উপনিবেশগুলোর বাজারে প্রেরিত হল।

বার্গারশ্রেণী নিজ নিজ দেশে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করল। সামন্তপ্রভুদের উৎখাত করল রাজাদের দ্বারা। পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য সামন্তপ্রথার অবসান না ঘটিয়ে আর কোনো উপায় ছিল না। এদের দ্বারাই আবার ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডস-এ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র উৎখাত হয়েছিল। বার্গারশ্রেণীর পরিসর, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির ফলে সমাজে নতুন শ্রেণীবিন্যাস সৃষ্টি করল। তারা নতুন ধারণা, নতুন চিন্তার জন্ম দিল।

রাজনৈতিক ফলাফল

ভৌগোলিক আবিষ্কার দেশে দেশে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে জাতীয় রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠার কাজকে সহায়তা করেছিল। এদের অধীনে গড়ে উঠেছিল রাজকীয় সেনাবাহিনী। এসব সেনাবাহিনীর হাতে এল কামান, বন্দুক ইত্যাদি মারণাস্ত্র, যার দ্বারা তারা অতি সহজেই দমন করল আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের।

তারা দখল করল আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশ। এসব সেনাবাহিনীকে পরবর্তীতে কাজে লাগানো হল উপনিবেশগুলোর বাজার দখলের জন্য।

www.icsbook.info

ফলে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হল হানাহানি ও যুদ্ধ। পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে যে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হ'য়েছিল তার মূলে ছিল এই উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা।

জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বপ্রথমে ইংল্যান্ডে ১৪৮৫ সালে, এরপরে স্পেনে ১৫৫৬ সালে, ফ্রান্সে ১৫৮৯ সালে, রাশিয়াতে ১৬৯৮ সালে এবং প্রুশিয়াতে ১৭১৩ সালে।

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে বণিকশ্রেণীর সহায়তায় এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে, তথাপি এর ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল জাতীয় রাজন্যবর্গ। জাতীয় রাজাদের অধীনেই ছিল জাতীয় সম্পদ এবং সকল রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য। এর নাম রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বা মার্কেন্টাইলজম (Mecantilism)।

গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা সংগ্রাম : এ রাষ্ট্রীয় আধিপত্য থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় বণিকশ্রেণীর দ্বারাই এবং এজন্য দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের লড়াই চলে জাতীয় রাজাদেরই বিরুদ্ধে। এরই ফলে সংঘটিত হয় ইংল্যান্ডের ১৬৪০-৪১-এর গৃহযুদ্ধ ও ১৬৮৮'র 'গৌরবময় বিপ্লব'; ১৭৭৫-১৭৮৩-এর 'আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ'; এবং ১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর 'ফরাসি বিপ্লব', যার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী। এসব রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ফলেই রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশ বণিকশ্রেণীর করায়ত্ত হয়।

রাষ্ট্রের অধিকারীদের ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে বদলে যায় রাজনৈতিক মতবাদ। প্রথমদিকে প্রাধান্যলাভ করেছিল রাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি ধারণা জন্মলাভ করে। একইভাবে পোপতান্ত্রিক ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে জন্ম নেয় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ। যে সকল দেশ প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে সর্বপ্রথম দীক্ষালাভ করে; যেমন ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ইত্যাদি, তারা সর্বপ্রথম পোপের বন্ধন ছিন্ন করে ক্রমে জাতীয় রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগলাভ করে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ চলাচল বৃদ্ধি পেল। নতুন দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হয়ে সেসবের অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা দিল কারো কারো মনে। ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটানোর তাগিদ দেখা দিল যেমন একদিকে রাজারাজড়া ও বড় জমিদারের মধ্যে, তেমনি দেখা দিল একশ্রেণীর নব্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

এর ফলে একদিকে যেমন পার্থিব জীবনের প্রতি দেখা দিল প্রচণ্ড আগ্রহ, তেমনি আগ্রহ দেখা দিল পার্থিব জীবনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, সমুদ্রবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যেমন

www.icsbook.info

পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করল, তেমনি পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকেই পাল্টে দিল।

রেনেসাঁর জন্ম : ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল। বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে ইউরোপের জনগণ তার ক্ষুদ্র সামন্ত ম্যানরের গণ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ইউরোপের মানবগোষ্ঠী অন্তত কিছুটা হলেও তার মনের সংকীর্ণ সীমারেখাকে অতিক্রম করে উদার ভাবধারার বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল।

ধনসম্পদের সঞ্চয় তার মনকে সার্বক্ষণিক পারলৌকিক চিন্তাভাবনা থেকে ইহলোকের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল। এই ইহজাগতিক চিন্তা ও মানবতাবোধের উদার আদর্শের নামই রেনেসাঁ। ভৌগোলিক আবিষ্কার এক অর্থে রেনেসাঁরই পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

www.icsbook.info

তৃতীয় অধ্যায়
ধনতন্ত্রের বিকাশ

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলেও ইতালির বাণিজ্যবন্দরগুলো কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রেখেছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও আরব বণিকদের সাথে ব্যবসা করে এরা বেশকিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছিল। ক্রুসেডের জন্য এদের সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথগুলো দখল করা।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছি। এখন আমরা এর বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবসা বোঝায়, যা সামন্ততন্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। সামন্ততন্ত্রের প্রধান উপকরণ জমি। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের প্রধান উপকরণ পুঁজি। এ পুঁজির অস্তিত্ব কখনও ধনসম্পদরূপে, যেমন : কাঁচামাল; আবার কখনও টাকাপয়সা বা সোনা, রুপা ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হয়। এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করা হয় কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে, কখনও শিল্প-কারখানায়। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ মুনাফা অর্জন। সেই অর্জিত মুনাফাকে আবার নতুন করে বিনিয়োগ করা হয় আরও অধিক মুনাফালাভের আশায়। এভাবে পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলে। পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে মুনাফার পরিমাণ স্থির করা হয় টাকার বা অর্থের পরিমাণ দ্বারা। অর্থাৎ অর্থ বা টাকাপয়সা (Money) এ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।

পুঁজিবাদের সাথে আরও একটি প্রধান বিষয় জড়িত, সেটা হল শ্রম বা জনশক্তি। বিনিয়োগকৃত পুঁজি বৃদ্ধি পায় শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা। উৎপাদনের সাথে এ শ্রমশক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই কলে-কারখানায় পণ্য উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদিত পণ্য বিক্রির মাধ্যমেই অর্জিত হয় মুনাফা। শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরি প্রদান করে তার নিয়োগকারী অর্থাৎ কারখানার মালিক। পণ্য উৎপাদনের এবং বাজারজাতকরণের সংগঠক হলেন এই মালিক। মাল বিক্রি করে মুনাফার অধিকারী হন এই মালিক বা পুঁজিপতি।

www.icsbook.info

ধনতন্ত্রের উন্মেষস্থল : ইতালি

ক্রুসেডের মাধ্যমেই ধনতন্ত্রের ক্রমশ উন্মেষ ঘটতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এ ধনতন্ত্র শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য এ ধনতন্ত্রকে বলা হয় বণিক ধনতন্ত্র। ক্রুসেডের মধ্যদিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ক্রুসেড শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এ যোগাযোগ শুধুমাত্র অব্যাহত থাকেনি, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও পরিসর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতালির বাণিজ্যবন্দরগুলো, যেমন জেনোয়া, ভেনিস ও পীসা প্রধানত এ বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র ছিল। ক্রুসেডের মধ্যদিয়ে এ নগরগুলো তাদের বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করে।

ক্রুসেডের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পোপ। কিন্তু পোপকে অর্থের যোগান দিয়েছিল ইতালির বণিক সম্প্রদায়। ক্রুসেডের জন্য সমরাস্ত্র কেনা, জাহাজ কেনা ও অন্যান্য কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অর্থ যুগিয়েছে ইতালির বণিকেরা। এদের দ্বারাই ক্রুসেডের সময়ে অতি ধীরে হলেও মুদ্রাভিত্তিক (Money) অর্থনীতি আবার চালু হল, যা মধ্যযুগে ইউরোপে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চার্চের মধ্যে এত দিনের সঞ্চিত মূল্যবান সোনা ও রুপা ক্রমে মুদ্রার আকারে বাজারে ছাড়া হল। প্রথমত রুপার মুদ্রারই প্রচলন হয়। পরবর্তীতে স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন ঘটে। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হওয়ার সাথে সাথে মূলত ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারগণ কনস্টান্টিনোপল অধিকার করলে এ নগরীর বিশাল স্বর্ণসম্পদ ভেনিসের দখলে আসে। তাছাড়া ক্রিমিয়ার বিশাল সোনার খনিগুলোকে ভেনিস দখল করে নেয়। কিন্তু আধুনিককালের শুরুতে ইউরোপে প্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিল ভেনিস নয়, ইতালির আরেকটি শহর – ফ্লোরেন্স; ১২৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সই সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা ফ্লোরিন (Florin) বাজারে ছেড়েছিল। ফ্লোরেন্সকে অনুসরণ করে ভেনিস প্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে। ফ্লোরিন-এর মানের সমপরিমাণ এ মুদ্রার নাম ছিল ডুকাট (Ducat), পরে এর নাম হয়েছিল সেকুইন (Sequin)।

পুঁজিবাদের প্রাথমিক শর্ত হল পুঁজি সঞ্চয়। এ পুঁজি সঞ্চিত হচ্ছিল ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও জেনোয়ার বণিকদের দ্বারা ক্রুসেডের অনেক আগে থেকেই। কনস্টান্টিনোপল ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম-অধিকৃত শহরগুলোর সাথে এবং প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করেই তারা এই অর্থ সঞ্চয় করে। ক্রুসেডের সাথে সাথে এ বাণিজ্য ক্রমশ বেড়েই চলে। ইতালির শহরগুলো ক্রুসেডারদের দ্বারা দখলকৃত দেশগুলোতে বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরি করে। ক্রুসেড শেষ হলেও সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সাথে ইতালির বাণিজ্যসম্পর্ক টিকে রইল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলো ইতালির দখলে আসার ফলে ঈজিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসকল অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী হল ইতালি। এসকল বাণিজ্য

www.icsbook.info

ইতালি পরিচালনা করত পাইকারি ব্যবসায়ীদের দ্বারা। পাইকাররা খুচরা ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র দোকানদারদের কাছে পণ্য বিক্রি করত।

১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ইতালির একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে প্রচুর পুঁজি সঞ্চিত হয়। তারা আবার ছিল বড় বড় বাণিজ্যিক নৌবহরের মালিক। তারা নিজেরা বাণিজ্য অভিযানে অংশ না নিয়ে ঘরে বসেই এসকল অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিত। এ সকল অভিযানে এসব ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করত।

ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের তুলনায় তারা ছিল অনেক বড় ব্যবসায়ী। তাদের বিশ্বস্ত বেতনভোগী অথবা কমিশনপ্রাপ্ত কর্মচারীরা মাল কেনাবেচা এবং আনা-নেয়ার তদারক করত। প্রাচ্যের বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ইউরোপের বাজারে এত অধিক ছিল যে ইতালির বণিকরা শুধুমাত্র সেগুলো আমদানি করেই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার অপরিসীম সুযোগ পায়। এ বাণিজ্য থেকেই গড়ে ওঠে বিপুল পুঁজি। সে পুঁজিকে আবার বিনিয়োগ করে বাণিজ্য-পরিসর ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও ইতালিতে পুঁজি সঞ্চিত হয় অর্থ ঋণদানের মাধ্যমে। ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের কয়েকটি পরিবার ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তারা নিয়মিতভাবে টাকা ধার দিত রাজাদের এবং পোপদের – সৈন্য পোষা ও অন্যান্য কার্যের জন্য। এ ছাড়া তারা টাকা ধার দিত জেনোয়া ও ভেনিসের ব্যবসায়ীদের – ব্যবসায় টাকা লগ্নি করার জন্য। এসকল ব্যাংকিং পরিবারের মধ্যে ফ্লোরেন্সের মেডিসিদের নাম সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে মেডিসিরা ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী। নব্য পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি এই মেডিসিরাই তৎকালীন ইতালির শিল্প, সাহিত্য ও নতুন ভাবধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরাই ছিলেন নবোদিত ইতালির রেনেসাঁর প্রধান ধারক ও বাহক।

ইতালির পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের মাধ্যমে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির ফ্লোরেন্সের বণিকেরা পুঁজি বিনিয়োগ করতেন পশমশিল্পে। বিদেশ থেকে পশম কিনে সেই পশম রঙ এবং প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে পশমি বস্ত্র তৈরি করা হত। সেই তৈরী পশমি বস্ত্র আবার বিদেশে চালান দেয়া হত।

ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সোনা ও রুপার যোগান ছিল খুবই সামান্য। অতএব খনিগুলোতে খনন-কাজ জোরদার করা হল। ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সাইলেসিয়া ও হাঙ্গেরির খনিগুলোতে খননকার্য চলল পুরোদমে। কিন্তু ফল পাওয়া গেল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। অবশ্য পরবর্তীকালে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপার আমদানি হওয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ঘাটতি দূর হল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইতালির নগররাষ্ট্রগুলো ক্রমশ ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। এ বিকাশ তত সহজ ছিল না। অবাধ বাণিজ্যের পথে প্রধান বাধা ছিল শহরের গিল্ডগুলো। গিল্ডগুলো যদিও প্রাথমিকভাবে শহরবাসীর স্বার্থেই গঠিত হয়েছিল, তথাপি পরে এগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এদের প্রবর্তিত

www.icsbook.info

বিধিব্যবস্থা উৎপাদনের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেয়। সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক প্রসারের প্রয়োজনেই শেষপর্যন্ত গিল্ডগুলোর অবসান ঘটানো হয়। গিল্ডব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থেকে উৎপাদন, প্রথার কলাকৌশলগত উন্নতি ঘটানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে উৎপাদনের অগ্রগতিও আর হচ্ছিল না। অথচ ক্রমপ্রসারমান ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণে। গিল্ডপ্রথা যেহেতু ছিল এসবের পথে অন্তরায়, কাজেই গিল্ডের বাইরেই গড়ে উঠল বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান – কখনও রাষ্ট্রের সহায়তায়, কখনও ব্যক্তি প্রচেষ্টায়। এরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতে শুরু করল। ছোটখাটো কলকারখানায় এরা দু-ধরনের পণ্য তৈরি করত – একটি স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য, অন্যটি রপ্তানির জন্য। যারা রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন করত, তারাই শেষপর্যন্ত পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছিল।

ফ্লোরেন্সের দুই বড় বড় গিল্ড 'পশম গিল্ড' (Arte Della Lana) এবং 'বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীদের গিল্ড' (Artede Calimala) পুরো পশমশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও ফ্লোরেন্সে প্রচুর ভেড়া পালিত হত, তথাপি 'পশম গিল্ড' ইংল্যান্ড, স্পেন ও ফ্লান্ডার্স থেকে প্রচুর পরিমাণে পশম আমদানি করত। এক্ষেত্রে লগ্নি করা হত বিপুল পুঁজি। ফ্লোরেন্সের 'পশম গিল্ড' কখনও কখনও দু বছরের দাম অগ্রিম দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে পশম বা উল আনাত। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই গিল্ডের দুইশত ধনী কর্মকর্তা প্রায় তেরো হাজার কর্মচারীর উপর আধিপত্য চালাত।

'বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীদের গিল্ড' আইন করে দেশীয় উলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। তারা বিদেশ থেকে কাঁচা পশম আমদানি করত। পুঁজিপতি গিল্ড কর্মকর্তারা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে সেগুলোকে ধুয়ে, আঁচড়িয়ে, রঙ করে, রোদে শুকিয়ে সুন্দর উল তৈরি করত। সেগুলো আবার চালান যেত স্থানীয় এবং বিদেশের বাজারে। ইতালির কয়েকটি শহরে এভাবে রেশমশিল্পও গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইউরোপে ইতালি স্থায়ী পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারল না মূলত দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে। এর প্রথমটি হল, ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল অধিকৃত হওয়ার দরুন ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আরব বণিকদের সাথে ইতালির বাণিজ্য-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইতালির সমৃদ্ধির ক্রমশ অবনতি ঘটে।

দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিকের তীরে স্থানান্তরিত হয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো। এর ফলে ইতালির বৈভবের সূর্য অস্তমিত হল।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা : পর্তুগাল ও স্পেন

ভৌগোলিক অভিযানের ফলে পর্তুগাল আবিষ্কার করল ভারতবর্ষে আসার নতুন জলপথ এবং স্পেন আবিষ্কার করল নতুন মহাদেশ আমেরিকা।

www.icsbook.info

মশলা, ওষুধ এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্য, যা এতদিন একচেটিয়াভাবে ইতালি আমদানি করত, এখন থেকে সেগুলো আমদানি করতে শুরু করল পর্তুগাল। ভারতবর্ষ, চীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসব দ্রব্য ইউরোপে আনা হত আফ্রিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। প্রচুর কাঁচামাল জড়ো করা হল লিসবনের বন্দরে। এছাড়া ব্রাজিল থেকে আসত বিবিধ পণ্য। আমেরিকার বাজারে ক্রীতদাস সরবরাহ করে পর্তুগাল প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এভাবে বিপুল পরিমাণে পুঁজি সঞ্চয় করে পর্তুগাল ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পর্তুগালে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেনি। পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র প্রাচ্যে নিজেদের বাণিজ্যঘাঁটি তৈরি এবং বড় বড় জাহাজ ভর্তি করে মাল আমদানি করতেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইউরোপের বন্দরে বন্দরে সেই মাল পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল অন্যরা। পর্তুগাল শিল্পকারখানা গড়ে তোলারও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অধিকতর পরিশ্রমী ইহুদিরা, যারা এ কাজ করতে পারত তাদের দেশছাড়া করা হল। অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পর্তুগিজরা প্রাচ্যদেশে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাল। যে পুঁজি পর্তুগালে এসে জমা হয়েছিল সেগুলো এখন অন্যদেশে চলে গেল কতক ধার শোধ করতে, কতক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিনতে। ফলে পর্তুগাল অনুকূল পরিবেশ লাভ করা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হল। স্পেনের ভাগ্যেও একই পরিণতি হল। স্পেন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ধনতন্ত্র গড়ে তুলতে পারল না।

স্পেনীয়রা ছিল শক্তিশালী যোদ্ধা, উৎকৃষ্ট অভিযানকারী, ধর্মপ্রচারক এবং সোনা-রুপা লুণ্ঠনকারী। কিন্তু তারা সফল ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি হতে পারেনি। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্পেন আমেরিকার হিসপানিওলা (হাইতি), কিউবা, পুয়ের্তো রিকো থেকে জাহাজ ভর্তি করে নিয়মিত সোনা-রুপা স্পেনের বন্দরে আনতে লাগল। পরবর্তীতে মেক্সিকো ও পেরু থেকে বিপুল লুণ্ঠিত সম্পদ এবং ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের পরে সেখানকার খনিগুলো থেকে যথাসম্ভব সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে সোনা ও রুপা স্পেনে এনে জড়ো করা হল।

এ ছাড়া আমেরিকার বিপুল পরিমাণ কাঁচামালের মালিক হল স্পেন। এসব কাঁচামাল এসে বিক্রি করে স্পেন দুশত থেকে তিনশত গুণ লাভ করত। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণে আফ্রিকান নিগ্রোদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করেও স্পেন প্রচুর লাভবান হয়। ক্রীতদাস-ব্যবসা ষোড়শ শতাব্দীতে ছিল বিরাট লাভজনক ব্যবসা।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই ইউরোপে ক্রীতদাস-প্রথা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যায়। মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক প্রথা ছিল সামন্ততন্ত্র। এর প্রধান অঙ্গ ছিল সার্ফ প্রথা (Serfdom)। মধ্যযুগের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সার্ফরাই কৃষিকাজসহ সবধরনের কাজ করত।

কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিক থেকেই সার্ফপ্রথার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। শহরগুলোর উৎপত্তি, কৃষি থেকে কারিগরি ব্যবস্থার পৃথকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা

www.icsbook.info

দেখতে পাই যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছে। এ ব্যবস্থা ইউরোপের মানুষকে ক্রমশ আত্মসচেতন করে তুলেছে। মানুষ ক্রমশ সচেতন হয়েছে নিজের অধিকার সম্বন্ধে, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। যদিও ইউরোপের অধিকাংশ জনগণই ছিল দরিদ্র, তথাপি দাস মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে ছিল না। এক্ষেত্রে হাজার চেষ্টা করলেও তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা যেত না। অথচ আমেরিকার নতুন অধিকৃত ভূখণ্ড আবাদ করার জন্য প্রচুর শ্রমশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। স্পেনীয়রা সেখানে ছিল অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক। বিশাল মহাদেশ, বিস্তৃত বিরাট ভূখণ্ডকে কৃষিকাজের উপযোগী করে তোলা, গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করা, বড় বড় খনি থেকে সম্পদ আহরণ করা, পাহাড় ও নদীর উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা, বাড়িঘর বানানো প্রভৃতি শ্রমসাপেক্ষ কার্যের জন্য বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয় শ্রমিকদের সেখানে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। কেননা নতুন মহাদেশের বৈরী আবহাওয়াতে তাদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙে যেত।

স্পেনীয়রাও চায়নি সেখানে মজুরির বিনিময়ে নিয়োগ করতে। তারা অত্যন্ত সুলভ শ্রমশক্তি সেখানে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিল। এজন্য তারা সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে বর্বর ও সবচেয়ে প্রাচীন প্রথা—দাসপ্রথার আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে পর্তুগিজরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। পর্তুগিজরা ব্রাজিলে ও স্পেনীয়রা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথমে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের ধরে ক্রীতদাস বানিয়ে খনিতে ও খামারে তাদের নিয়োগ করে। স্পেনীয়রা তাদের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও নির্যাতন করত। এ ধরনের ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে রেড ইন্ডিয়ানরা অচিরেই মৃতুবরণ করত। অনেকে আবার এ অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যার আশ্রয় নিত। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারিবীয় দ্বীপগুলোতে এভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে অত্যাচারের ফলে জনবিরান হয়ে পড়ে। সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এসকল ঘটনা অনেক খ্রিস্টান মিশনারি ও জনদরদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে বার্টোলোমি ডি লাস ক্যাসাস (Bartolome de las casas) নামে একজন খ্রিস্টান মিশনারি বিশপ স্পেনের রাজার কাছে প্রস্তাব দেন যে আফ্রিকার নিগ্রোরা রেড ইন্ডিয়ানদের তুলনায় শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু। রেড ইন্ডিয়ানদের পরিবর্তে তাদেরকে ধরে এনে বরং ক্রীতদাসরূপে নিয়োগ করা হোক। তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পর্তুগিজরা আফ্রিকান ম্যুরদের কাছে থেকে নিগ্রোদের ধরে ক্রীতদাস বানানোর কৌশল আয়ত্ত করে। নিগ্রোদের ক্রীতদাস বানিয়ে নিয়ে তারা একাধারে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার এবং আমেরিকার বাজারে ক্রীতদাসরূপে চালান দেয়ার সুযোগলাভ করে। আফ্রিকার গিনি উপকূলে নিগ্রো ক্রীতদাস বাজার গড়ে ওঠে। পর্তুগিজরা নিগ্রোদের ধরে ধরে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রাজিলে চালান দিত।

www.icsbook.info

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা নেদারল্যান্ডস-এর একজন স্পেনীয় প্রজাকে প্রতি বছর চার হাজার নিগ্রোকে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চালান দেয়ার একচেটিয়া অধিকার (সনদ) প্রদান করেন। সেই লোকটি তার সনদটি কয়েকজন জেনোয়ার ব্যবসায়ীদের কাছে পঁচিশ হাজার ডুকাটে বিক্রি করে। সেসব ব্যবসায়ীরা পর্তুগিজদের নিকট থেকে নিগ্রোদের ক্রয় করত। এভাবে পর্তুগিজ অধিকৃত আফ্রিকা ও স্পেনীয় অধিকৃত আমেরিকার মধ্যে বিরাট দাস ব্যবসা গড়ে ওঠে। কালক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয়রাও এ ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম ক্রীতদাসবাহী জাহাজ বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) নামে পরিচিত দেশটির জেমস টাউন (James Town) বন্দরে পৌঁছায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দাস-ব্যবসার প্রধান অংশীদার ছিল ইংরেজরা। নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ব্যবহার ছিল অবর্ণনীয়। এদের নিষ্ঠুর নির্যাতন ও অত্যাচারে শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ নিগ্রো আফ্রিকা থেকে আমেরিকা যাওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করত। অবশিষ্টদের আমেরিকার বাজারে বিক্রি করে তাদের দাস হিসাবে নিযুক্ত করা হত খনিতে, খামারে, রাস্তাঘাট তৈরির কাজে। এদের শ্রমশক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে কাজে লাগিয়ে তার উপর গড়ে তোলা হল বিশাল পুঁজির পাহাড় এবং এই পুঁজির অধিকাংশের মালিক হয়েছিল স্পেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পেনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল না। প্রথমত স্পেনের ব্যবসা বাণিজ্যে অতি অল্পসংখ্যক স্পেনীয় নিযুক্ত ছিল। অন্যেরা ছিল কৃষিজীবী। কিন্তু অধিকাংশ স্পেনীয় কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকলেও দেশের আপামর জনগণের খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী তারা জোগাতে পারত না। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত খাত ছিল খুবই সামান্য। স্পেনীয় ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করার জন্য টাকা ধার করত প্রথমে ইতালীয় এবং পরে জার্মান ও ওলন্দাজ ব্যাংকারদের কাছে থেকে। উপনিবেশ লুণ্ঠন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের যা লাভ হত, তার বিরাট অংশ চলে যেত ধার শোধ করতে। অবশিষ্ট লভ্যাংশ দিয়ে অবশ্য তারা নিজ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু সেটা তারা ব্যয় করল বিলাসদ্রব্য ক্রয়ে এবং বিশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার কাজে।

আমেরিকা থেকে স্পেনে আমদানি করা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপা স্পেনের বাইরেই চলে যেত; এ টাকা দিয়ে কেনা হত খাদ্যশস্য ও বিলাসসামগ্রী। নিজের দেশে কোনো কিছু তৈরি না করে সোনা ও রুপার মুদ্রা দিয়ে স্পেনে অন্যদের কাছ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনত। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সোনা ও রুপা স্পেনীয়দের বিলাসী করে তুলে তাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিল।

ধনতন্ত্রের প্রথম প্রয়োগ : নেদারল্যান্ডস

প্রথম যে দেশে ধনতন্ত্র সফলভাবে বিকাশলাভ করে সে দেশ হল নেদারল্যান্ডস। নেদারল্যান্ডসে প্রথম থেকেই পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর বড় শহর,

www.icsbook.info

যেমন ঃ ব্রুজেস, লিজ, ঘেন্ট, ব্রাসেলস এবং ইপরেস বস্ত্র ও পিতলের সামগ্রী প্রস্তুত করত। এসব শহরের ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে কাঁচামাল ক্রয় করত এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে বিক্রি করত। চতুর্দশ শতাব্দীতে এন্টওয়ার্প সে স্থান দখল করে। ষোড়শ শতাব্দীতে আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত এন্টওয়ার্প ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যবন্দর ও পোতাশ্রয়। এ শহরের উদার বাণিজ্যনীতি ও সহজে নাগরিকত্বলাভের সুযোগ বিদেশীদের এখানে আকর্ষণ করেছিল। ইউরোপের বেশির ভাগ ব্যবসায়ী ও ব্যাংকিং পরিবারগুলো এখানে তাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের শাখা খোলে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পর্তুগিজদের দ্বারা আনীত মশলা ও অন্যান্য দ্রব্য এবং স্পেনীয়দের দ্বারা আমেরিকা থেকে আনা বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রথমে এন্টওয়ার্প বন্দরেই জমা হত। এখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে চালান যেত।

প্রতিদিন শত শত জাহাজ এন্টওয়ার্প বন্দরে ভিড়ত, আবার এখান থেকে বিদেশে রওনা হত। এখানকার বড় বড় গুদামে মাল জমা হত। এভাবে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল এন্টওয়ার্প।

আধুনিক ধনতন্ত্রের কতকগুলো দিক এখানে পরিস্ফুট হয়েছিল। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে এন্টওয়ার্প 'স্টক এক্সচেঞ্জ' গড়ে ওঠে। এরা পুঁজি ও পণ্যের বাজারজাতকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর ফলে এখন থেকে ইউরোপের বড় বড় ব্যবসায়ী ও রাজন্যবর্গ টাকা ধার করার জন্য মেডিসি বা ফুগারদের দ্বারস্থ না হয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে টাকা ধার নিত। এন্টওয়ার্প এক্সচেঞ্জের ওপর বাজি ধরাও হত। এখানে লটারি প্রথাও গড়ে ওঠে। জীবন বিমা ও মেয়াদী বিমাব্যবস্থাও গড়ে উঠল। জাহাজ ও মালবাহী পরিবহণগুলোর উপর বিমা প্রথার সৃষ্টি হল। এ ধরনের বিমা প্রথা ইতালীয়রা পূর্বেই তৈরি করেছিল। এন্টওয়ার্প বিমাব্যবস্থার এতখানি প্রসার ঘটেছিল যে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে এ শহরের প্রায় ছয়শো নাগরিক এর ওপরে নির্ভর করে রীতিমতো বিলাসী জীবনযাপন করত।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নেদারল্যান্ডস এর পুঁজিবাদ স্থায়ী রূপ নিতে পারল না। নেদারল্যান্ডস ছিল স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্যেরই একটা অংশ। এর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল স্পেনের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ। এর প্রতি স্পেনের আচরণ ছিল বিমাতাসুলভ। নেদারল্যান্ডস-এর অধিবাসীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে তাদের 'ইনকুইজিশন' (ধর্মীয় আদালত) এর সাহায্যে পুড়িয়ে মেরে যেভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার উপক্রম করা হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল নেদারল্যান্ডস এর অধিবাসীরা। এর ফলেই শুরু হয়েছিল তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর সে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নেদারল্যান্ডস হারিয়েছিল তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। নেদারল্যান্ডস এ পুঁজিবাদ বিকাশলাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হল।

নেদারল্যান্ডস এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিরাট অংশের অধিকারী হল ইউরোপের অন্যান্য দেশ, যেমন : স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো (নরওয়ে,

www.icsbook.info

সুইডেন ও ডেনমার্ক)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে পুঁজিবাদ বেশ ভালোভাবেই শিকড় গেড়ে বসল এবং পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক হল ইংল্যান্ড।

ধনতন্ত্রের সফল জন্মভূমি : ইংল্যান্ড

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ইংল্যান্ড পশমপ্রস্তুতকারী দেশ থেকে বস্ত্রনির্মাণকারী দেশে রূপান্তরিত হল।

ইউরোপের বাজারে ইংল্যান্ডের কাপড়ের চাহিদা ছিল সর্বাধিক। রাজা-মহারাজা, সামন্তপ্রভু, ধনী বিলাসী ব্যবসায়ী সকলের কাছে এর সমাদর ছিল। যদিও অতি অল্প সংখ্যক লোক বস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল, তথাপি ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, যার ফলে ইংল্যান্ডের অর্থনীতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের থেকে স্বতন্ত্রভাবে মোড় নিয়েছিল।

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের অর্থনীতি ফ্রান্সের তুলনায় গ্রামীণ ছিল। এর শহরগুলো ছিল আকারে ছোট, কখনই পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি শহরগুলো। কখনই শহরের জনগণ সামন্তপ্রভুদের বিপরীত শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের সামন্ত অর্থনীতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের সামন্ত অর্থনীতির চেয়ে অধিকতর অগ্রসর ছিল। ইংল্যান্ডের কৃষকরা ছিল অধিকতর স্বাধীন ও কম শোষিত।

ইংল্যান্ডের কৃষকরা চাষাবাদের পাশাপাশি ভেড়া চরাত। কৃষিকার্যের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে তারা কাপড় বুনত। এভাবে সামন্ত অর্থনীতির আওতার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল বস্ত্রশিল্প। ইউরোপের অন্য সব দেশ থেকে স্বতন্ত্র ধারায় গড়ে ওঠে দুর্বল নগর এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক বস্ত্রশিল্পের মধ্যদিয়েই ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদী ধারার সূচনা হয়। যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের ফলে এ ধারার দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

বস্ত্রশিল্পের প্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডের পূর্ব অ্যাংলিয়া, নরউইচ ও আশপাশের উপত্যকা অঞ্চলে। পূর্ব অ্যাংলিয়ার অবস্থান ছিল ফ্লান্ডার্সের বিপরীত তীরে। যখন ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহরগুলো ইউরোপের বাজারে শুধু পশম রপ্তানি করত, পূর্ব অ্যাংলিয়া রপ্তানি করত খাদ্যশস্য ও অতি অল্প পরিমাণ পশম।

পূর্ব অ্যাংলিয়ার পশম ছিল অতি নিকৃষ্ট মানের। বিদেশের বাজারে এর কদর ছিল কম। সে কারণেই ব্যাপকহারে এর উৎপাদন হত না এবং এর মান বাড়ানোর জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হত না। শুধুমাত্র ঘরে বসেই কারিগররা সামান্য কিছু উল তৈরি করত।

মধ্যযুগে নর্মান অভিযানের পর থেকেই ফ্লেমিশ কারিগররা পূর্ব অ্যাংলিয়াতে এসে বসবাস করতে থাকে। এই নব আগন্তুকরাই এখানকার অধিবাসীদের শিখিয়েছিল তাদের উন্নত বস্ত্রনির্মাণ কৌশল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিক থেকেই বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন মানের বস্ত্রনির্মাণের নব নব কৌশল আবিষ্কৃত হয়। অজ্ঞাত অখ্যাত

www.icsbook.info

গ্রামগুলো, যেমনঃ কার্সি (Kersey) এবং ওয়ার্স্টেড (Worsted)-এর নাম ছাপ দেয়া কাপড় সারাদেশে সুপরিচিত হয়ে ইউরোপের বাজারে ফ্লেমিশ কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে।

প্রথমদিকে অর্ধপ্রস্তুত কাপড় রপ্তানি করা হত প্রধানত ফ্লান্ডার্স এ। সেখানে এগুলোকে কাটা ও রঙ করা হত। মুনাফার অধিকাংশ থাকত ফ্লেমিশ ব্যবসায়ীদের হাতে। মূলত হেনসিয়াটিক লীগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে এ কাপড় জমা হত। পরে স্টেপল্ (Staple)-এর ব্যবসায়ীরা এর একচেটিয়া দখল নেয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি বিলাতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ বস্ত্রব্যবসায়ে পুরোপুরি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে এন্টওয়ার্পে তারা কুঠি স্থাপন করে এবং ফ্লেমিশ ও স্টেপল এর ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও উন্নতিলাভ করতে থাকে।

www.icsbook.info

চতুর্থ অধ্যায়
রেনেসাঁ বা নবজাগরণ

রেনেসাঁর অর্থ : ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিচার করলে রেনেসাঁ (Renaissance) শব্দের অর্থ Re-birth বা পুনর্জন্ম।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ইতালিতে ও পরে সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপে প্রাচীন গ্রেকো-রোমান ঐতিহ্যের প্রতি যে প্রবল আগ্রহের জন্ম হয়, সাধারণভাবে তার নাম রেনেসাঁ। মধ্যযুগের ইউরোপের জনগণ সে ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষে এ ঐতিহ্য বিশেষ করে গ্রিক ও রোমান শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে জানার ও নতুন করে তাদের চর্চার জন্য যে বিশেষ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেটাই রেনেসাঁ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁর সংজ্ঞা আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত। রেনেসাঁ শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, রেনেসাঁ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপকে তার পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়, ধনতন্ত্রের উন্মেষ, জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম, বার্গারশ্রেণীর উৎপত্তি, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সূত্রপাত, মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ, নাবিকের কম্পাস প্রভৃতির আবিষ্কার, নবআবিষ্কৃত বাণিজ্যপথ এবং নতুন ভাবধারার জন্ম—সব মিলিয়েই রেনেসাঁ। রেনেসাঁ এক নতুন আদর্শ, নতুন চেতনা।

মধ্যযুগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে ইউরোপের জনগণ যে উদার ও মানবতাবাদী মননশীলতার জগৎ গড়ে তুলেছিল, রেনেসাঁ তারই অভিব্যক্তি। তাই রেনেসাঁ কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপবাসীর মনে যে নতুন চিন্তা ও নতুন ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল, তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে। তাই রেনেসাঁর অর্থ হল –

ক. ইহজাগতিকতা : মধ্যযুগের ইউরোপের জনগণের চিন্তা ও চেতনা আচ্ছন্ন ছিল ধর্মীয় পরিমণ্ডল দ্বারা। পারলৌকিক মঙ্গল কামনা ও তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছিল সেখানে মুখ্য। ইহজগৎ শুধুমাত্র পরলোকে পৌঁছানোর সোপান মাত্র। রেনেসাঁ কেবলমাত্র পরলোকের চিন্তা-ভাবনা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ইহলোকের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকে সরিয়ে এনেছে। তাই রেনেসাঁর এক অর্থ ইহজাগতিকতা (Secularism)।

www.icsbook.info

প্রবল প্রতিপত্তিসম্পন্ন খ্রিস্টান চার্চ সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মানুষের দৃষ্টিকে ইহজগতের বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বর ও পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত রেখেছে। তাকে বুঝিয়েছে যে ইহলোকের প্রকৃত কোনো মূল্য নেই। এ জগৎ শুধু পাপ ও দুঃখে পরিপূর্ণ। যে যত বেশি দুঃখ ভোগ করবে, তার তত বেশি পাপমোচন হবে। কেননা, প্রত্যেকেই মানুষের আদি পিতামাতা আদম ও ঈভের পাপের অংশ বহন করে জন্মেছে।

এ পাপ মোচনের মধ্যেই তার পারলৌকিক সুখ ও মঙ্গল নিহিত। এ পৃথিবী তার ক্ষণকালীন আবাসভূমি, পরলোকে পৌঁছানোর প্রস্তুতি-সোপান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পরলোকই অনন্ত ও চিরন্তন। ইহলোকের কার্যকলাপই মানুষের পরলোকের পাথেয় নির্ধারণ করে দেয় এবং শুধু সে-অর্থেই ইহলোকের গুরুত্ব। কিন্তু সে পাথেয় মানুষ নিজেই সংগ্রহ করতে পারে না। তাকে পথ দেখাবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরপুত্র যিশু। যিশুর প্রদর্শিত পথ ধরেই মানুষ তার কলুষিত আত্মাকে পাপমুক্ত করতে পারে, তার আত্মাকে ক্রমশ পৌঁছে দিতে পারে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে।

মধ্যযুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণভাবে ছিল অরাজকতাপূর্ণ। এই নৈরাজ্যিক পরিবেশে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি ছিল নিরাপত্তাহীন, জীবন ছিল দুঃখজনক। যেহেতু এসবের সমাধান সাধারণ মানুষের হাতে ছিল না, কাজেই তারা এসকল দুঃখ-বেদনাকে ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিয়ে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল পরকালের প্রতি। সেখানের সুখী ও সম্ভোগপূর্ণ জীবনের আশায় সে কোনোমতে টেনে নিয়ে যেত তার ইহজীবনের দুঃখ ও দৈন্যের বোঝা। কিন্তু এটা প্রযোজ্য ছিল শুধু সাধারণ মানুষের, বিশেষত কৃষক ও মেহনতি জনগণের ক্ষেত্রে। অপরদিকে সমাজের পরজীবীশ্রেণী এবং ধর্মযাজকবৃন্দ, যারা অহরহ মানুষকে ধর্মের ভয় এবং পরকালের লোভ দেখিয়ে আকৃষ্ট করত পরকালের প্রতি, বাধ্য করত তাকে ইহকালের সকল সমস্যা সমাধানের থেকে দূরে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে, এদের নিজেদের জীবন কিন্তু ইহজগতের প্রতি নিস্পৃহ থাকত না, বরং সবরকমের সম্ভোগ ও বিলাসিতায় ডুবে থেকে এই পৃথিবীর সকল ভোগ ও ঐশ্বর্যকে তারা তাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তাদের এই জীবনযাত্রা অন্যদের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলত না, সে-কথা সত্য নয়। উচ্চশ্রেণীর ভোগ-সম্ভোগের জীবন সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করত, তারা সেদিকে তাকিয়ে দেখত কখনও ঘৃণায়, কখনও লোভের দৃষ্টিতে, কিন্তু সাধ্য ছিল না তাদের সেদিকে হাত বাড়ানোর। আর ধর্মযাজকদের সেজন্যই বারবার আওড়াতে হত ধর্মের বাণী। নিবদ্ধ করতে বলত তাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে।

মধ্যযুগের শেষদিক থেকে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের উপর ধর্মের প্রভাবও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। উঠতি বার্গারশ্রেণীর মধ্যে ইহজাগতিকতার প্রাধান্য একদিকে যেমন বিস্তারলাভ করতে থাকে, অন্যদিকে পোপের সকল কথায় আস্থা স্থাপনের প্রবণতাও তাদের মধ্যে কমতে শুরু করে। আত্মপীড়ন, আত্মশুদ্ধি, আত্মার মুক্তি ইত্যাদি বাণীগুলো এখন আর তাদের আগের মতো স্পর্শ করে না।

www.icsbook.info

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং নব-উদিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে অধিকতর কর্মঠ ও বুদ্ধিমান করে তোলে। শ্রমের মূল্যের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাবান হয় এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যকে ফেরানো যায়, একথাও ক্রমশ উপলব্ধি করে। কাজেই দৈবনির্ভর না হয়ে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। এই আত্মনির্ভরশীলতাই তার চোখকে ফিরিয়ে আনে পরকালের দিক থেকে, নিবদ্ধ করে তার দৃষ্টিকে ইহকালের প্রতি। মানুষ ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে পার্থিব ধন ও সম্ভোগের প্রতি।

খ. মানবতাবাদ : একথা আগেই বলা হয়েছে যে, রেনেসাঁর জন্ম হয়েছিল সর্বপ্রথম ইতালিতে। ক্রুসেডের মাধ্যমে ইউরোপের বাণিজ্যপথগুলো দখল করেছিল ইতালি। সারা পৃথিবীর বিলাসসামগ্রী জড়ো হয়েছিল ইতালির বন্দরে। ইতালির বণিকশ্রেণী করায়ত্ত করেছিল প্রচুর অর্থ ও সম্পদ। ভোগের উপকরণ অফুরন্ত, ভোগ করার সুযোগ অনন্ত। কাজেই এতদিন ধরে যাদের দর্শন ছিল **'জীবন সংক্ষিপ্ত; এসো, আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য উৎসর্গ করি'** তাদেরই পরবর্তী জীবন-দর্শন হল, **'জীবন সংক্ষিপ্ত; এসো, আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি।'** অবশ্য একথা মনে করা ভুল যে ইহজাগতিকতার অর্থ শুধু ইহজীবনের ভোগ ও বিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া; এর অর্থ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানুষকে শ্রমসচেতন করে তোলে। তাকে আত্মসচেতন করেও তোলে। এতকাল আত্মনিগ্রহ ও আত্মপীড়ন মানবতার যে অবমাননা ঘটিয়েছিল, তার বদলে মানুষ প্রতিষ্ঠিত করল মানবিক মূল্যবোধ, মর্যাদা দিতে শিখল মানুষকে, তার মানবিক গুণাবলীকে। মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নয়, ধর্মের আজ্ঞাবহ দাস নয়, সে মানুষ। তার ভালো-মন্দ দোষ-গুণ মিলিয়েই সে একজন মানুষ, তার ব্যর্থতা, সম্ভাবনা সবকিছু মিলিয়েই সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। রেনেসাঁর এই দর্শনই প্রকাশ পেয়েছে শেকস্পীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের নায়কের মুখ দিয়ে :

> **"What a piece of work is a man! How noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!"**

তাই রেনেসাঁর অপর নাম মানবতাবাদ। রেনেসাঁ মানুষের মানবিক দিকটা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছে। রেনেসাঁ মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, মানবতার জয়গান গেয়েছে।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ, ধর্মের আজ্ঞাবহ জীবের ভূমিকা থেকে তুলে এনে রেনেসাঁ তাকে স্থাপন করেছে এমন এক মর্যাদায়, যেখানে সে নিজেই তার আপন ভাগ্যবিধাতা। তার কর্মের দ্বারা সে প্রশস্ত করেছে আপন জয়যাত্রার পথ, যে পথে কেউ তাকে রুখতে পারেনা—রাজা, জমিদার, পোপ, কেউ নয়। ধর্ম বা সমাজ কেউ তাকে রোধ করতে পারেনি সে প্রকৃতিকে এবং নিজেকে জয় করে সে এগিয়ে চলল চরম অগ্রযাত্রার পথে। সে পথ মানুষের মুক্তিপথ।

www.icsbook.info

ইহজাগতিকতার দর্শন ইউরোপের মানুষের ধর্মচিন্তা ভুলিয়ে দিয়েছিল, একথা ভাবা ভুল। ইউরোপবাসী খ্রিস্টধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, ঈশ্বর ও পরকালকে ভুলে যায়নি। তবে মধ্যযুগের প্রচণ্ড ধর্মবিশ্বাসের ভিত তার মনে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এখনও যদিও তারা খ্রিস্টধর্মের পাপ, পুণ্য, আত্মার মুক্তি ইত্যাদিতে বিশ্বাসী, তথাপি খ্রিস্টধর্ম ও দর্শন তার সমগ্রজীবনকে গ্রাস করে নিতে পারছে না। তার ধর্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পর্যবসিত, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; মধ্যযুগের সার্বিক দর্শনের মতো তার ওপর সামাজিকভাবে এখন আর খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস তত ক্রিয়াশীল নয়।

গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : রেনেসাঁর ইহজাগতিক ও মানবিক দর্শনের আরেকটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যদিয়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) ব্যক্তি হিসাবে মানুষকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়। কোনো একজন বিশেষ মানুষ তার বিশেষ গুণাবলী, বিশেষ কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। প্রতিটি মানুষই আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার বিশেষ গুণ, তার বিশেষ দোষ, সবকিছুই তার নিজস্ব। মধ্যযুগের সামন্তব্যবস্থার পটভূমিতে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে স্বীকৃতি দেয়া হত না, একমাত্র নৃপতি বা সম্রাট অথবা পোপ ছাড়া। সেখানে মানুষের পরিচিতি ছিল তার শ্রেণী হিসাবে—সে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অভিজাত না কৃষক? সামন্তপ্রভুর কাছে তার সব প্রজাই সমান, খাজনা আদায়ের সম্পর্ক মাত্র। কৃষকের কাছে যে-কোনো জমিদারই জমিদার—সমান শ্রদ্ধা ও দূরের পাত্র। মধ্যযুগের শেষের দিকে যে গিল্ডগুলো গড়ে ওঠে সেখানেও কোনো লোক গিল্ডের সদস্য হওয়া মাত্র তার পরিচয় ছিল একমাত্র গিল্ড-সদস্যরূপেই। তার নিজস্ব দক্ষতার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। তার কৃতিত্ব সমগ্র গিল্ডেরই কৃতিত্ব বলে ধরা হত। ভাস্কর্য, শিল্প, কাব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কোনো শিল্পী বা কবি তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিলাভ করতেন না। এজন্য মধ্যযুগের অনেক ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে শিল্পীর নাম খোদিত বা লেখা থাকত না। অনেক কবিতা পাওয়া গেছে, যাঁদের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এঁরা নীরবে তাঁদের শিল্পকর্মকে শুধু ঈশ্বরের প্রশস্তির জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। খ্রিস্টান চার্চ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করত ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ এবং পাপরূপে। সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ, বিনা প্রতিবাদে সবকিছুকে মেনে নেয়াই ছিল সে-যুগের বিধান। কিন্তু রেনেসাঁ-যুগের শিল্পী, ভাস্কর, কবি বা সাহিত্যিক প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বে অনন্য, তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় ভাস্বর। প্রত্যেকের শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁর নিজস্ব স্টাইল, নিজস্ব ভাব, নিজস্ব ভঙ্গিমা সুপরিস্ফুট। একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেও প্রত্যেকেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। এজন্যই তাঁরা গর্বিত এবং তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে এসেছে উজ্জ্বলতা, এসেছে স্বাভাবিকতা। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাটি অবলুপ্ত হয়ে গেল, তখনই এল গতানুগতিকতার ধারা। শিল্পী কবি, সাহিত্যিকরা এখন শুধু একে অন্যকে অনুকরণ করার নির্লজ্জ প্রয়াসে লিপ্ত। সাহিত্য হারাল তার স্বাভাবিক রস ও সৌন্দর্য, শিল্প হারাল তার স্বাভাবিক দীপ্তি ও সৌকর্য।

www.icsbook.info

রেনেসাঁ-যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার, রোমের বর্জিয়া পরিবার, শিল্পী বতিচেল্লি, রাফায়েল, দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো; সাহিত্যের ক্ষেত্রে পেত্রার্ক, বোকাচ্চিও; পোপের মধ্যে দ্বিতীয় জুলিয়াস ও দশম লিও; বিজ্ঞানে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং ভেসালিয়াস-এর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। রেনেসাঁর বিভিন্ন দিকে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য তাঁরা চিরস্মরণীয়।

রেনেসাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল প্রবিষ্ট ছিল তৎকালীন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির অংশগ্রহণ আবশ্যিক ছিল। সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব শ্রম আদায় করত। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সমাজের প্রতিটি মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, তার কাছ থেকে পরিপূর্ণ শ্রম ও দক্ষতা আদায় করে নেয়া। এজন্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিটি মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটায়, তাকে আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল করে তোলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা গণতান্ত্রিক ধারণার জন্ম দিয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালির একজন বিখ্যাত শিক্ষক ভিত্তোরিনো অব ফেল্‌তর (Vittorino of Feltre) ইতালির মানতুয়া শহরে অবস্থিত তাঁর বিদ্যাপীঠের জন্য একটি উদারনীতি সম্বলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (curriculum) প্রণয়ন করেন। এতে মধ্যযুগের শেষের দিকে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাসূচি, (ব্যাকরণ, ছন্দ প্রকরণ ও যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সংগীত) ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হত। এছাড়াও বিশেষভাবে শেখানো হত রাজদরবারের রীতিনীতি, নৃত্য ও চিত্রাঙ্কণবিদ্যা (Drawing and Painting)। কর্মঠ শরীর ও সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলার উপরও বিশেষ জোর দেয়া হত। এই বিদ্যাপীঠের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন তৎকালীন মানবতাবাদী লরেঞ্জো ভাল্লা।

শরীর ও মনের সকল গুণের সুসামঞ্জস্য বজায় রাখা এ-ধরনের শিক্ষাসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেহের বলশালিতা অর্জন ও মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যদিয়ে গড়ে তোলা হত একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে বালদাসার ক্যাসটিলিয়ন (Baldassare Castiglione) তাঁর *Book of the Courtier* গ্রন্থে একজন পরিপূর্ণ আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে একজন আধুনিক মানুষ হবে একাধারে ভদ্রলোক, রণনিপুণ সৈন্য, একজন কর্মঠ মানুষ এবং শিক্ষিত। তাঁকে গ্রিক ও ল্যাটিন জানতে হবে, তাঁকে ভালো খেলোয়াড় হতে হবে; ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, দৌড় প্রভৃতিতে পারদর্শী হতে হবে যাতে তার দেহ সুগঠিত ও মজবুত হয়। তিনি হবেন নৃত্যকুশলী ও রসবোদ্ধা, কিন্তু তাঁর মধ্যে থাকবে না কোনো দাম্ভিকতা ও ভণ্ডামি। বালদাসার-এর গ্রন্থ তৎকালীন ইউরোপের সর্বত্র বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। একজন আদর্শ মানুষের যে সংজ্ঞা তিনি প্রদান করেছিলেন, তাকে অনুসরণ করেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সভাসদরা নিজেদের তৈরি করতে চেষ্টা করেন। সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যেও এর প্রভাব দেখা দেয়। ইংল্যান্ডে লিলি (Lyly) তাঁর 'ইউফিয়াস' (*Eupheus*) গ্রন্থে এবং স্পেন্সার তাঁর 'দ

www.icsbook.info

ফেয়ারি কুইন' (*The Faerie Queene*) গ্রন্থে উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

রেনেসাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা গণতান্ত্রিক ধারণার জন্ম দিয়েছে। প্রতিটি মানুষ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, একটি স্বতন্ত্র সত্তা—এই ধারণাই জন্ম দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যবোধের, ব্যক্তিস্বাধীনতার, ব্যক্তিগত অধিকারের। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে মানুষের চিন্তা ও মননের জগতে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটাই হতে থাকে প্রধান হাতিয়ার।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট এ দাবি নিয়েই প্রথম উপস্থিত হয়। পুরো সপ্তদশ শতক ধরে চলে তাদের সংগ্রাম রাজার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের দাবিতে। তাদের সফলতায় উজ্জীবিত হয় আমেরিকা ও ফ্রান্স। পরে ক্রমশ এটা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

ঘ. সৌন্দর্যবোধ : ইহজাগতিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উদ্দেশ্যবিহীন বা নৈরাজ্যমূলক হতে পারে না। মানুষের মুক্তি হল বিশেষ উদ্দেশ্যে। রেনেসাঁ-যুগে সে মুক্তির লক্ষ্য ছিল পরম সৌন্দর্যের আরাধনা। রেনেসাঁর ইহজাগতিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানবমনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। শিল্পী ও ভাস্করের চিত্তে রেনেসাঁ মানবদেহ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন ধারণার জন্ম দিতে পেরেছে। মানবদেহের সৌন্দর্য বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোনো শয়তানের সৃষ্টি নয় বা ঘৃণার বস্তু নয়—মানবচিত্তের বিভ্রম ঘটাতেই কেবল ওদের সৃষ্টি হয়নি। এগুলো মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার দান। এগুলো গ্রহণ করা, নির্মল দৃষ্টিতে এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করার মধ্যদিয়ে মানুষের মনেরই প্রসার ঘটে। মানুষের মন হয় উদার অবারিত। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সে আনন্দের সাগরে অবগাহন করতে পারে। এই সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা রেনেসাঁরই বিশেষ অবদান। সেজন্যই রেনেসাঁর অভিব্যক্তির চরমতম প্রকাশ ঘটেছে শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে, যেখানে মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও চেতনাকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে।

ঙ. বিজ্ঞানমনস্কতা : মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে প্রাকৃতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। মানুষ ও প্রকৃতিকে জানতে গিয়েই মানুষ আবিষ্কার করেছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও জ্ঞান। মধ্যযুগের চার্চ মানবদেহ-কর্তন (dissection) ও বিশ্লেষণকে অপরাধ বলে গণ্য করত। এর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু চার্চের সে রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করেই হার্ভে ও ভেসালিয়াস মানবদেহের অভ্যন্তরের সঠিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে রাখতে পেরেছিলেন বিশেষ অবদান। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েই কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে মধ্যযুগের প্রচলিত ধারণাকে বাতিল করে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানের উৎস —এ ধারণাও রেনেসাঁরই সৃষ্টি।

www.icsbook.info

ইহজাগতিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সৌন্দর্যচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ প্রভৃতি ছাড়াও রেনেসাঁর আরেকটি দান হল শ্রমের মর্যাদাদান। রেনেসাঁ-যুগে সত্যিকার শ্রমিকের মর্যাদা দেয়া হত, যাঁরা পুরো মধ্যযুগ ধরে ছিলেন উপেক্ষিত, অবহেলিত। বিভিন্ন কারিগরি পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগর, যেমন সূতা কাটার শ্রমিক, তাঁতি, কাচশ্রমিক, তৈজসপত্র প্রস্তুতকারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল সমাজে; যেমন মর্যাদা ছিল বিশিষ্ট্য শিল্পী, ভাস্কর, কবি-সাহিত্যিকের। 'যে-কোনো উপায়ে ধন অর্জন করো' – এটাই ছিল সে-যুগের দর্শন, কাজেই প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের মর্যাদা দেয়া হত বিশেষভাবে, যা আগে কখনও করা হয়নি।

ইতালির রেনেসাঁ

ইতালিতে রেনেসাঁর উৎপত্তির কারণ

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ইতালিতেই রেনেসাঁর উৎপত্তি হল? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের তৎকালীন ইউরোপের, বিশেষ করে ইতালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১. ইতালি ছিল তৎকালীন ইউরোপের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইতালির বাণিজ্যবন্দরগুলোর মধ্যদিয়েই প্রাচ্যের পণ্যসামগ্রী ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর পৌঁছে যেত। এই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়েই ইতালিতে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে শহরগুলো তাদের পরিপূর্ণ নাগরিক রূপ নিয়ে। ইতালির জেনোয়া, ভেনিস, পিসা, নেপ্‌ল্‌স, মিলান, ফ্লোরেন্স এবং রোমের গড়ে-ওঠার সূত্রপাত হয় এই বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই। রাজনৈতিকভাবে এগুলো ছিল প্রত্যেকটি একটি স্বাধীন নগররাষ্ট্র—কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির শাসনাধীন নয়। অন্যদিকে বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রসারতা জন্ম দিল একটি বণিকশ্রেণীর–বিপুল অর্থ ও সম্পদ-জগৎ সম্বন্ধে যাদের মনে সৃষ্টি করল ইহজাগতিকতার ধারণা। মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পৃথিবীকে তারা নতুন দৃষ্টিতে অবলোকন করল। রেনেসাঁর এরাই ছিল প্রধান পৃষ্ঠপোষক্। ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার, মিলানের ভিসকন্তি পরিবার, এমনকি রোমের কোনো কোনো পোপও এই দলে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ক্ষেত্রে ইতালি এক নতুন পথনির্দেশ করতে পেরেছিল।

২. ইতালিতে রেনেসাঁর জন্মের আরেকটি কারণ এর ইহজাগতিক ঐতিহ্য। ইতালি ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার মূলকেন্দ্র এবং সে সভ্যতা ছিল প্যাগান সভ্যতা। সে প্রাচীন ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ ইতালির প্রতিটি শহরে এখনও বর্তমান। এ রোমান সভ্যতার মূলদর্শন ছিল ইহজাগতিকতা। রেনেসাঁর ইহজাগতিকতার দর্শন অনেকাংশেই প্রাচীন রোমান দর্শনের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ইতালি পরবর্তীকালে খ্রিস্টজগতের মূলকেন্দ্র হিসাবে

www.icsbook.info

গড়ে উঠলেও এর সংস্কৃতি ছিল সেকুলার। মধ্যযুগের সামন্তপ্রথা, শিভালরি, গথিক স্থাপত্য ইতালিতে ততখানি গভীরভাবে তাদের মূল প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি, যতখানি সক্ষম হয়েছিল ফ্রান্সে বা জার্মানিতে। কাজেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে একটা যোগসূত্র বরাবরই সেখানে টিকে ছিল। রেনেসাঁর মাধ্যমে ইতালিবাসী অনেকাংশে তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে আবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলেছে।

৩. ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী-আক্রমণে বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানোপলের পতনের পর সেখানকার অনেক পণ্ডিত ইতালির বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেন। তাঁরা সাথে করে এনেছিলেন বিভিন্ন প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পবিষয়ক এসকল গ্রন্থ নব-আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত হয়ে প্রচুরসংখ্যক গ্রন্থের আকারে পৌঁছে যেতে লাগল মানুষের হাতে। এসকল পণ্ডিত নিজেরা বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেও তাঁদের জ্ঞানের দীপশিখা মানুষের অন্তরে প্রজ্বলিত করতে শুরু করেন। শুরু হল জ্ঞানের সাধনা, সহস্র বৎসরের অজ্ঞানতাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল আলোর জয়রথ—মহাকালের বক্ষে শুরু হল মানুষের নতুন জয়যাত্রা।

পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইতালির ছিল সমৃদ্ধতর ধ্রুপদী তথা প্রাচীন গ্রিক-রোমান সংস্কৃতির (classical) ঐতিহ্য। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে ইতালীয়রা এই বিশ্বাস টিকিয়ে রেখেছে যে তারা গৌরবময় রোমানদের উত্তরাধিকারী। মধ্যযুগে ইতালিতে যতবার বৈদেশিক আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ হয়েছে, যেমন লম্বার্ড, গথ, বাইজেন্টাইন, সারাসিন ও নর্মানদের দ্বারা—ইতালিয়ানরা তাদের সবকিছুই বিস্মৃত হয়ে কেবল একটি বিষয়ই মনে রেখেছে যে রোমানরাই তাদের পূর্বপুরুষ। রোমান ঐতিহ্যই ইতালির ঐতিহ্য। কতক ইতালীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলে হাজার বছর পূর্বের রোমান শিক্ষাব্যবস্থা বলবৎ ছিল।

ক্যাথলিক ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের বিপরীতে প্যাগান রোমান অনৈতিকতা ইতালীয়দের রক্তে যেন মিশেছিল। কাজেই নৈতিকতার বড় একটা ধার তারা ধারত না। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার একাধিক অবৈধ সন্তানের পিতা, পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা —এসব বিষয় নিয়েই খুব স্বল্পসংখ্যক ইতালীয়র মনে বিস্ময় অথবা বেদনার সৃষ্টি হত। একথা সত্য যে ইতালীয়দের সংস্কৃতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি। এর বিপরীতে সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপের সংস্কৃতি ছিল খ্রিস্টধর্মীয় পরিমণ্ডলে আচ্ছন্ন।

বছরের-পর-বছর ধরে ইতালীয় সমুদ্রবন্দর তথা নগর, যথা : ভেনিস, নেপ্‌ল্‌স, জেনোয়া, পিসা ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যের একাধিপত্য চালিয়ে গেছে। অন্যদিকে ফ্লোরেন্স, বোলোনা ইত্যাদির বণিকরা উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের বাণিজ্যে সর্বস্বত্বভোগীরূপে কাজ চালিয়ে গেছে। এদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ইতালির রেনেসাঁর বৌদ্ধিক ও শিল্পগত সমৃদ্ধির পশ্চাতের পটভূমিরূপে কাজ করেছে। একথা সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির জন্ম এবং প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দক্ষ সরকারের অধীনেই সম্ভব। ইতালির রেনেসাঁর জন্মের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারণা সত্য

www.icsbook.info

নয়। রেনেসাঁর জন্ম হয়েছিল প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে, সমগ্র রেনেসাঁর ইতিহাসে ইতালি কখনই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল না। নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ ছিল নিরন্তর। মধ্যযুগীয় যুথবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আত্মগরিমা, অহংবোধের জয়জয়কার ছিল সর্বত্র। যে-কোনো ধরনের স্বকীয়তারই ছিল প্রাধান্য – তা সে ক্ষমতা, ধনলাভ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত যে-কোনো ধরনের আনন্দলাভই হোক না কেন। রেনেসাঁর জন্মের মূলে ছিল এই স্বকীয়তার প্রাধান্য, অহংবোধের আধিপত্য।

ইতালির রেনেসাঁ-যুগের শিল্পকলা (চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য)

ইতালির রেনেসাঁ-যুগের সাহিত্যের বিশাল অবদান অনস্বীকার্য। তবে একথা সত্যি যে সাহিত্যের চেয়েও ইতালির রেনেসাঁ-যুগের শিল্পকলা আরও বিপুল কৃতিত্বের অধিকারী এবং বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে এর স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই রেনেসাঁ শিল্পীরা তাঁদের বিশ্বখ্যাত অবদান রেখে গেছেন।

চিত্রশিল্প

ইতালির রেনেসাঁ-যুগের শিল্পকলার ইতিহাসে চিত্রশিল্প একটি বিরাট স্থান জুড়ে আছে। ত্রিকালব্যাপী বিস্তৃত এই যুগ Trecento, Quattrocento এবং Cinquecento—এই তিন নামে পরিচিত।

Trecento যুগ : প্রথম যুগ অর্থাৎ Trecento যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পীর নাম গিয়োত্তো (১২৭৬–১৩৩৬ খ্রি.)। তাঁর সময়ে চিত্রশিল্প একটি স্বতন্ত্র ধারার রূপ নেয়। এই ধারাটি তাঁর গুরু সিমাবিউ-এর আমলে শুরু হয়। গিয়োত্তো প্রাথমিকভাবে ছিলেন একজন প্রকৃতিবিদ। জীবজগতের চিত্র তিনি এমন নিখুঁতভাবে অঙ্কন করতেন যে কথিত আছে তাঁর একটি চিত্রে অঙ্কিত একটি মাছির ছবি এত জীবন্ত ছিল, যা তাঁর গুরু সিমাবিউকে সত্যি মাছি বলে বিভ্রান্ত করেছিল এবং তিনি হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। গিয়োত্তো তাঁর অঙ্কিত চিত্রে সাধারণ প্রতিভার অতিরিক্ত এমন কিছু প্রয়োগ করতেন, যা তাঁর চিত্রকে স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করত। তাঁর অঙ্কিত ফ্রেস্কো যেমন Saint Francis Preaching to the Birds, The Massacre of the Innocents এবং যিশুর জীবনভিত্তিক চিত্রগুলো এ-ধরনের অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন।

Quttrocento যুগ : অবশ্য Quattrocento যুগের আগে ইতালির রেনেসাঁ চিত্রকলা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। এ সময়ে সমাজে একশ্রেণীর লোকের হাতে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি এবং জনমানসে ইহজাগতিক চেতনার উন্মেষ চিত্রকলাকে ধর্মের পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র গির্জাই চিত্রকলার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক থাকল না। যদিও বাইবেলের গল্প-গাথাই ছিল চিত্রশিল্পের মূল বিষয়, তথাপি প্রায়ই এগুলোকে ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের সাথে মিশ্রিত করে অঙ্কন করা হত। আত্মার লুক্কায়িত রহস্যকে

www.icsbook.info

চিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট করার রীতি সেকালের চিত্রকলার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

একই সাথে চিত্রকলার প্রধান লক্ষ্য যেমন ছিল মানুষের বুদ্ধিদীপ্তিকে জাগ্রত করা, তেমনি অন্য একটি ধারার উদ্দেশ্য ছিল চিত্রের রঙে ঔজ্জ্বল্য ও রূপের প্রভায় দর্শকের চোখকে ধাঁধিয়ে দেওয়া। Quattrocento যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তৈলচিত্রের প্রবর্তন, সম্ভবত ফ্লান্ডার্স থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। চিত্র অঙ্কনের নতুন কৌশল সে-যুগে চিত্র অঙ্কনের গুণগত মানের সাথে সঙ্গতি রেখেই অগ্রসর হয়েছিল। যেহেতু জলরঙের মতো চিত্রের তেলরঙ দ্রুত শুকিয়ে যায় না, সেজন্য চিত্রশিল্পী প্রচুর সময় ও অবসর নিয়ে ছবি আঁকতে পারতেন এবং সেই সময়টুকু তিনি চিত্রের জটিল অঙ্কন কার্যে এবং ত্রুটি সংশোধনের কার্যে ব্যয় করতে পারতেন।

ম্যাসাচ্চিও : ইতালির Quattrocento যুগের বেশির ভাগ শিল্পীই ছিলেন ফ্লোরেন্স-এর অধিবাসী। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ম্যাসাচ্চিও (Masaccio)-এর নাম। যদিও মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর চিত্র প্রায় একশত বছর ধরে ইতালির চিত্রশিল্পীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁকে সাধারণভাবে রেনেসাঁ-চিত্রের প্রথম বাস্তববাদী শিল্পীরূপে অভিহিত করা হয়। তাঁর চিত্রে যে বিশ্বজনীনতা ফুটে উঠেছিল তা তাঁর অনেক উত্তরসূরীকেই প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিখ্যাত চিত্রের মধ্যে রয়েছে *The Expulsion of Adam and Eve from the Garden* এবং *The Tribente Money*। এগুলো শুধু নির্দিষ্ট ধারণাকে অবলম্বন করে অঙ্কিত হয়নি বরং সর্বকালে সর্বমানবের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। ম্যাসাচ্চিও ছিলেন রেনেসাঁর যুগের প্রথম শিল্পী, যিনি চিত্রে অঙ্কিত একাধিক চরিত্রের মধ্যে কর্মের সাযুজ্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং আলো ও ছায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে চিত্রের বিষয়বস্তুর গভীরতা চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ম্যাসাচ্চিওর প্রদর্শিত পথ যেসব চিত্রশিল্পীরা অনুসরণ করেছিলেন তার মধ্যে ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি (Fra Lippo Lippi) ও বত্তিচেল্লি (Botticelli)-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি কোনো একটি ধর্মীয় সদস্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দলে তাঁর অঙ্কিত চিত্র মানবিক রূপ পরিগ্রহ করতে বাধাগ্রস্ত হয়নি। তাঁর চিত্রের সাধুদের ও ম্যাডোনার চরিত্র অঙ্কন করতে তিনি ফ্লোরেন্স শহরের সাধারণ মানুষকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শিশু যিশুর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন একজন দুরন্ত শিশুরূপে, যে তার মায়ের চুল ধরে টানতে চায় অথবা খেয়ালি শিশুর মতো আকাশে উড়তে চায়। তাঁর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চিত্রের অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে ফুটিয়ে তোলা। তিনিই সম্ভবত প্রথম, যাঁর চিত্রে অঙ্কিত চরিত্রের মুখমণ্ডল আত্মার দর্পণরূপে চিত্রিত হয়েছে।

সান্দ্রো বত্তিচেল্লি : ম্যাসাচ্চিওর বিখ্যাত ছাত্র সান্দ্রো বত্তিচেল্লি (Sandro Botticelli, ১৪৪৭-১৫১০) তাঁর গুরু-র চিত্রের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। প্রকৃতির প্রতি তাঁর তীব্র ইন্দ্রিয়যুক্ত অনুভূতি তাঁকে

www.icsbook.info

যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, গ্রীষ্মের আকাশ, প্রস্ফুটিত বসন্তের রূপ চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বত্তিচেল্লি প্রকৃতি অনুরাগী হয়েছিলেন আত্মার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে। তাঁর সময়ের অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের মতো তিনি সে-যুগের নিও-প্লাটোনিক চিন্তাধারা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং খ্রিস্টীয় ও পৌত্তলিক (গ্রিক ও রোমান) চিন্তাধারার সংমিশ্রণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁর অঙ্কিত অধিকাংশ মুখমণ্ডল বিষাদমগ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট রূপকে পরিস্ফুট করে, যার মাধ্যমে স্বর্গীয় সত্তার প্রতি রহস্যময় আকুল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। অবশ্য বত্তিচেল্লির সকল চিত্রেই ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে নাই। তাঁর অঙ্কিত *Allegory of Spring* এবং *Birth of Venus* সম্পূর্ণভাবে চিরায়ত পৌরাণিক কাহিনীসমূহের ওপর ভিত্তি করে অঙ্কিত এবং জীবনকে পরতে পরতে উন্মুক্ত করে উপভোগের অতিরিক্ত আরও কিছুকে তুলে ধরে এবং সেইসাথে প্রাচীন গ্রিক ও রোমের গৌরবময় অধ্যায়গুলোর প্রতি অনুরাগ মিশ্রিত তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি : ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পীর নাম লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিভাময়ী শিল্পী, যাঁর মধ্যে সমাহার ঘটেছিল গুণের। তিনি শুধু একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ভাস্কর, সংগীতজ্ঞ, স্থপতি, বিখ্যাত গণিতবিদ, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। শৈশবে তিনি ফ্লোরেন্সের চিত্রের জগতের বিখ্যাত গুরু ভেরোচ্চিও-র সংস্পর্শে আসেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এতখানি খ্যাতির পরিচয় দেন যে ফ্লোরেন্স-এর শাসক লরেঞ্জো দি ম্যাগনিফিসেন্ট-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থন হন। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে মেডিসি শাসকদের শিল্পরীতির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের দরবার ছেড়ে মিলানের স্ফর্জা (Sforza) শাসকদের দরবারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। স্ফর্জাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দা ভিঞ্চি তাঁর অনেকগুলো শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম তৈরি করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতকের যে প্রথম দুদশক জুড়ে লিওনার্দোর চিত্রকর্ম তৈরি হয়েছিল সে-সময়কালকে ইতালির সর্বোচ্চ রেনেসাঁর (High Renaissance) কাল বলে অভিহিত করা হয়।

চিত্রশিল্পী হিসাবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি চিরায়ত চরিত্রগুলোকে অনুকরণ করার প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সকল শিল্পের মূল ভিত্তি হবে প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কিন্তু তিনি ধরিত্রীর উপস্থিত বিষয়বস্তুতে তাঁর আগ্রহ সীমিত রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতির রহস্য তার গভীর অন্তরে লুক্কায়িত। এজন্য শিল্পীকে বৃক্ষের গঠনপ্রণালীকে জানতে হবে এবং মানুষের আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে মানুষের আবেগ-অনুভূতিগুলোকে সন্ধান করতে হবে, যেভাবে দেহতত্ত্ববিদরা দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তার অভ্যন্তরভাগকে অনুসন্ধান করে। তিনি প্রকৃতির অদ্ভুত ও অবাস্তব রূপে মুগ্ধ হতেন। ভূমির বিকট ফাটল, পাহাড়ের অমসৃণ চূড়া, বিরল বৃক্ষ ও প্রাণী, ভ্রূণাবস্থায় মানবশিশু,

www.icsbook.info

ফসিল— ইত্যাদি বিষয় লিওনার্দোকে বেশি আকর্ষণ করত এবং সেগুলোই ছিল তাঁর শিল্পের বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাধারণ বিষয়ের চেয়ে অসাধারণ ও অদ্ভুত সামঞ্জস্যবিহীন বস্তুর মধ্যে প্রকৃতির গূঢ় রহস্যগুলো লুকিয়ে থাকে।

একই কারণে তিনি দিনের-পর-দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন সেসব মুখাবয়বের খোঁজে যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সৌন্দর্য ও ক্রূরতা, বিশ্বস্ততা ও মোনাফেকি। এভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের কারণে লিওনার্দোর চিত্রকলা সাধারণ বিষয়ের বৈপরীত্যে বাস্তবতার নিরিখে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তিনি প্রকৃতিকে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরেননি বরং শিল্পীর আপন ভুবনের আলোকে উপস্থিত করেন। তিনি চিত্রশিল্পের জগতের অন্যতম বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অতি উৎকৃষ্ট চিত্রকর্ম *ভার্জিন অফ দি রক্স* (Virgin of the Rocks), *লাস্ট সাপার* (Last Supper) ও *মোনা লিসা* (Mona Lisa)।

প্রথমটি শুধুমাত্র তাঁর অসাধারণ চিত্রকৌশলকেই ফুটিয়ে তোলে না বরং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসা এবং বিশ্বকে একটি সুশৃঙ্খল স্থান হিসাবে গণ্য করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্রকে তিনি জ্যামিতিক কম্পোজিশনে স্থাপন করেছেন। প্রতিটি পাহাড় ও গাছপালাকে নিখুঁত বিবরণসহ চিত্রিত করেছেন। তাঁর Last Supper চিত্রটি, যেটি মিলানের Santa Maria delle Grazie-এর যাজকের বাসস্থলের দেয়ালে চিত্রিত হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক অপূর্ব নিদর্শন। অনিন্দ্যসুন্দর যিশু,ভাগ্যের শেষপ্রান্তে সমর্পিত, তাঁর শিষ্যদের নিকট এইমাত্র ঘোষণা করলেন যে তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এখানে শিল্পী বিশ্বস্ততার সাথে একাধারে বিস্ময়, ভীতি, ঘৃণা ও অপরাধবোধের সম্মিলিত চিত্র শিষ্যদের চোখেমুখে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল।

লিওনার্দোর শ্রেষ্ঠ চিত্র মোনালিসা মানবমনের বিভিন্ন ভাবকে পরিস্ফুট করেছে। যদিও একথা সত্যি যে Mona Lisa একজন বাস্তব রমণীর চিত্র এবং সেই রমণী ছিলেন নেপলস্‌বাসী ফ্রান্সেস্কো দেল লিওকোন্দো-এর স্ত্রী, তথাপি এটাকে কেবল ছবি বলা ঠিক হবে না।

টিশিয়ান, গির্গিওন, তিনতোরেত্তো : Quattrocento যুগের শেষ ভাগ বা সর্বোচ্চ রেনেসাঁর প্রারম্ভিক কাল রেনেসাঁ চিত্রকলার আরেকটি ধারা অর্থাৎ ভেনেসীয় ধারার (Venctian School) উত্থান দ্বারা চিহ্নিত। এ ধারার প্রধান প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন *টিশিয়ান* (১৪৭৭-১৫৭৬), *গির্গিওন* (১৪৭৮-১৫১০) ও *তিনতোরেত্তো* (১৫১৮-১৫৯৪)। এঁদের মধ্যে টিশিয়ানই ছিলেন সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিভাবান। এঁদের চিত্রকর্মের মধ্যদিয়ে ভেনিস নগররাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট বণিকশ্রেণীর বিলাসপূর্ণ জীবন ও ভোগবিলাসের জীবনযাত্রার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। ভেনেসীয় চিত্রশিল্পীদের চিত্রে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাঁদের চিত্রের আবেদন ছিল ইন্দ্রিয়ের প্রতি, চিত্তের প্রতি নয়। তাঁদের

www.icsbook.info

আনন্দ ছিল প্রকৃতির মনোরম চিত্র অঙ্কনে, রঙের জাঁকালো সমাবেশ ঘটাতে। বিষয় হিসাবে তাঁরা শুধু ভেনিসের সূর্যাস্তের সমুদ্র সংলগ্ন ছোট হ্রদগুলোর (Lagoons) রুপালি চমকিত আভাকে বেছে নিতেন না, উপরন্তু মনুষ্যরচিত জ্যোতিবিচ্ছুরিত রত্নালঙ্কার, দামি বর্ণোজ্জ্বল সাটিন, মখমল বা জমকালো প্রাসাদ – এসব কিছুই ছিল তাঁদের অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তু।

বর্ণ ও সৌষ্ঠবের প্রতি তাঁদের আকর্ষণের কারণ শুধু ভেনিসের ধনাঢ্য বণিকশ্রেণীর ঐশ্বর্যবান রুচিকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল না বরং বাইজেন্টাইন সভ্যতার মাধ্যমে মধ্যযুগের শেষদিকে যে প্রাচ্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ ইউরোপে ঘটেছিল, তার প্রতি অনুরাগও ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ। সর্বোচ্চ রেনেসাঁর যুগের অপরাপর বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীগণ সিনকোয়েসেন্তো যুগে তাঁদের কাজ করে গেছেন। এ যুগের রেনেসাঁ-শিল্পের বিবর্তন সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং এরপরেই শুরু হয় এর অবক্ষয়ের সূচনা।

রাফায়েল : এখন থেকে রোমই হল ইতালির শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, যদিও ফ্লোরেন্সের চিত্রের ঐতিহ্য ছিল সমভাবেই বিদ্যমান। এ যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত শিল্পীর নাম রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০)। সমগ্র রেনেসাঁযুগের তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী। তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য ছিল এর সর্বজনগ্রাহী আকর্ষণ, এর সহজ-সরল মানবিক দিক। রাফায়েলের চিত্রের পিছনে ছিল না কোনো গূঢ় চিন্তা বা গভীর দর্শন। যদিও রাফায়েল ছিলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির একজন পরম ভক্ত ও অনুসারী এবং তাঁর চিত্র-অঙ্কনের অনেক কৌশল তিনি অনুকরণ করতেন, তথাপি রাফায়েলের চিত্রের সুন্দর এবং মধুর, করুণ, দীন ভাব তিনি তাঁর প্রথমজীবনের শিক্ষকদের নিকট থেকেই অর্জন করেছিলেন।

রাফায়েল তাঁর চিত্রে যে আঙ্গিক ও রঙের সমাহার ঘটিয়েছেন তার কোনো গভীর অর্থ নেই। তাঁর চিত্রের সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও এ নিজস্বতা নিয়েই তিনি রেনেসাঁর চিত্রশিল্পের জগতে মহিমান্বিত হয়ে বিরাজ করছেন। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির মানসিক হতবুদ্ধিকর জটিলতা বা প্রবল ভাবাবেগজনীত যন্ত্রণা – কোনও কিছুর দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হননি। সম্পূর্ণ নিজের মতো করে সৌন্দর্যচর্চা ও ধর্মীয় অনুভূতিকে তুলে ধরাই ছিল রাফায়েলের চিত্রকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর বিখ্যাত চিত্রের নাম *School of Athens* এবং *Sistine Madonna*.

মাইকেল এঞ্জেলো : সিনকোয়েসেন্তো যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনারোত্তি (১৪৭৫-১৫৬৪), যাঁর সমতুল্য শিল্পী সে-যুগে আর জন্মগ্রহণ করেননি। লিওনার্দোর মতো তিনি অনেক গুণে ছিলেন গুণান্বিত। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে ভাস্কর ও স্থপতি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান ছিল এককথায় অসাধারণ।

১৪৭৫ সালে মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লোরেন্সের ক্যাপরেস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বছর বয়সে তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডমিনিকো ঘির্লান্দোর অধীনে কাজ

www.icsbook.info

শুরু করেন এবং ফ্রেস্কো চিত্র অঙ্কন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করেন। ফ্লোরেন্সের মেডিসি রাজবংশের শাসক লরেঞ্জো দি ম্যাগনিফিসেন্ট-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মেডিসি শাসকদের রাজকীয় উদ্যানের এন্টিক মডেলগুলো নিয়ে তিনি জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেন। একজন ধর্মযাজক বন্ধুর সহায়তায় তিনি একটি মঠে প্রবেশ করে গোপনে মৃত মানবদেহ ছেদন করে জ্ঞানর্চচার সুযোগ পান। সে যুগে মৃতদেহ ছেদন করা (Dissection) ছিল আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। মাইকেল এঞ্জেলোর এ জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য ছিল মানবদেহের গঠনতন্ত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করা। এছাড়াও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দোনাতোল্লোর ভাস্কর্য ও মাসাচ্চিওর চিত্রশিল্প অধ্যয়নের সুযোগলাভ করেন।

রাজার হাতে, পোপের হাতে, আত্মীয়স্বজনের হাতে সারাজীবন অবমাননার, লাঞ্ছনার দ্বারা তাড়িত মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রশিল্পের চরিত্রগুলোও যেন তাঁর মতোই ট্রাজেডির নায়ক। ভাগ্য তাঁকে যেমন সবসময়ে প্রতারণা করেছে, তাঁর চিত্রের পাত্রপাত্রীরাও তেমনি যেন বঞ্চনার শিকার, দুর্ভাগ্যের দ্বারা তাড়িত।

গ্রিক নাটকের রচয়িতাদের মতো মাইকেল এঞ্জেলো বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ভাগ্য সবসময়েই নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে কেবল দুর্ভাগ্যই বহন করে আনে। যদি কোনো মূল ভাবধারা মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রকে প্রভাবিত করে থাকে, সেটা হল মানবতাবাদ।

মানুষের বেদনা এবং মাহাত্ম্যকে তিনি তাঁর চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করতেন। পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, ফুল—এগুলোকে তিনি কখনই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু এমনকি পটভূমিরূপেও গণ্য করেননি।

মাইকেল এঞ্জেলোর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল সেন্ট পিটার্স গির্জার সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং ও দেয়ালগাত্রে অঙ্কিত ফ্রেস্কোগুলো। পোপের নির্দেশে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি যে-পরিমাণ দৈহিক ও মানসিক শ্রম ব্যয় করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল বিশাল। অমানুষিক পরিশ্রম করে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে উঁচু মাচার উপর কখনো শুয়ে, কখনো বসে বা দাঁড়িয়ে তিনি চিত্রগুলো দিনরাত ধরে অঙ্কন করেছেন। বেশির ভাগ সময় তিনি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মাচার উপর শুয়েই এই বিশেষ চিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণসহ। সিলিং-এর প্রায় দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের স্থানজুড়ে তিনশত তেতাল্লিশটি ফিগার তিনি এঁকেছেন, যার প্রতিটির উচ্চতা কমপক্ষে দশ ফিট।

চিত্রের বিষয়বস্তুর সবগুলো বাইবেল থেকে নেওয়া–সৃষ্টির প্রথম থেকে মহাপ্লাবন পর্যন্ত। এগুলো হল : (১) The Division of Light from Darkness; (২) The Creation of the Sun, the Moon and the Stars; (৩) The Creation of Waters; (৪) The Creation of Man; (৫) The Creation of Woman; (৬) The Temptation and Expulsion from Eden; (৭) The Deluge ইত্যাদি।

www.icsbook.info

মূল স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান, চিত্রের পশ্চাতের মূল ধারণা এবং উৎকৃষ্ট আঙ্গিকের বিচারে এই ফ্রেস্কোগুলো পৃথিবীর চিত্রের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। এই সিরিজের সর্বশেষ চিত্রটি মাইকেল এঞ্জেলো অঙ্কন করেন ত্রিশ বছর পরে, সিস্টিন চ্যাপেলের দেয়ালগাত্রে। 'শেষ বিচার' বা 'দি লাস্ট জাজমেন্ট' (The Last Judgement) নামে পরিচিত এই চিত্রকর্মটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম নামে পরিচিত। এতে বিশালকৃতির যিশু শেষ বিচারের দিনে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে পুণ্যাত্মাদের স্বর্গে এবং পাপীদের নরকে প্রেরণের নির্দেশ দিচ্ছেন; যদিও চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ খ্রিস্টীয়, কিন্তু আঙ্গিক ও ধরন পুরোপুরি প্যাগান। সম্পূর্ণ নগ্ন অবয়বে অঙ্কিত চিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের হতাশা, ক্ষোভ, দুঃখ ও বেদনা—বিশ্বমানবের চিরন্তন আকৃতি।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

মধ্যযুগের ভাস্কর্য শিল্পকলার কোনো পৃথক শাখারূপে বিবেচিত হত না। এটা ছিল পুরোপুরি স্থাপত্যকলার অঙ্গ। ইতালীয় রেনেসাঁর যুগে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা বিবর্তনের মাধ্যমে এমন এক পর্যায়ে পৌছায়, যেখানে ভাস্কর্য স্থাপত্য থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসাবে রূপলাভ করে। এই ভাস্কর্য ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।

দোনাতেল্লো : রেনেসাঁ যুগে সবচেয়ে প্রথম যিনি ভাস্কর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন, তিনি ছিলেন দোনাতেল্লো (১৩৮৬–১৪৬৬)। তিনি ভাস্কর্যকে গথিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁর তৈরী ডেভিডের মূর্তি নিজস্ব সৌকর্যমণ্ডিত। শত্রু গলিয়াথকে নিধন করে তার মৃতদেহের উপরে দণ্ডায়মান ডেভিডের মূর্তি তার স্বাভাবিকতা ও নগ্নতা নিয়ে এমনভাবে নির্মিত—যা পরবর্তীকালে অনেক দিন ধরে ভাস্করদের অনুকরণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাইকেল এঞ্জেলো : কিন্তু রেনেসাঁযুগের সবচেয়ে কৃতী ভাস্কর হলেন মাইকেল এঞ্জেলো। যদিও চিত্রকর হিসাবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ, তথাপি ভাস্কর্যই ছিল তাঁর নিজস্ব পছন্দের বিষয়। নিজের ভাস্কর্যকর্মে তিনি সুখী ছিলেন কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়, কেননা দীর্ঘ সময় ধরে যে-মূর্তিগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন, সেগুলো বিনষ্ট করে ফেলেছিলেন চরম হতাশা ও ঘৃণাভরে, যা তাঁর চরিত্রেরই একটি প্রধান দিক এবং তাঁর অধিকাংশ চিত্রেই তা প্রতিফলিত।

সকল কাজের পশ্চাতে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাথরের মধ্যদিয়ে নিজ চিন্তাধারাকে পরিস্ফুট করা। তাঁর শিল্প ছিল প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, কারণ প্রকৃতিকেই তিনি তাঁর ইচ্ছার দাসে পরিণত করেছিলেন। সেজন্য নিছক প্রস্তরখণ্ড তাঁর হাতে অসাধারণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল সবকিছুর নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরা, রূপকের মাধ্যমে তাঁর অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তাকে পরিস্ফুট করা।

www.icsbook.info

তাঁর ভাস্কর্যের একটি বড় অংশ ছিল সমাধিসৌধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে, যা তাঁর সম্বন্ধে তীব্র আগ্রহকে প্রতিফলিত করেছে, বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষপর্যায়ে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধির উপরে নির্মিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যকর্ম Bound Slave ও Moses। প্রথমটি নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মচরিত্র – ভাগ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিভা।

Moses-এ ভাবাবেগের প্রাবল্যের সর্বোচ্চ প্রতিফলন দেখানোর জন্য সেখানে দৈহিক বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলবাসীর অনানুগত্যের বিরুদ্ধে তাঁদের নেতা Moses-এর ক্রোধের চরমতম প্রকাশকে প্রতিফলিত করা। ফ্লোরেন্সের মেডিসি শাসকদের সমাধিসৌধের উপরে তিনি তৈরি করেছিলেন এমন কতকগুলো মূর্তি, যা দুঃখ ও হতাশাকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছিল। এদের দুটি হল Dawn (ঊষা) ও Sunset (গোধূলি)। প্রথমটি একটি রমণীর মূর্তি, যে স্বপ্নবিহীন রাত কাটিয়ে প্রত্যূষে মাথা তুলছে দুঃখকে নিয়ে, দিবস অতিক্রান্ত করার অভিপ্রায়ে। Sunset হল একটি শক্তিশালী পুরুষ, যে তার চতুর্দিকের মানব-যাতনার ভারে ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছে।

মাইকেল এঞ্জেলোর আরেকটি অসাধারণ ভাস্কর্য হল তাঁর Pieta, যা সম্ভবত তাঁর নিজের সমাধির জন্য নির্মিত। Pieta যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মৃতদেহকে ঘিরে আর্তনাদরত মেরি মাতার মূর্তি। উভয়ের মূর্তির পিছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি সম্ভবত মাইকেল এঞ্জেলো নিজেই, মানুষের নির্মম পরিণতিতে চিন্তাক্লিষ্ট।

রোম থেকে ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবর্তনের পর মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর বিখ্যাত David-এর ভাস্কর্য নির্মাণ করেন ১৫০১ সালে। ডেভিড একজন অসাধারণ রূপবান পুরুষ, প্রস্তরখণ্ডে যিনি প্রতিফলিত হয়েছেন ফ্লোরেন্সের যৌবন ও শৌর্যের প্রতীকরূপে।

রেনেসাঁর সাহিত্য

যদিও সাধারণভাবে ইতালির বুদ্ধিজীবীদের ভাষা ছিল ল্যাটিন, তথাপি চতুর্দশ শতক থেকে তাস্‌কান ভাষা ইতালির সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গড়ে ওঠে। রেনেসাঁযুগে ইতালির সাহিত্য মূলত: এই তাস্‌কান ভাষাতেই রচিত হয়।

রেনেসাঁযুগে ইতালির তিনজন বিখ্যাত লেখক হলেন দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও। এঁরা তিনজনই ফ্লোরেন্সের অধিবাসী।

দান্তে : দান্তে সম্বন্ধে আমরা 'মানুষের ইতিহাস : মধ্যযুগ' গ্রন্থে মোটামুটি আলোচনা করেছি, এ পুস্তকেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি।

ইতালি সাহিত্যের অপর নাম দান্তে আলিঘেরি (১২৬৫–১৩২১)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ডিভাইনা কমেডিয়া (Divina comedia) বা ডিভাইন কমেডি-র বিষয়বস্তু মূলত ধর্মীয়। নরক, পারগেটরি ও স্বর্গের কাল্পনিক ভ্রমণের মধ্যদিয়ে অদৃশ্য জগতের রহস্যকে দান্তে তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয়, প্রতীকধর্মী এবং স্কলাসটিক। দান্তে তাঁর কাব্যের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগের

www.icsbook.info

খ্রিস্টধর্মের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। দান্তের নিকট ধর্মই সকল জ্ঞানের উৎস এবং বিশ্বের সব রহস্যের সমাধান দিতে পারে। দান্তের প্রথম উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তিসাধন। নরকের বীভৎস বর্ণনা, পারগেটরির শাস্তিদান প্রক্রিয়া এবং স্বর্গের চিত্তাকর্ষক বর্ণনার মধ্যদিয়ে দান্তে মানবাত্মার মুক্তির বাণীই প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

দান্তেকে 'রেনেসাঁর অগ্রদূত'রূপে চিহ্নিত করা হয়। যদিও তিনি মধ্যযুগের ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন তথাপি প্রাচীন রোমের সেকুলার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। দান্তে তাঁর গ্রন্থে অসংখ্যবার শ্রদ্ধাসহকারে ভার্জিল এবং অভিড-এর নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের অনুকরণে দান্তে এঁদেরকেই তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই মানবিকতাই রেনেসাঁর কাব্য ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইতালির সাহিত্যে এই মানবিকতাকে প্রথম এনেছিলেন দান্তে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকেই ধরেছিলেন। এ কারণে তিনি রেনেসাঁর অগ্রদূত।

***পেত্রার্ক* (১৩০৪-১৩৭০) :** ফ্রান্সেসকো পেত্রার্ক-এর কাব্যে মানবিকতার বাণী দান্তের কাব্যের চেয়ে আরও জোরালোভাবে উপস্থিত। তিনশত সনেট ও উনপঞ্চাশটি ওড (Canzoni) সম্বলিত তাঁর কাব্যগ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের স্কলাসটিক ধারণা এবং দান্তের রূপককে পরিহার করে মানবিকতা ও ইহজাগতিকতা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। পেত্রার্ক-এর অধিকাংশ সনেট তাঁর প্রেমিকা লরার উদ্দেশে নিবেদিত। কাব্যগুণ বিচারে প্রেমিকা বিয়াত্রিচের উদ্দেশে নিবেদিত দান্তের কবিতাগুলো নিঃসন্দেহে অনেক উঁচুমানের, কিন্তু পেত্রার্ক-এর কাব্যে লরা অনেক জীবন্ত, অনেক প্রাণবন্ত।

পেত্রার্ক তাঁর লরাকে অঙ্কন করেছেন সুন্দরী রমণীর সকল রূপকে সমন্বিত করে। তাঁর মানবিক দেহকে চিত্রিত করে। অন্যদিকে দান্তের কাব্যে বিয়াত্রিচে শুধু কল্পনা, কেবল স্বপ্ন মাত্র। পেত্রার্ক-এর কাব্যের আবেদন ছিল লিরিক কাব্যের মডেল হিসাবে। তথাপি ইতিহাসে পেত্রার্ক হিউমানিস্ট হিসাবেই অধিক পরিচিত।

***বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫)* :** ইতালির প্রথম গদ্যলেখক ছিলেন জিওভান্নি বোকাচ্চিও। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ডেকামেরন (Decameron)। এই গ্রন্থটি ইউরোপের কৃষ্ণ মৃত্যু (Black Death) নামে পরিচিত প্লেগরোগের ভয়াবহ মহামারীর পটভূমিতে রচিত। প্লেগরোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সাতজন রমণী ও তিনজন পুরুষ ফ্লোরেন্স থেকে পলায়ন করেন। পথে তাঁরা রাত্রিতে আশ্রয়ের জন্য একটি কুটিরে সমবেত হন। শুধুমাত্র কালক্ষেপণের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে দশটি গল্প বলতে থাকেন। ডেকামেরন এই একশটি গল্পের সমন্বয়ে রচিত। যদিও এই গ্রন্থটির কিছু গল্প বোকাচ্চিওর নিজের সৃষ্টি, তথাপি এর বেশির ভাগেরই উৎস (Fabliaux) এবং আরব্য উপন্যাসের 'সহস্র ও এক রজনী' ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় গ্রন্থ।

ডেকামেরনে যাজকশ্রেণীর কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে এবং গ্রন্থটি কিঞ্চিত অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে লেখক সমকালীন ইতালির

www.icsbook.info

সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলোকে উপস্থিত করেছেন। এজন্যই এটি সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছে। গ্রন্থটি ভদ্রতা, দয়া, মানবিকতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলোকে উচ্চে তুলে ধরেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডেকামেরন মধ্যযুগের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী একটি গ্রন্থ। বোকাচ্চিও ইতালির আধুনিক গদ্যসাহিত্যের প্যাটার্ন তৈরি করে দেন। তাঁকে অনুসরণ করে ইতালির পরবর্তী লেখকরা তাঁদের গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করেন। এমনকি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সাহিত্যিকরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। চসার, শেক্সপিয়র, গ্যেটে ও টেনিসনের মূল প্রেরণার উৎস ডেকামেরন। এদিকের বিচারে বোকাচ্চিওকে বাস্তবিকই আধুনিক উপন্যাসের জনক বলা যেতে পারে।

বোকাচ্চিওর মৃত্যুর সাথে সাথে ইতালির রেনেসাঁ সাহিত্যের প্রথমপর্যায়ের অবসান ঘটে। এর পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় প্রাচীন গ্রেকো-রোমান সাহিত্যের পুনরুদ্ধার। তাস্‌কান ভাষাকে বাদ দেয়া হয় অমার্জিত ও অসুন্দর বলে। শুরু হল গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাশিক্ষা পর্ব। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান (classical) সাহিত্য হল আধুনিক সাহিত্যের মাপকাঠি। পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিওকে আপাতত বিদায় দেয়া হল সাহিত্যের জগৎ থেকে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটি গ্রন্থও তাস্‌কান ভাষায় রচিত হয়নি। ল্যাটিন ভাষার প্রতি অনুরাগের জোয়ার এত প্রবল বেগে বইতে লাগল যে একমাত্র গ্রেকো-রোমান সাহিত্যের চর্চা ছাড়া আর সবকিছুকেই অর্থহীন ও পণ্ডশ্রম বলে মনে করা হল।

অন্যান্য সাহিত্য

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে রচিত হয় ইতালির মহাকাব্য, নাটক, চারণগীতি ও ইতিহাস।

মহাকাব্য : এ সময়ের বিখ্যাত মহাকাব্য রচয়িতা ছিলেন লুডোভিগো আরিওস্তো (১৪৭৪-১৫৩৩)। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম অর্লান্ডো ফুরিওসো (Orlando Furioso)। যদিও মধ্যযুগের রোমাঞ্চকর কাহিনী ও আর্থারিয়ান চক্র (Arthurian Cycle)-এর উপকথার উপর ভিত্তি করেই এ মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে, তথাপি এটা মধ্যযুগের যে-কোনো মহাকাব্যের থেকে পৃথক। মধ্যযুগের আদর্শবাদ ও ধর্মভাব এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, বরং এর মূলভাব অনেকখানি প্রাচীন লোকায়ত সাহিত্য থেকে নেয়া। আরিওস্তো তাঁর কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিখুঁত উপস্থিতির দ্বারা মানুষের মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। রেনেসাঁর শেষপর্বের হতাশা ও অনিশ্চয়তা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই তিনি সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিলেন। এ যুগের চারণগীতির মধ্যেও একই ভাব ধ্বনিত। নাগরিক জীবনের ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে পরিহার করে গ্রামীণ সহজ-সরল জীবনে আবার ফিরে যাওয়ার আহ্বান এসকল চারণগীতিতে সুপরিস্ফুট। এ যুগের বিখ্যাত

www.icsbook.info

চারণকবি জ্যাকপো সান্নাজারো (১৪৫৮-১৫৩০) তাঁর আরকেডিয়া (Arcadia) কাব্যগ্রন্থে নাগরিক জীবনের সম্ভোগ ও অনিশ্চয়তার প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণাকে তুলে ধরেছেন।

নাটক : রেনেসাঁযুগে রচিত নাটকে নাট্যকারগণ বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। যদিও প্রাচীন গ্রিক নাটক সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তথাপি সার্থক বিয়োগান্ত (Tragic) নাটক রচনায় তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। গ্রিকদের জীবনবোধ রেনেসাঁযুগের নাট্যকারদের মধ্যে ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। গ্রিক নাটকের নায়ক নিয়তির হাতে নির্যাতিত। কিন্তু রেনেসাঁযুগের নায়ক শৌর্যে, বীর্যে মহিমান্বিত, জীবনযুদ্ধে বিজয়ী এবং সফল। অতএব এ যুগের সকল বিখ্যাত নাটকই কমেডি বা মিলনান্ত নাটক।

রেনেসাঁযুগের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকারের নাম নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি (১৪৬৯-১৫২৭), যদিও ইতিহাসে তিনি রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা হিসাবেই পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত নাটকের নাম *ম্যাণড্রাগোলা* (Mandragola)। রেনেসাঁ সমাজকে বিদ্রূপের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে তিনি সমকালীন যুগকে চিত্রিত করেছেন। ম্যাকিয়েভেলির মতে প্রতিটি মানুষের ভদ্র, শান্ত, অমায়িক বহিরাবরণের নিচে লুকিয়ে আছে একটি স্বার্থপর, নীচ ও নির্বোধ মন। মানুষ স্বভাবতই নীচ ও স্বার্থপর। শুধু উপরে ভদ্রতার আবরণ দিয়ে তার এই স্বভাবকে সে গোপন করে রাখে। ম্যাকিয়েভেলির রাজনৈতিক দর্শনও মূলত এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত।

ইতিহাস

রেনেসাঁযুগে রচিত ইতিহাসে মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ম্যাকিয়েভেলিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। লরেঞ্জো ডি মেডিসির মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়ের ফ্লোরেন্সের ইতিহাস রচনায় তিনি সর্বপ্রকার ধর্মীয় ব্যাখ্যা বর্জন করে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক ফ্রান্সেসকো গুইসিয়ার্দিনি (১৪৩০-১৫৪০) তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে আরও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দেন। মানুষের কার্যাবলীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলীকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর History of Italy গ্রন্থে তিনি ১৪৯২-১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের ইতালির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সমালোচক হিসাবে যাঁর নাম প্রথম উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন লরেঞ্জো ভাল্লা (১৪০৬-১৪৫৭)। তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিলের অভ্রান্ততাকে চ্যালেঞ্জ করেন। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক রোমের পোপকে প্রদত্ত দানপত্রকে (Donation of Constantine, যার দ্বারা পোপকে খ্রিস্টান জগতের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল) জাল বলে প্রমাণ করেন। যিশুর ধর্মপ্রচারকদের বাণী (Apostlic Creed নামে পরিচিত যিশুর

www.icsbook.info

প্রধান বারোজন শিষ্যের প্রচারিত বাণীসমূহ) প্রকৃতপক্ষে Apostle-গণ কর্তৃক প্রচারিত হয়—এ তথ্যও সম্পূর্ণরূপে লরেঞ্জো ভাল্লা কর্তৃক আবিষ্কৃত। বাইবেলের প্রাচীন গ্রিক সংস্করণ থেকে ল্যাটিন সংস্করণের (Vulgate Edition) পার্থক্য তিনিই নিরূপণ করেন। লরেঞ্জো ভাল্লার সমালোচনা-পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে এরাসমাস ও মার্টিন লুথার চার্চের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রেনেসাঁর বিজ্ঞান

রেনেসাঁযুগের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রকৃতিকে, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ, পশুপাখি, ফুল, গাছ, পাহাড়-পবর্তকে পর্যবেক্ষণ করতে। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাস্তবভিত্তিক প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বের ভিত্তি, যা নাকি মধ্যযুগের মতো প্রাচীন পুঁথি এবং বাস্তব-নিরপেক্ষ যুক্তিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। রেনেসাঁযুগের বিজ্ঞানী এবং শিল্পীরা মানুষের শরীরের অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র (anatomy) সম্পর্কেও আগ্রহী হলেন।

রেনেসাঁযুগে জীববিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে চিকিৎসাবিদ্যা। ঘটনাক্রমে, মধ্যযুগের জ্ঞানর্চচার ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী স্থবিরতার তুলনায় ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল আশ্চর্যরকমের ব্যতিক্রম। বিশেষত এক্ষেত্রে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সারা ইউরোপের সেরা প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তখন ইতালির দিকে আকৃষ্ট হন।

ইতালির চিকিৎসকগণ এবং বিদেশ থেকে আগত ছাত্রগণ সমাজবিচ্ছিন্ন থাকতেন না। তাঁরা অবাধে শিল্প, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং প্রকৌশলীদের সাথে মেলামেশা করতেন। যেমন, জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস স্বয়ং একজন দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের ফলে ইতালিতে চিকিৎসাবিদ্যা ও শরীরবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে। সারা মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন একমাত্র গুরু হিসাবে বিবেচিত হতেন। রেনেসাঁর যুগে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে ভেসালিয়াস ও হার্ভে নতুন এনাটমি এবং ফিজিওলজি-র ভিত্তি নির্মাণ করেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু শিল্পীই ছিলেন না, একজন বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীও ছিলেন। এই শেষোক্ত দক্ষতা তাঁকে বড় শিল্পী হতে সাহায্য করেছিল।

রেনেসাঁযুগে কারিগরিবিদ্যার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল ধাতুবিদ্যা, খনিবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রে–আর এ তিনটি বিষয় ছিল পরস্পরের সংযুক্ত। খনি থেকে আহরিত আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে গিয়ে নতুন নতুন ধাতু আবিষ্কৃত হয় এবং রসায়নশাস্ত্রও বিকাশলাভ করে।

মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং স্থবির হয়ে পড়েছিল তিনজন প্রখ্যাত গুরু বা Authority-এর প্রভাবে—মধ্যযুগের গির্জা ও পোপতন্ত্র এঁদেরকে মেনে নিয়েছিলেন। এঁরা হলেন দার্শনিক এরিস্টটল, চিকিৎসাবিদ গ্যালেন এবং জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টলেমি। মধ্যযুগের পণ্ডিতরা বিনাদ্বিধায় এরিস্টটলের

www.icsbook.info

সকল অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব কথাকেও আপ্তবাক্যরূপে মেনে নিতেন। কোপার্নিকাস (১৪৭০-১৫৪৩), টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১), কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানীর নতুন আবিষ্কারের ফলে এরিস্টটল এবং গ্যালেনের গুরুত্ব বিদূরিত হয়। ভেসালিয়াস, হার্ভে প্রমুখ চিকিৎসকের আবিষ্কৃত মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনতন্ত্র (anatomy) এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি জীবনধারার প্রক্রিয়া (Physiology) সম্পর্কে নতুন জ্ঞান ও বিজ্ঞান এরিস্টটল ও গ্যালেনের গুরুবাদকে বিদূরিত করে।

পদার্থবিদ্যা, গতিবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গ্যালিলিও এরিস্টটলের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে আধুনিক গতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।

টেলেসিয়াস (১৫০৯-৮৮) নামক একজন ইতালীয় পণ্ডিত সর্বপ্রথম এরিস্টটলের কার্যকারণ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে বাতিল করে বস্তুগত ও কার্যকর কারণকে গুরুত্বদান করেন। তাঁর এ পদ্ধতিকেই আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করে নিয়েছে।

এভাবে রেনেসাঁযুগের নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব-ইতিহাসের এ নতুন জাগরণকে সফল এবং সার্থক করে তুলেছিল।

রেনেসাঁর মূল্যায়ন

রেনেসাঁ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে রেনেসাঁ কতকগুলো মানুষের সচেতন আন্দোলন, যারা মধ্যযুগের ধ্যানধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল। রেনেসাঁ ছিল প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের সচেতন সম্মিলিত প্রয়াস। তাঁরা মধ্যযুগের জীবনবোধের বিপরীতে সম্পূর্ণ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যদিও প্রাচীন ঐতিহ্যকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন মডেল হিসেবে। তাঁরা মধ্যযুগের স্কলাসটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে অবলোকন করেননি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা নিজের চোখে পৃথিবীর মূল্যায়ন করেছিলেন, অন্যের চোখে নয়। রেনেসাঁ অতীতের পৃথিবীর সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। প্রশস্ত করেছিল নতুন পৃথিবীর জয়যাত্রার পথ। মধ্যযুগের ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালকে তাঁরা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ধর্মগুরুদের চোখ রাঙানিকেও তাঁরা ভয় পাননি। বরং অনেক সময় চার্চকেও তাঁরা রেনেসাঁর পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁদের পক্ষে টানতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁদের কৃতিত্ব।

স্থানীয় শাসকবৃন্দের সাথে তাঁদের সংযুক্তি ঘটেছিল। রোমের পোপ বা ফ্লোরেন্সের মেডিসি-পরিবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতালাভ করার সুযোগও তাঁদের হয়েছিল। কারিগর ও পণ্ডিতের মিলিত প্রয়াস সংযুক্ত হল রেনেসাঁর মাধ্যমে। কারিগর আবিষ্কার করতেন নতুন নতুন উৎপাদন টেকনিক, পণ্ডিতরা দিতেন পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন নতুন ব্যাখ্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুই ধারার সম্মিলনের মধ্যদিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অগ্রগতি লাভ করেছে, মানুষ লাভ করেছে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক

www.icsbook.info

জ্ঞান। রেনেসাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক সময়ে যে-যুগটাকে মোটেও শান্তিপূর্ণ যুগ বলা যায় না। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ, হানাহানি, ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রবল আন্দোলন, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পোপের বিরুদ্ধে, মানুষের ধূমায়িত বিক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। দেশ দখলের প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নিয়োজিত, আবার বিজিত জাতি ও গোষ্ঠীর উপর চলছে অমানুষিক নিপীড়ন। রেনেসাঁর কেন্দ্রভূমি ইতালিতেও চলছে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণ—অথচ এই পটভূমিতে সাধিত হয়েছে সাহিত্য, শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ; উন্মোচিত হয়েছে বিজ্ঞানের নব নব দিগন্ত। আপাত শান্ত, নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগের ইতিহাসে সেটা কখনো সম্ভব হয়নি। রেনেসাঁ মানুষের মনে যে আলোর দীপশিখা জ্বালিয়েছিল, আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মধ্যদিয়েই তা আরও উজ্জীবিত হয়েছিল।

রেনেসাঁর সীমাবদ্ধতা : রেনেসাঁ মানুষের চিন্তা ও চেতনার জগতে এনেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এটা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে। এখানেই রেনেসাঁর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা। রেনেসাঁ তার প্রভাবকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি অগণিত জনতার মধ্যে, বিপুল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। রেনেসাঁর বিকাশ ঘটেছিল প্রধানত শহরগুলোকে কেন্দ্র করে, যার সুফল লাভ করেছিল মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী এবং তাদের সহযোগীবৃন্দ। গ্রামের অগণিত কৃষক এর সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা ছিল মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় আবদ্ধ। এ কারণেই সাভোনারোলার মতো ধর্মান্ধরা রেনেসাঁর মূল্যবান সম্পদগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে রেনেসাঁর অবসানের আরও অনেক কারণও রয়েছে।

রেনেসাঁর অবসানের কারণ

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইতালির রেনেসাঁর অবসান ঘটতে থাকে। সম্ভবত বৈদেশিক আক্রমণই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালি আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিশ হাজার সৈন্য দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী আল্পস পর্বত অতিক্রম করে সর্বপ্রথম ফ্লোরেন্সে প্রবেশ করে। ফ্লোরেন্সের মেডিসি শাসকগোষ্ঠী তাঁদের রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন। ফরাসিরা সেখানে তাদের অনুগত একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টম চার্লস অতঃপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নেপল্স জয় করেন। ফ্রান্স কর্তৃক নেপল্স অধিকার স্পেনের শাসকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। সিসিলি দ্বীপটি স্পেনের অধিকারে ছিল এবং স্পেন সেখানে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। অতঃপর স্পেনের রাজশক্তি, পোপ, পবিত্র রোমান সম্রাট এবং ভেনিসের শাসকগোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তি অষ্টম চার্লসকে ইতালি থেকে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স দ্বিতীয়বার ইতালি আক্রমণ করে। ফরাসি রাজা দ্বাদশ লুই এবারে স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড, পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস এবং পবিত্র রোমান সম্রাটকে সাথে নিয়ে ভেনিসের পো উপত্যকার সমৃদ্ধ অঞ্চলটি অধিকার করেন। কিন্তু বিজয়ীদের

www.icsbook.info

মৈত্রী ছিল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পোপ স্বয়ং ফরাসি আক্রমণের সম্ভাব্যতায় ভীত হয়ে ভেনিস ও স্পেনকে সাথে নিয়ে 'পবিত্র লীগ' (Holy League) গঠন করেন। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি এবং পবিত্র রোমান সম্রাটও পরে এই লীগে যোগদান করেন। পবিত্র লীগ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের ইতালি ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস কর্তৃক ইতালি আক্রমণ সমগ্র দেশকে ধ্বংসের সীমায় উপনীত করে এবং রেনেসাঁর অবসানও প্রায় এর সাথে সাথেই শুরু হয়। ইতালির বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদই বারবার এদের উপর বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

অষ্টম চার্লস-এর আক্রমণের পরও অবশ্য কিছুদিন ইতালির রেনেসাঁর ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এর পুরোপুরি অবসান ঘটে। ঘনঘন বৈদেশিক আক্রমণ অবশ্য ইতালির অর্থনৈতিক দুর্দশার সূচনা করে, কিন্তু ইতালির প্রকৃত দুর্দিন শুরু হল ভূমধ্যসাগর থেকে বাণিজ্যপথগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে। স্পেন কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার এবং পর্তুগাল কর্তৃক ভারতবর্ষে গমনের জলপথ আবিষ্কারের সাথে সাথে ইতালির বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটতে থাকে। রেনেসাঁর পৃষ্ঠপোষক ইতালির ধনী-পরিবারগুলো হারাতে থাকে তাদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য। এর প্রভাব পড়ে শিল্প ও সাহিত্যের উপর। রেনেসাঁর বিকাশের পথ হয় ক্রমশ রুদ্ধ।

এর সাথে যুক্ত হয় ক্যাথলিকদের প্রতিসংস্কার আন্দোলন (Counter Reformation)। ইউরোপের নবজাগ্রত ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে প্রতিহত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। প্রতিসংস্কার আন্দোলন ছিল প্রগতিবিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল। রেনেসাঁর সর্বশ্রেণীর কার্যকলাপ এর দৃষ্টিতে ছিল খ্রিস্টধর্মবিরোধী। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে রোমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনকুইজিশন (Inquisition) বা ধর্মীয় আদালত। ধর্মবিরোধীদের দমন করার নামে এরা শিল্পকর্মের উপর আরোপ করে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং বইপুস্তক প্রকাশনার উপর আরোপ করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। ধর্মীয় অপরাধীদের পুড়িয়ে মারার বিধান দেয়া হয়। অগণিত পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা ও গ্রন্থাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। রেনেসাঁর স্বতঃস্ফূর্ত গতি রুদ্ধ হল অস্বাভাবিকভাবে।

তবে একথাও ঠিক যে রেনেসাঁ তার মর্মবাণীকে সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়নি। উচ্চস্তরের নাগরিকদের মধ্যেই এর চর্চা ছিল সীমিত। রেনেসাঁর স্বাদ পেয়েছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত রুচিবান ধনিকশ্রেণী। তাদেরই নিচে অবস্থান করছিল অগণিত অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইতালিবাসী—যারা নিমেষে আচ্ছন্ন হয়েছিল সাভোনারোলার মতো ধর্মোন্মাদের উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বাণীর প্রভাবে।

জিরোলামো সাভোনারোলা (Girolamo Savonarola) ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে ফেরারায় জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত কঠোর ধর্মীয় পরিবেশে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয় এবং পরে তিনি বোলোনার একটি ডমিনিক্যান সংঘে যোগদান করেন। ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্লোরেন্সে গমন করেন এবং সেখানকার রেনেসাঁর পরিবেশ তাকে বিক্ষুব্ধ

www.icsbook.info

করে তোলে। ক্রমশ তিনি রেনেসাঁবিরোধী প্রচারকার্যে লিপ্ত হন। উগ্র জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি জনগণকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করেন। তাদের উদ্দেশে তিনি ভীতিকর দিনগুলোর বর্ণনা প্রদান করতে থাকেন। ক্রমশ তাঁর বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের মূর্খ, অশিক্ষিত জনগণ সাভোনারোলার সবধরনের হীন কার্যকলাপকে সমর্থন দান করে। ফ্লোরেন্সের শাসক মেডিসিদের উৎখাত করে সাভোনারোলা সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং রেনেসাঁর মূল্যবান শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলো ধ্বংস করেন। চার বৎসর ক্ষমতাসীন থাকাকালীন সাভোনারোলা রেনেসাঁর সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য নিদর্শনগুলো অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ফ্লোরেন্সকে মোটামুটি নিঃস্ব করে তোলেন। যদিও পরবর্তীতে তাঁর অনুচরদের হাতেই সাভোনারোলাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তথাপি তাঁর দ্বারা রেনেসাঁর যে ক্ষতিসাধন হয়েছিল তার অতি অল্পই পরবর্তীতে পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

www.icsbook.info

পঞ্চম অধ্যায়
ধর্ম সংস্কার আন্দোলন

ভূমিকা

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও রেনেসাঁর মতো যে বিশেষ ঘটনা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের উত্তরণে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, তার নাম ধর্মসংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আন্দোলন। রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে রোষ ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল সমগ্র মধ্যযুগের শেষভাগ জুড়ে, তারই প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। তথাপি এ আন্দোলনকে পুরোপুরি ধর্মীয় আন্দোলন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার যুগোপযোগী একটি ভাবাদর্শের প্রয়োজন দেখা দিল। রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানধর্ম সেই ভাবাদর্শের স্থান পূরণ করতে পারছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি নতুন ধর্মমতের। পোপতন্ত্রের আন্তর্জাতিক চরিত্র জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। উদীয়মান বার্গারশ্রেণী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল পোপের অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিধানসমূহ। কাজেই পোপকে অগ্রাহ্য করে এবং পোপতন্ত্রকে অস্বীকার করেই এদের বিকাশলাভের সম্ভাবনা ছিল। সেজন্যই সংঘটিত হয়েছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলন। মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিন এই আন্দোলনের অগ্রসেনারূপে সেই ঐতিহাসিক ভূমিকাই পালন করেছিলেন। এই নতুন ধর্মমতকে যারা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল, যেমন নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ড, তারা ইউরোপে প্রথম পুঁজিবাদী রাষ্ট্ররূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। অন্যদিকে যারা এর বিরোধিতা করেছিল, যেমন স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্স, নবোদিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়ে, এরা শুধু পিছিয়েই রইল না, নব ধর্মমতগ্রহণকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে তারা দেশের কর্মদক্ষ নাগরিকদের সেবাগ্রহণ থেকে দেশকে বঞ্চিত করে দেশের পরবর্তী বিকাশের পথও রুদ্ধ করে দিল।

ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ

১. চার্চের দুর্নীতি :

প্রধানত রোমান ক্যাথলিক চার্চের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধেই ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে এ দুর্নীতি এত ভয়াবহ ও সর্বব্যাপী ছিল যে পুরো

www.icsbook.info

চার্চ সংগঠনই এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। এই দুর্নীতি ছিল বিভিন্ন ধরনের।

অধিকাংশ ধর্মযাজকই ছিলেন অশিক্ষিত। ল্যাটিন বা অন্য কোনো ভাষার উপর তাঁদের দখল ছিল না। এরা বিভিন্ন অসৎ উপায়ে তাঁদের নিয়ুক্তিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। অনেকে বাইবেল-পাঠও জানতেন না। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে এসব অশিক্ষিত ধর্মযাজক ধর্মজ্ঞান দেয়ার নামে রীতিমতো প্রতারণা করত।

(ক) পোপের বিলাসিতা : এঁদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ছিল মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। একজন খ্রিস্টধর্মযাজক এর প্রধান কাজ ছিল অনাড়ম্বর, সরল ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনযাপন করা। ষোড়শ শতকে খ্রিস্টধর্মযাজকদের একাংশ সে নীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পরিপূর্ণ বিলাসিতায় নিজেদের জীবনকে নিমজ্জিত করেন। কয়েকজন পোপ ও বিশপ রীতিমত ইউরোপের রাজন্যদের জীবনযাত্রার অনুকরণে লিপ্ত ছিলেন। অপেক্ষাকৃত নিচুস্তরের ধর্মযাজকরাও বিলাসী জীবনযাপনের জন্য শুঁড়িখানা, জুয়ার আড্ডা ও অন্যান্য লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। যদিও ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অবিবাহিত থাকা ছিল বাধ্যতামূলক, তথাপি এদের প্রায় সকলেরই নারীসঙ্গলাভ ছিল প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। অনেকের রক্ষিতা ছিল এবং এটা কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার-এর আটটি অবৈধ সন্তান ছিল এবং তাদের মধ্যে সাতজন তাঁর পোপ পদে নিযুক্তিলাভের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিল।

(খ) নিযুক্তিপত্র বিক্রয় : ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মযাজক নিযুক্তির বিষয়টির সাথেও দুর্নীতি জড়িত ছিল। এসব ধর্মীয় পদগুলো রীতিমতো নিলামে বিক্রি করা হত। পোপ দশম লিও (Leo X) ধর্মীয় পদ বিক্রির মাধ্যমে বছরে দশ লক্ষ ডলারের অধিক (তখনকার হিসেবে) উপার্জন করতেন। যাঁরা এসব পদ উচ্চমূল্যে ক্রয় করতেন তাঁরাও স্বাভাবিকভাবে নিজেদের সেবাকার্যের জন্য জনগণের ওপর উচ্চমূল্য ধার্য করতেন। ধর্মীয় বিধানপালন থেকে অব্যাহতি দেয়ার মাধ্যমেও ধর্মযাজকরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন।

(গ) অবৈধ বিবাহ সম্পর্কিত ফি : সাধারণত ধর্মকাজ পালন, যেমন উপবাস থেকে বিরত থাকা বা বিবাহ সংক্রান্ত ধর্মীয় বিধান থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য উচ্চ ফি (Fee) দাবি করা হত। নিকট সম্পর্কযুক্ত ভাইবোনের (First cousin) বিবাহ সংক্রান্ত ফি ছিল এক ডুকাট; নিষিদ্ধ সম্পর্ক বিবাহ (যেমন মামা-ভাগ্নী বা চাচা-ভাইজি) এর জন্য ফি ছিল উপরোক্ত সংখ্যার ত্রিশ গুণ বেশি।

এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেক পূর্ব থেকেই চলে আসছিল।

(ঘ) পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রি : কিন্তু প্রধান যে-বিষয়কে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, সেটা ছিল পোপের ইচ্ছাপত্র (Indulgence) বিক্রি। এই ইচ্ছাপত্র দ্বারা পোপ দাবি করেন যে তিনি যে-কোনো মৃত লোকের কৃত পাপের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরলোকে মার্জনা করে দিতে পারেন। ইচ্ছাপত্রের তত্ত্বটি ত্রয়োদশ শতকে স্কলাসটিক পণ্ডিতদের দ্বারা তৈরী ট্রেজার অব মেরিট (Treasure of Merit) তত্ত্ব দ্বারা গঠিত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী যিশু ও অন্যান্য সাধুরা পৃথিবীতে তাঁদের অসাধারণ পুণ্যের দ্বারা

www.icsbook.info

স্বর্গলোকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ক্ষমতার কিছু অংশ পোপের উপর আরোপিত হওয়ার ফলে পোপ সেটা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারেন। অবশ্য প্রাথমিকভাবে পোপের ইচ্ছাপত্র অর্থের বিনিময়ে ক্রয়ের কোনো ব্যাপার ছিল না। একমাত্র বিভিন্ন পুণ্যকাজ, যেমন উপাসনা, উপবাস, দান-খয়রাত বা ক্রুসেডে যোগদান প্রভৃতির দ্বারাই কোনো জীবিত ব্যক্তি তার নিজের বা তার মৃত আত্মীয়ের জন্য পোপের ইচ্ছাপত্র লাভ করতে পারত। রেনেসাঁযুগের পোপরা তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইচ্ছাপত্রকে অর্থের বিনিময়ে প্রদান করতে শুরু করেন। তাঁরা ইচ্ছাপত্র বিক্রিকে রীতিমত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেন। বিভিন্ন ব্যাংক-প্রতিষ্ঠানকে কমিশন প্রদানের মাধ্যমে ইচ্ছাপত্র বিক্রি করতে নিযুক্ত করা হয়। জার্মানির আউগ্স বুর্গ এর ফুগার ব্যাংক পোপ দশম লিও এর জন্য ইচ্ছাপত্র বিক্রি করে বিক্রয়মূল্যের এক তৃতীয়াংশ কমিশন হিসাবে লাভ করত। ব্যাংকের এজেন্টরা মূর্খ লোকজনদের কাছে ইচ্ছাপত্রকে স্বর্গে যাওয়ার অনুমতিপত্র (Passport) হিসাবেই পরিচিতি দিত। অশিক্ষিত, মূর্খ সাধারণ মানুষ তাদের সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে দলে দলে ইচ্ছাপত্র ক্রয় করতে ছুটত।

(ঙ) চার্চের জাঁকজমক : ধর্মযাজকদের অর্থলোভ সর্বকালের সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একথা অবশ্য সঠিক যে পঞ্চদশ শতক থেকে রোমের পোপের ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। তদুপরি পোপের 'ব্যবিলনীয় বন্দিদশা' (Babylonian Captivity) ও 'মহাবিভেদ' (Great Schism) প্রভৃতির কারণে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব কমে যায়। হৃত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উদ্ধারকল্পে পোপের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না। রোমান চার্চের জাঁকজমক তাঁর ক্ষমতা উদ্ধারের একটি কৌশলরূপেই ব্যবহৃত হয়। এই জাঁকজমকের প্রকাশ ঘটত বিপুল অর্থ ব্যয়ের মধ্য দিয়ে, চার্চের সৌন্দর্য ও সৌকর্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। রেনেসাঁ যুগের পোপরা, যেমন দ্বিতীয় জুলিয়াস ও দশম লিও চার্চের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকে তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা নিজেরাই শুধু বিভিন্ন উপায়ে অর্থসংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করেননি, পুরো চার্চ-সংগঠনকেই এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এ কারণে কিউরিয়া পর্যন্ত কোনও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। প্রকৃতপক্ষে একটি কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যাদের প্রত্যেকেই এই অবৈধ অর্থোপার্জনের দ্বারা উপকৃত হচ্ছিল। তাদের কার্যকলাপের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে মানুষের জন্য পারলৌকিক কল্যাণসাধন অপেক্ষা ইহলৌকিক কার্যকলাপেই ছিল তাদের অধীর আগ্রহ। পৃথিবীর যাবতীয় ভোগবিলাসকে আকণ্ঠ পান করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। রোমে আগত তীর্থযাত্রীরা পোপ ও তাঁর অনুচরদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে মোহিত হওয়া অপেক্ষা রোমের চার্চের জাঁকজমক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হত বেশি। তাদের উপরও এর প্রভাব পড়ত। মূর্খ, অশিক্ষিত মানুষকে ধর্মের নামে ধোঁকা দেয়া যেমন সহজ ছিল, তেমনি তাদের প্রভাবিত করাও যেত অতি সহজে। চার্চের উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের একাংশের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তীর্থযাত্রা তাদের কাছে আনন্দযাত্রায়

www.icsbook.info

রূপান্তরিত হয়েছিল। সমসাময়িক লেখকদের লেখা থেকে জানা যায় যে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ঘটেছিল 'উগ্র ও বদ স্বভাবের' তরুণদের সমাবেশ। 'তারা উচ্চস্বরে চিৎকার' করত এবং তাদের সকলেই ছিল মাতাল। এরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজও সংঘটিত করত।

(চ) পবিত্রবস্তু প্রদর্শন : জনগণের মধ্যে কুসংস্কারের প্রভাবও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। চার্চ এটাকে কাজে লাগায়। চার্চের আনুষ্ঠানিকতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পবিত্রবস্তু প্রদর্শন (veneration of sacred relics)-এর দ্বারা জনগণের কাছ থেকে অর্থোপার্জন করা হত। ইউরোপের প্রত্যেক চার্চই যিশু, মেরি ও সাধুসন্তদের ব্যবহৃত দ্রব্য রেখেছে বলে দাবি করত। এগুলো দেখিয়ে বা স্পর্শ করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হত। প্রায় প্রত্যেক চার্চই দাবি করত যে যিশুকে যে ক্রুশে বিদ্ধ করে প্রাণবিনাশ করা হয়েছে তার একটি কাষ্ঠখণ্ড ঐ চার্চ সঞ্চিত রেখেছে। বিখ্যাত ওলন্দাজ মানবতাবাদী এরাসমাস (Erusmas) বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, এগুলো জোড়া দিলে একটা জাহাজ তৈরি করা যেতে পারত।

(ছ) মঠের দুর্নীতি : মঠগুলোর দশাও ছিল প্রায় একই রকম। অশিক্ষা ও দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ খ্রিস্টান মঠগুলো ইউরোপের বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল। বিশাল জমিজমার মালিক এই মঠগুলো অর্থ ও ধনসম্পদে ছিল পরিপূর্ণ। ভোগবিলাসে মঠের সন্ন্যাসীরা চার্চের ধর্মযাজকদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

চার্চের এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরেই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চতুর্দশ শতকে ইংল্যান্ডের জন ওয়াইক্লিফের (১৩২৪-১৩৮৪) আন্দোলন এবং বোহেমিয়ার জন্য হাস (১৩৬৯-১৪১৫) -এর আন্দোলন প্রধানত চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে পোপের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল পিসাতে (১৪০৯), কনস্ট্যান্স এ (১৪১৪-১৪১৮) এবং ব্যাসেল এ (১৪৩১-১৪৪৯)। এদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল আগাগোড়া চার্চকে সংশোধন করা। কিন্তু কোনোটাই ফলপ্রসূ হয়নি। চার্চের সংশোধনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন পোপরা স্বয়ং। প্রতিটি পোপ নিযুক্তির সময় সকলে আশা করত যে তিনি একাজে অগ্রসর হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যেত যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীর তুলনায় দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পথে আর একধাপ এগিয়ে গেছেন।

তা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক শিক্ষিত, সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে : এভাবে আর কতদিন চলবে? তাদের অনেকেই হয়তো রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে সংস্কারের মাধ্যমে নতুন করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকে নতুন মত ও পথের সন্ধানে লিপ্ত ছিলেন।

২. মতাদর্শগত কারণ

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ বিষয়ে একমত যে ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল কারণ নয়। এই আন্দোলনের পিছনে ক্যাথলিক ধর্মের অভ্যন্তরীণ মতভেদের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল।

www.icsbook.info

ক্যাথলিক ধর্মে দুটি মতবাদ বিরাজমান ছিল। একটি মধ্যযুগের প্রথমদিকে উদিত সেন্ট অগাস্টিন এর মতবাদ; মূলত বাইবেল এর উপর ভিত্তি করেই এই মতবাদ গঠিত। এই মত অনুসারে সমগ্র পৃথিবী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশে চলছে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। মানুষের ইহকাল ও পরকালের ভাগ্য ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং পূর্বনির্ধারিত। মানুষের ক্ষমতা নেই যে সে এই শক্তিকে অতিক্রম করতে পারে। সে এমনি অসহায় যে নিজেকে পাপকাজ থেকে বিরত রাখাও তার নিজের পক্ষে অসাধ্য। শুধুমাত্র গুটিকয়েক ভাগ্যবান ঈশ্বরের অপার করুণায় নিজেকে শুদ্ধচিত্ত রাখতে সক্ষম এবং পরকালের মঙ্গললাভে সমর্থ হবেন।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে ইউরোপের অরাজক পরিস্থিতিতে উপরোক্ত তত্ত্বের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মানুষ তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছিল অসহায়; ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা ভিন্ন তার আর উপায় ছিল না। এই তত্ত্ব মধ্যযুগের শেষভাগে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। জার্মানির কিছু কিছু অঞ্চলে, যেখানে মধ্যযুগের শেষদিকের পরিবর্তনের ছোঁয়া বিশেষ লাগেনি– সেখানে এই তত্ত্ব টিকে ছিল। ধর্মসংস্কার বা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার বহুলাংশে এই মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে শহরগুলোর উৎপত্তি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিপেক্ষিতে উপরোক্ত তত্ত্ব ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষ তার নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না বা ভালো ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ, এ তত্ত্ব মানুষকে আর প্রভাবিত করতে পারে না। নতুন মতবাদ নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন পিটার লম্বার্ড ও সেন্ট টমাস একুইনাস। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে তাঁদের মতবাদ খ্রিস্টীয় মতবাদ হিসাবেই পরিচিত হতে থাকে। তাঁদের মতে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। তবে এ কাজ সে নিজে করতে পারে না; তার সাহায্যকারীর প্রয়োজন। ধর্মযাজকদের কাজ মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভে সাহায্য করা। তাঁরাই কেবল বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন (Sacraments)-এর দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ সাহায্য করতে পারেন, কারণ তাঁরা যিশুর প্রধান সহকারী সাধু পিটারের উত্তরসূরী। মানুষের পাপমোচন ও আত্মার শুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করার কাজে একমাত্র তাঁরাই ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই মানুষের জীবনে চার্চ ও ধর্মযাজকদের ভূমিকা অপরিহার্য।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিরোধিতা ছিল এই চার্চ ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সেন্ট অগাস্টিন এর মতবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্মের আদি রূপকেই তাঁরা খ্রিস্টধর্মের বিকৃত রূপ বলে অভিমত দেন এবং বাইবেল ও অন্যান্য খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এসবের কোনো উল্লেখ নেই বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা ধর্মযাজকদের যাবতীয় কার্যকলাপ, যেমন অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা, কুমারী মেরির উপাসনা, পারগেটরিতে বিশ্বাস, দেবতাদের শুভেচ্ছা আনয়ন

www.icsbook.info

(Invocation of the Saints), পবিত্র বস্তু স্পর্শ বা দর্শন দ্বারা পুণ্যলাভ ইত্যাদিকে কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন।

এ প্রসঙ্গে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ওপর পূর্ববর্তী অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উপরোক্ত মতবাদ জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস-এ বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীর মেইস্টার এখার্ট (Meister Eckhart) এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, তথাপি তাঁদের প্রধান আক্রমণ ছিল চার্চের মধ্যযুগীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে, মানুষ তার স্বার্থচিন্তা পরিহার এবং ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়েই পরকালে স্বর্গে উপনীত হতে পারে। এসব অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল লুথার ও ক্যালভিন-এর উপরে।

তাঁরা আরও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ওয়াইক্লিফ এর মতবাদ ও হাসপন্থীদের মতবাদ দ্বারা। চতুর্দশ শতকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ওয়াইক্লিফ ক্যাথলিক মতবাদ এর কয়েকটি বিশেষ দিক, যেমন চার্চ এর পার্থিব ক্ষমতা, পোপের পারলৌকিক ক্ষমতা (Indulgences), ধর্মযাজকদের অলৌকিক ক্ষমতা (Transubstantiation) প্রভৃতিকে অস্বীকার করেন। তিনি ধর্মযাজকদের বিবাহ করার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন। ওয়াইক্লিফের মতবাদ মধ্য-ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চেক (Czech) ছাত্রদের দ্বারা। এই মতবাদ প্রচার করার অপরাধে বোহেমিয়ার জন হাস (John Huss) কে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। বোহেমিয়ার এই অমর সংস্কারকদের প্রতি মার্টিন লুথার তাঁর সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছেন।

৩. রাজনৈতিক কারণ

(ক) জাতীয় চেতনার উন্মেষ : রাজনৈতিকভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দুটি কারণে – প্রথমত ইউরোপে জাতীয় চেতনার প্রসার ও দ্বিতীয়ত রাজতন্ত্রের উৎপত্তির ফলে।

মধ্যযুগের শেষদিকে থেকে ইতালির বাইরের দেশগুলোর জনগণের মধ্যে স্বাধীন জাতীয় চেতনার ধারা ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। তাদের জাতীয় জীবনে অন্য রাষ্ট্রের প্রভাব তারা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। পোপকেও তারা বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পোপের হস্তক্ষেপকে তারা বিদেশী হস্তক্ষেপ বলেই ধরে নেয়। চতুর্দশ শতকে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত আইন Statutes of Provisors and Praeimonire দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পোপের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেই জারি হয়েছিল।

ফ্রান্সে ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দে জারি হয়েছিল Pragmatic Sanction of Bourges। এর দ্বারা পোপ কর্তৃক ফ্রান্সের ধর্মযাজকদের নিযুক্তি এবং তাঁর জনগণের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। নিজ জেলার ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া

www.icsbook.info

হয় সিভিল ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর। পরবর্তীতে এই আইন দ্বারা Pragmatic Sanction এর বিরুদ্ধে পোপের কোনো নিদের্শনামা (Papal Bull) নিয়ে ফ্রান্সে কেউ প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয়।

জার্মানিতে একক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব না ঘটলেও জাতীয় চেতনার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। সম্রাটের প্রতিনিধি সভা (Imperial Diet) ধর্মযাজকদের উপর আইন জারি করে। বিভিন্ন ডিক্রির মাধ্যমে জার্মানির রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা পোপ কর্তৃক ধর্মযাজকদের নিযুক্তি এবং তাঁদের অনুমতি ছাড়া পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

(খ) পোপের বিরুদ্ধে রাজার বিরোধিতা : অবশ্য পোপের বিরুদ্ধে জনগণের জাতীয় চেতনার বিকাশের সাথে একত্রিত হয়েছিল জাতীয় রাজ্যের স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার আকাঙ্ক্ষা। কোনো স্বৈরশাসকই তাঁর রাজ্যের ধর্মকে তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে পারেন না। মধ্যযুগের শেষের দিকে রোমান আইনের পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা প্রতিটি দেশের শাসকই এই মর্মে ঘোষণা দেন যে তাঁর দেশের জনগণ তাদের সকল বিষয় পরিচালনার অধিকার তাদের শাসকের উপর অর্পণ করেছে। ইংল্যান্ডে জন ওয়াইক্লিফ ও ফ্রান্সে পীয়ের দুবোয় (১২৫০-১৩১২)-এর মত অনুসারে পোপের পার্থিব ক্ষমতা রাজার উপর অর্পিত হওয়া উচিত। এই মত অনুসারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে পোপের সকল ক্ষমতা রাজ্য-অধিকর্তার উপর অর্পিত হবে। সে যাই হোক, রাজার রাজ্যক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে রোমের পোপের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহায্য করেছিল–সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. অর্থনৈতিক কারণ

(ক) চার্চ ও মঠের সম্পত্তি দখল : ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণও জোরদার ছিল। চার্চের বিশাল সম্পত্তি করায়ত্ত করা এ-আন্দোলনের পশ্চাতে একটি বিশেষ কারণ হিসাবে কাজ করেছে। মধ্যযুগের প্রথমদিক থেকেই ইউরোপের প্রতিটি চার্চ বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে থাকে। কোনো কোনো দেশে চার্চই সবচেয়ে বড় জমিদারে পরিণত হয়। এ ছাড়া ছিল এর গির্জার অগণিত সম্পদ, যেমন– অর্থ, সোনাদানা, অলংকার, দামি আসবাবপত্র, দামি ধাতুর তৈজসপত্র ইত্যাদি। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে জার্মানির এক-তৃতীয়াংশ জমি ছিল চার্চ ও মঠগুলোর অধীনে। একইভাবে ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ জমি ছিল চার্চ ও মঠগুলোর দখলে। বিভিন্ন সময়ে রাজা, ধনীব্যক্তিরা, এমনকি সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ মঠ ও চার্চগুলোকে বিপুল ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এসব সম্পত্তি ছিল খাজনামুক্ত। চার্চের হাতে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি সঞ্চিত থাকা অনেকেরই গাত্রদাহের কারণ ছিল। নবোদিত জাতীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ তাঁদের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহনের জন্য–বিশেষত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসব সম্পত্তির দিকে নজর দেন। উপরন্তু চার্চ ও মঠের সম্পত্তি করমুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত করের অধিকাংশই অন্যান্য

www.icsbook.info

নাগরিকদের উপর, বিশেষত বণিকশ্রেণীর উপরই পড়েছিল। ফলে, তাদের বিক্ষোভ ছিল চার্চের বিরুদ্ধে। ম্যানর প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে অনেক ছোটখাটো জমিদার ছিলেন নিঃস্ব হওয়ার পথে। তাদেরও দৃষ্টি ছিল চার্চের সম্পত্তির উপর। উপরন্তু, সামগ্রিকভাবে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে এদের সকলেরই বিশেষ ভূমিকা ছিল।

(খ) পোপের বিভিন্ন কর ও সম্পদ বাইরে পাচার : কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ ছিল পোপ কর্তৃক আরোপিত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন ধরনের খাজনা আদায় করা হত। প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারের উপর আরোপ করা হত একটি বার্ষিক খাজনা। এর নাম ছিল পিটার্স পেন্স (Peter's Pence)। এছাড়া বিভিন্ন খাতে, যেমন পোপের ইচ্ছাপত্র ক্রয়, আদালতের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ইত্যাদি বাবদ পোপকে বিভিন্ন সময়ে কর দিতে হত। Tithe নামক কর (উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ) চার্চকে দেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। চার্চের উচ্চপদ বিক্রির অর্থ অথবা ধর্মযাজকদের নিযুক্তির প্রথম বছরে প্রাপ্ত টাকা (First Fruit) পোপকে দিতে হত পরোক্ষভাবে জনগণকেই, কেননা ধর্মযাজকরা প্রকারান্তরে এ অর্থ জনগণের কাছ থেকেই আদায় করতেন। এসবের বিরুদ্ধে এ কারণে বিক্ষোভ ছিল না যে জনগণকে প্রচুর অর্থ দিতে হচ্ছে; বিক্ষোভের কারণ এটাই ছিল যে অর্থ দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। রোমের পোপকে কর দেয়া অর্থাৎ দেশের সম্পদ বাইরে পাচার হওয়া– সেটা কোনো দেশই আর সহ্য করতে রাজি ছিল না।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় খ্রস্টান মতবাদও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মুনাফার জন্য ব্যবসা করা খ্রিস্টীয় নীতিমালার পরিপন্থী। খ্রিস্টধর্মমত অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি সমাজকে যতটুকু সেবা (Service) প্রদান করে, তার চেয়ে বেশি অর্থ দাবি করতে পারে না। তাদের মতে, এর অতিরিক্ত অর্থ চার্চকে প্রদান করা উচিত, যাতে সেটা সমাজের সকলের কাজে লাগে। চার্চের মতে ব্যবসায়ীরা আসলে চোর, কারণ তারা জনগণকে ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে। শ্রমিককে কম মজুরি দেয়। অর্থ ধার দিয়ে সুদ নেয়াও খ্রিস্টানধর্মে নিষিদ্ধ—কারণ এটা একধরনের ডাকাতি। যে টাকা ধার দেয় সে পরিশ্রম না করে সুদের টাকা আদায় করে। কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ীদের পক্ষে চার্চের এই সিদ্ধান্ত মেনে চলা অসম্ভব। ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে, সেজন্যই মুনাফার প্রয়োজন। ব্যাংকারদের মতে, যারা টাকা ধার নেয়, তারা সেই টাকা বিনিয়োগ করে মুনাফা করে। অতএব, তাদের কাছ থেকে সুদ নেয়া অন্যায় নয়।

মোটের উপর প্রচলিত ক্যাথলিক মতবাদ নবোদিত ধনতন্ত্রের পথে বাধার সৃষ্টি করা ছাড়া সহায়ক শক্তি হিসেবে কোনো কাজ করছিল না। উদীয়মান বার্গার ও ব্যাংকারশ্রেণী ক্যাথলিকধর্মকে তাদের বিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। তারা এমন একটি মত ও পথের সন্ধান করছিল যেটা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক হবে। প্রোটেস্ট্যান্ট বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচলিত ক্যাথলিকধর্মের বিরোধিতা করে তাদের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল।

www.icsbook.info

৫. প্রত্যক্ষ কারণ

কিন্তু ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল জার্মানিতে পোপ এর ইচ্ছাপত্র বিক্রি। জার্মানির উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন লুথার পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞান করেন। তখন থেকেই শুরু হয় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন।

জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল?

ঐতিহাসিকভাবে জার্মানি ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সূতিকাগার। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় জার্মানি ছিল অনেকখানি পশ্চাৎপদ। রেনেসাঁর প্রভাব এর উপর সামান্যই পড়েছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালির তুলনায় জার্মানির জনগণের ধর্মপরায়ণতা ছিল গভীরে প্রোথিত। রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি তাকে ব্যথিত করেছিল অন্যদের তুলনায় অধিক হারে।

ইউরোপের অন্য দেশগুলোর তুলনায় জার্মানিকে ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছিল অনেকখানি। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রাজারা পোপের আধিপত্য থেকে নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বিভিন্ন ধরনের আইন পাস করে। জার্মানির একক কোনো শাসক না থাকায় তার সে শক্তি ছিল না। এ কারণেই পোপ দশম লিও তাঁর ইচ্ছাপত্র (Indulgence) বিক্রির জন্য জার্মানিকেই উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে বেছে নেন।

জার্মানির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। জার্মান চার্চের অধীনে ছিল দেশের এক-তৃতীয়াংশ উৎকৃষ্ট কৃষিভূমি। উপরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার ফলে মজুরি ও মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্রুত গড়ে উঠছিল। বণিক ও ব্যাংকার শ্রেণীর প্রসার ঘটছিল অতি দ্রুত। ক্ষুদ্র জমিদাররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের মুখে দিশাহারা হয়ে উঠছিল ক্ষুদ্র কৃষক ও সাধারণ নাগরিক। সকলের সম্মিলিত আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল ক্যাথলিক চার্চ, কেননা সেটাই ছিল সবচেয়ে ধনবান প্রতিষ্ঠান এবং চিহ্নিত শোষক।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও মার্টিন লুথার

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপেই প্রস্তুত ছিল। প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র একজন উপযুক্ত নেতার। জার্মানিকে দীর্ঘদিন এই নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। মার্টিন লুথার সেই দীর্ঘকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব প্রদান করতে এগিয়ে আসেন। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির থুরিঙ্গিয়া (Thuringia) রাজ্যে মার্টিন লুথার এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মা ছিলেন কৃষক। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই মার্টিন লুথারের বাবা ম্যানসফেল্ড (Mansfeld) এর খনিতে কাজ করতে সেখানে গমন করেন। এখানে তিনি কিছু ধন সঞ্চয় করেন। মার্টিন লুথারের বাবা-মা চেয়েছিলেন যে তাঁদের ছেলে আইনজীবী হোক। সেজন্য আঠারো বছর বয়সে মার্টিন

www.icsbook.info

লুথার এরফুর্ট (Erfurt) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি চার বছর পড়াশোনা করেন। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন লুথার একবার বজ্রপাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। অত্যন্ত ভীত হয়ে তিনি সেন্ট অ্যানে (St. Anne) এর নামে শপথ করেন যে তিনি সন্ন্যাসবাদে দীক্ষা নেবেন। অনতিবিলম্বে তিনি এরফুর্ট এর অগাস্টিনিয়ান মঠে যোগদান করেন। তিনি নিজের জীবনকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করেন। দিনের পর দিন কঠোর সংযমী জীবনযাপনের মধ্যদিয়ে লুথার জীবন কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন : কেমন করে ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন, যে মানুষ পাপমুক্ত নয়! দিনের পর দিন তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এর উত্তর খুঁজে বেড়ান। কেন যিশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে জীবন দিলেন? একমাত্র মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসাই কি এর কারণ, যা তাঁকে সাধারণ মানুষের ভাগ্যবরণ করতে বাধ্য করেছিল?

পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রি : লুথারকে উইটেনবার্গ (Wittenburg) বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য ডাকা হল। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ১৫১৭ সালে টেট্জেল (Tetzel) নামে একজন ডোমিনিকান সন্ন্যাসী পোপের ইচ্ছাপত্র বিক্রি করতে জার্মানিতে আসেন। পোপ দশম লিও ও আর্চবিশপ অব মেইন্জ (Archbishop of Mainz) এর পক্ষ থেকে অর্থসংগ্রহের জন্য টেট্জেল পোপের ইচ্ছাপত্রকে প্রায় স্বর্গে যাওয়ার প্রবেশপত্র হিসাবে বিক্রি করতে থাকেন।

লুথারের পঁচানব্বইটি থিসিস : যদিও স্যাক্সনিতে ইচ্ছাপত্র বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি টেট্জেল এই প্রদেশের সীমান্তে এসে উপনীত হন এবং উইটেনবার্গ শহরের লোকেরা প্রায় উন্মাদের মতো এই ইচ্ছাপত্র ক্রয় করতে ধাবিত হল। লুথার সাধারণ নিরীহ মানুষকে এইভাবে ধোঁকা দেয়ার পদ্ধতিতে অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হন। তিনি এই ইচ্ছাপত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষুব্ধ মতামত একটি তালিকা আকারে (Ninety five Theses) লিপিবদ্ধ করেন এবং সেকালের প্রথা অনুযায়ী সেটাকে উইটেনবার্গ-এর প্রধান চার্চ-এর প্রবেশ পথের দ্বারে ঝুলিয়ে দেন, (অক্টোবর ৩১ ১৫১৭ খ্রি.)। পরে এগুলোকে তিনি ছাপিয়ে প্রচার পত্র হিসেবে তাঁর বন্ধুর কাছে প্রেরণ করেন। অচিরেই দেখা গেল যে লুথারের পঁচানব্বইটি থিসিস এর তালিকা আসলে একটি জাতির বিক্ষুব্ধ চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছে। সমগ্র জার্মানিতে লুথার একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হলেন, যাঁকে ঈশ্বর ভণ্ডপোপ ও ধর্মযাজকদের আধিপত্য খর্ব করার জন্য পাঠিয়েছেন। ইচ্ছাপত্র বিক্রির বিরুদ্ধে জার্মানিতে প্রবল জনমত গড়ে উঠল। টেট্জেলকে জার্মানি থেকে বিতাড়ন করা হল। রোমের বিরুদ্ধে শুরু হল প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

ইচ্ছাপত্র বিক্রি বন্ধ হওয়ায় পোপের অর্থ আদায়ের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে পোপকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হল। অগাস্টিনীয় সংঘকে নির্দেশ দেয়া হল মার্টিন লুথারকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার আদেশ দেয়ার জন্য। লুথার শুধু সেটা অস্বীকারই করলেন না বরং আরও জোরালোভাবে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন। পরবর্তী দুবছর পোপ দশম লিও পবিত্র রোমান সম্রাট নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় লুথারের

www.icsbook.info

বিরুদ্ধে তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণ করতে সক্ষম হননি। এ দুবছরে লুথার যথেষ্ট স্বাধীনভাবে নিজের বক্তব্য প্রচার করতে সক্ষম হন। ক্রমশ তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মমতের সাথে তাঁর নিজের ধর্মমতের কোনও মিল হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যাথলিক চার্চের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

লুথারের বিরুদ্ধে পোপের বুল : ১৫২০ সালে পোপ দশম লিও মার্টিন লুথারের বিরুদ্ধে আদেশনামা (Papal Bull) প্রেরণ করেন। এর দ্বারা লুথারকে ষাট দিনের মধ্যে তাঁর মতামত প্রত্যাহার করতে বলা হয়। অন্যথায় তাঁকে ধর্মদ্রোহী (Heretic)রূপে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়।

লুথার প্রকাশ্যে পোপের আদেশনামা পুড়িয়ে এর প্রতিবাদ করেন। পোপ লুথারকে ধর্মের এলাকার বহির্ভূত (Excommunicate) ঘোষণা করেন এবং পবিত্র রোমান সম্রাটকে নির্দেশ দেন লুথারকে শাস্তি প্রদানের জন্য। সম্রাট পঞ্চম চার্লস একা এ-কাজ করতে সাহসী হলেন না। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিসভার অধিবেশন (Imperial Diet) আহ্বান করলেন। ১৫২১ সালে ওয়ার্মস (Worms) এ অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিসভার অধিবেশনে লুথারকে উপস্থিত হতে বলা হল। এখানে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে। লুথার সরাসরি অস্বীকার করলেন। প্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন চার্চ এর বিরুদ্ধে, কাজেই লুথারের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারল না। সম্রাট শুধু থাকে আইনবহির্ভূত ব্যক্তি (Out law) বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু লুথার ইতিপূর্বেই তাঁর বন্ধু স্যাক্সনির ইলেক্টর এর আশ্রয় পেয়েছিলেন। কাজেই ওয়ার্মস সভার নির্দেশ তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর করা গেল না।

এখানে বসে লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেল এর অনুবাদকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মার্টিন লুথার তাঁর স্বতন্ত্র ধর্মমতকে সম্পূর্ণরূপ দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

মার্টিন লুথারের ধর্মমত

মার্টিন লুথারের ধর্মমত প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। লুথার সমগ্র ক্যাথলিকচার্চ প্রথা এবং পুরোহিততন্ত্রকে, যেমন পোপ, আর্চবিশপ, বিশপ এবং পুরোহিতদের ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। একই সাথে তিনি মঠতন্ত্রেরও বিরোধিতা করেছেন। তিনি পুরোহিতদের বিবাহিত জীবনযাপন বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। খ্রিস্টধর্মানুষ্ঠান (Seven Sacraments) গুলোর মধ্যে একমাত্র দীক্ষাদান (Baptism) ও নৈশভোজ (Eucharist) ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠানকেই তিনি স্বীকার করেননি। এমনকি এ দুটো অনুষ্ঠানেরও কোনো অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে এটা মানতেও তিনি অস্বীকার করেছেন। ক্যাথলিক ধর্মের Transubstantiation অর্থাৎ বড়দিনের উৎসবের রুটি ও পানীয়তে যিশুর মাংস ও রক্তের অলৌকিক উপস্থিতিকে (ধর্মযাজক তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে রুটি ও পানীয়কে যিশুর মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত করতে পারেন বলে দাবি করেন) লুথার অস্বীকার

www.icsbook.info

করেন। তিনি এটাকে Consubstantiation এ (অর্থাৎ উৎসবের খাদ্য ও পানীয়তে যিশুর মাংস ও রক্ত প্রকৃতই উপস্থিত) রূপান্তরিত করেন। লুথার বিশ্বাসকেই (Faith) স্বর্গে গমনের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে ক্যাথলিকদের ভালো কাজ (Good Works) এর ওপর গুরুত্ব প্রদান নীতিকে তিনি পুরোপরি অস্বীকার করেছেন। উপবাস, তীর্থযাত্রা, পবিত্রবস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রার্থনাপূর্বক সাধুদের সাহায্য কামনা ইত্যাদির প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করেন। বাইবেল ও অন্যান্য খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ (Scriptures) কে তিনি সকলের উপরে স্থান দেন। অদৃষ্টবাদকে (Predestination) পুরোপুরি আস্থার সাথে গ্রহণ করা হয়। গির্জাকে রাষ্ট্রের অধীনে আনার সপক্ষে মত তিনি প্রকাশ করেন এবং চার্চ-সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার একমাত্র রাজারই থাকা উচিত—এ বিষয়ের উপরও তিনি জোর দেন।

লুথারবাদের প্রসারের জন্য জার্মানির তৎকালীন সামগ্রিক অবস্থা বিশেষভাবে দায়ী। লুথারের বিদ্রোহ ছিল একাধারে জাতীয় ও ধর্মীয় বিদ্রোহ। ধার্মিক খ্রিস্টানরা এতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ চার্চের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লুথার প্রতিবাদ করেছিলেন। পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী যারা তারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কেননা চার্চের সম্পত্তি হস্তগত করার মাধ্যমে এটা তাদের আরও ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। জার্মান দেশপ্রেমিকরা লুথারকে সমর্থন দিয়েছিলেন, কেননা রোমের আধিপত্য থেকে তিনি তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। জার্মান ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, নাইটবৃন্দ, বার্গার শ্রেণী, কারিগর ও কৃষক, সকলেই লুথারের হাত শক্ত করতে এগিয়ে আসেন, কারণ চার্চের সম্পত্তি হস্তগত করার মাধ্যমে সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কৃষকবিদ্রোহ : ১৫২৫ সালের কৃষকবিদ্রোহ লুথারের জীবিতকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। পঞ্চদশ শতকে জার্মানিকে কিছু কিছু কৃষকবিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু ষোড়শ শতকের বিদ্রোহে লুথারবাদেরও কিছু প্রভাব ছিল। জার্মানির কৃষকরা সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই অবহেলিত ও শোষিত ছিল। সার্ফপ্রথা ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের দুর্দশা বাড়ল বৈ কমল না। নবোদিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা মালিকের মজুর শ্রেণীতে পরিণত হল। জমিতে যারা আটকে রইল তাদের উপর জমিদার ও ধর্মযাজক উভয়ের শোষণই পুরোমাত্রায় অব্যাহত রইল। লুথারের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বানে জার্মানির কৃষকরাও সাড়া দিল, তবে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। যতদিন এই বিদ্রোহ ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, ততদিন মার্টিন লুথার এ বিদ্রোহকে সমর্থন করেন, কিন্তু যেইমাত্র এ বিদ্রোহ গণবিদ্রোহে পরিণত হল, সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল এবং কৃষকরা সার্ফপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান, সাধারণ জমিতে পশুচারণ অধিকার বা জলাভূমিতে মাছ ধরার অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার দাবি করল, তখনই লুথার জমিদার ও কৃষকের সংঘর্ষে তাঁর নিজস্ব ধর্মমতের বিপদ দেখতে পেয়ে এর বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি জমিদারদের পক্ষ নেন এবং যে কোনো পদ্ধতিতে কৃষকদের খতম করার আহ্বান জানান। অচিরেই এই বিদ্রোহ প্রশমিত হল; প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষক এতে মৃত্যুবরণ করে।

www.icsbook.info

জার্মানির কৃষকবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জমিদার ও ভূস্বামীদের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে, যেমন টাইকল ও ব্যাডেনে কৃষকদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে জার্মানির কৃষকরা সমসাময়িক ইউরোপের অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় প্রায় দুই শতাব্দী পিছিয়ে থাকে। কৃষকবিদ্রোহ দমিত হওয়ার ফলে এর প্রভাব লুথারবাদের উপরেও পড়ে। জার্মানির কৃষকরা যারা লুথারবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তারা লুথারকে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করে। ফলে তাদের উপর লুথারের প্রভাব কমতে থাকে। দক্ষিণ জার্মানির কৃষকদের উপর লুথারবাদের প্রভাব একেবারেই হ্রাস পায় এবং সনাতন ক্যাথলিক ধর্মমতকে আঁকড়ে ধরেই তারা টিকে থাকে। অন্যদিকে জার্মানির ছোট-বড় বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা, ধর্মীয় ব্যাপারে যাঁরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন, প্রথমদিকে কৃষকবিদ্রোহের প্রতি লুথারের সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সতর্ক হয়ে যান এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বজায় রাখেন। মোটকথা, কৃষকবিদ্রোহ জার্মানিতে লুথারবাদের প্রসারকে রোধ করে।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে স্পিয়ার (Speyer)-এ অনুষ্ঠিত পবিত্র রোমান সম্রাটের অধিবেশনে (Diet) জার্মানির রাজন্যবর্গ ক্যাথলিক ও লুথারপন্থী এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। যদিও লুথারবাদের স্থান কি হবে সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, তবুও অস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হল যে, 'প্রত্যেক রাজা এমনভাবে নিজেকে চালাবেন, যার দ্বারা তিনি ঈশ্বর ও সম্রাটকে সন্তুষ্ট করতে পারেন।' ১৫২৯ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী অধিবেশনে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ক্যাথলিক ধর্মের ওপরে জোর দিয়ে বলেন যে, বিধর্মীদের (Heretics) বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনগুলো ভালোমতো প্রয়োগ করা হবে এবং ধর্মীয় খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব কোনোভাবেই নতুন ধর্মের কাজে ব্যবহার করা হবে না। লুথারপন্থী রাজারা এর বিরুদ্ধে আইনগতভাবে বিরোধিতা করেন এবং ঘোষণা করেন যে তাঁরা ১৫২৬ সালের ঘোষণাকেই মেনে চলবেন। এই বিরোধিতার (Protest) জন্যই লুথারপন্থীদের তথা ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরোধীদের 'বিরোধিতাকারী' বা প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant) বলা হয়ে থাকে।

ফিলিপ মেলাঙ্কথন নামে একজন জার্মান মানবতাবাদী রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। 'রিফর্মড কনফেশন' (Reformed Confession) নামে পরিচিত ফিলিপের এই মতবাদ কিছুটা প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ ঘেঁষা ছিল। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে আউগ্সবুর্গের অধিবেশনে (Diet of Augsburg) এটা পেশ করা হয়। কিন্তু অধিবেশন এটা গ্রহণ করেনি।

জুইংলি ও ক্যালভিন মতবাদ

লুথার প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ জার্মানির বাইরে খুব বেশি প্রসারলাভ করেনি। কেবলমাত্র ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে লুথারবাদ সরকারি ধর্মমতরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। কিন্তু লুথারবাদকে অনুসরণ না করেও ক্যাথলিকবিরোধী একধরনের

www.icsbook.info

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ জন্ম নিয়েছিল সুইজারল্যান্ডে, যেখানে বেশ কয়েকশো বছর ধরে জাতীয়তাবাদ শক্তি সঞ্চয় করছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে সুইস ক্যান্টনের দুর্ধর্ষ পশুপালক ও কৃষকরা তাদের উপর অস্ট্রিয়ার আধিপত্যকে অস্বীকার করে এবং শেষপর্যন্ত ১৪৯৯ সালে পবিত্র রোমান সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানকে তাদের স্বাধীনতা প্রদানে বাধ্য করে। বিদেশী রাজনৈতিক আধিপত্য ছুঁড়ে ফেলে সুইজারল্যান্ডবাসীরা পোপের আধিপত্যকেও মেনে নিতে অস্বীকার করে। উপরন্তু জুরিখ, ব্যাসেল, বার্ন, জেনেভা প্রভৃতি নগরসমূহ সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। এসব নগরীর অধিবাসীরা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ বুর্জোয়া মানসিকতা নিয়ে এবং ক্যাথলিক ধর্মের দারিদ্র্যমহিমায় তারা মোটেই আকৃষ্ট হচ্ছিল না।

এ ছাড়া উত্তরের দেশগুলোর মানবতাবাদী দার্শনিকদের মতবাদ তাদের মনে স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রখ্যাত মানবতাবাদী এরাসমাস বেশ কিছুকাল ব্যাসেল এ বাস করেছিলেন। এ ছাড়াও সুইজারল্যান্ড পোপের ইচ্ছাপত্র (Indulgence) বিক্রির উর্বর ভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। কতিপয় অসাধু সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামিও প্রত্যক্ষ করেছিল বার্ন এর অধিবাসীরা। এসব কারণেই সুইজারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। প্রথম যিনি সুইজারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তিনি হলেন উলরিখ জুইংলি। লুথারের সমসাময়িক জুইংলি ছিলেন একজন ধনী ম্যাজিস্ট্রেট এর পুত্র। তিনি ভিয়েনা ও ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। দর্শন ও সাহিত্যে ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। বাইশ বছর বয়সে তিনি ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করলেও এর মাধ্যমে সাহিত্যের জগতে প্রবেশের অধিকার পাওয়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে তিনি পোপের আনুকূল্য লাভ করেন।

১৫১৯ সালে জুইংলি অকস্মাৎ ক্যাথলিকবিরোধী মতবাদে দীক্ষিত হন। আকস্মিকভাবে প্লেগরোগে আক্রান্ত হওয়া ও মার্টিন লুথারের মতবাদে আকৃষ্ট হওয়াই তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ ছিল।

এরপর থেকেই ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে জুইংলির আপোসহীন যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি Consubstantiation (উৎসবের খাদ্য ও পানীয়তে যিশুখ্রিস্টের মাংস ও রক্তের প্রকৃতই উপস্থিতি) ছাড়া লুথারের সমগ্র মতবাদই গ্রহণ করেন। জুইংলির মতে রুটি ও মদ শুধুমাত্র প্রতীক দ্রব্য। Holy communion-কে তিনি শুধুমাত্র স্মারক অনুষ্ঠানে পরিণত করেন।

তিনি এত সফলভাবে ক্যাথলিক বিরোধী আন্দোলন প্রচার করেন যে ১৫২৮ সালের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের সমগ্র উত্তরাঞ্চল প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মমত পরিত্যাগ করে। কিন্তু রক্ষণশীল অরণ্যাবৃত ক্যান্টনগুলোতে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে জুইংলি প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

১৫২৯ সালে সুইজারল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দুবছরের এ যুদ্ধে জুইংলিপন্থীরা পরাজয়বরণ করে এবং জুইংলি মৃত্যুবরণ করেন। শেষপর্যন্ত ক্যাপেল-এর চুক্তি

www.icsbook.info

অনুযায়ী (১৫৩১) প্রোটেস্ট্যান্টরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন যে কয়েকটি ক্যান্টনবাসী জনগণের ধর্মীয় মতবাদ সেখানকার সরকার কর্তৃকই নির্ধারিত হবে।

উত্তরের ক্যান্টনগুলো থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ জেনেভায় প্রসারিত হতে থাকে। জেনেভায় ছিল দুটি সরকার। একটি স্থানীয় বিশপ শাসিত, আরেকটি কাউন্ট অব স্যাভয় এর নেতৃত্বাধীন। এ দুজন শাসক যখন নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ষড়যন্ত্র করছিলেন, তখন এখানকার জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষপর্যন্ত দুজনকেই বিতাড়িত করে জেনেভার জনগণ নগরটিকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে (১৪৩০)। কিন্তু এই আন্দোলন উত্তরের ক্যান্টনগুলোর সাহায্য ছাড়া সফল হতে পারত না। অনতিবিলম্বে উত্তরের প্রোটেস্ট্যান্ট প্রচারকবৃন্দ জুরিখ ও বার্ন থেকে জেনেভায় আগমন করেন। এরকম এক সন্ধিক্ষণে জেনেভায় আগমন করেন জন ক্যালভিন।

জন ক্যালভিন

জন ক্যালভিনের নাম সুইজারল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেলেও ক্যালভিন কিন্তু সুইজ্যারল্যান্ডের প্রকৃত অধিবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফরাসি। ১৫০৯ সালে তিনি ফ্রান্সের পিকার্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর এক অভিজাত বন্ধুর নিকট লালন-পালনের ভার দেন। প্রথম জীবনে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করেন, কিন্তু তাঁর 'খুঁত ধরা স্বভাবের' জন্য তিনি সেখানে টিকতে পারেননি।

এরপরে তাঁর পিতার নির্দেশে তিনি অর্বিন্স (Orbeans) বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। সেখানে তিনি মার্টিন লুথারের ধর্মীয় মতবাদের সংস্পর্শে আসেন। এমনভাবে তিনি এই মতবাদে দীক্ষিত হন যে শেষপর্যন্ত তাঁকে ঈশ্বর-বিরোধিতার (Heresy) দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়।

১৫৩৪ সালে তিনি সরকারি রোষানলের হাত থেকে রক্ষা পেতে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। প্রথমে ব্যাসেল ও পরে জেনেভাকে তিনি তাঁর ধর্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে বেছে নেন। জেনেভাতে তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিক্ষোভ চলছিল। এমনভাবে ক্যালভিন তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজ চালান যে ১৫৪১ সালে একই সাথে জেনেভার সরকার ও ধর্ম তাঁর করতলগত হয়। ১৫৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জেনেভাকে লৌহদৃঢ় হস্তে শাসন করেন। ইতিহাসে এমন গুটিকয়েক ব্যক্তিই মাত্র জন্মেছেন, যাঁরা ক্যালভিনের মতো নিজের মতাদর্শের অভ্রান্ততায় চরমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

ক্যালভিনের শাসনে জেনেভা একটি ধর্মীয় অলিগার্কিতে (গোষ্ঠীশাসন) পরিণত হয়। সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল একদল ধর্মীয় যাজকবৃন্দের হাতে, যাঁরা সবধরনের আইন প্রণয়ন করে ধর্মযাজক ছাড়াও ১২ জন নেতার সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থার (consistory) কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতেন। এই সংস্থার কাজ ছিল জনগণের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নীতিবোধকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। শুধুমাত্র বহির্জগতের

www.icsbook.info

কার্যকলাপই এঁরা কঠোর হস্তে পরিচালনা করতেন না, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানো ছিল এঁদের কাজ।

জেনেভা প্রজাতন্ত্র তথা শহরটিকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হল। একটি consistory কমিটির উপর ভার দেওয়া হল– কোনোরূপ পূর্বঘোষণা ছাড়া যে কোনো বাড়িতে ঢুকে এর সদস্যদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার। এমনকি সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলেও কঠোর শাস্তি দেয় হত। নাচ, তাসখেলা, থিয়েটার দেখা, Sabbath এর কাজ করাও ছিল ভয়ংকর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরাইখানা মালিকদের উপর কঠোর আদেশ ছিল যেন কোনো অতিথি পূর্বে প্রার্থনা না করে কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ না করে তা দেখা, কেউ যেন রাত নটার পর জেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, যদি না কেউ অন্য কারও উপর নজর রাখার কাজে নিয়োজিত থাকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শাস্তিবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। নরহত্যা ও দেশদ্রোহিতা শুধু যে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হত তাই নয়, ব্যভিচার, ডাইনি বলে গণ্য হওয়া, ঈশ্বরদ্রোহিতা এবং ধর্মদ্রোহিতা (heresy) কে ভয়ানক অপরাধ বলে গণ্য করা হত, যদিও শেষোক্ত বিষয়টি ছিল ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

ক্যালভিন জেনেভার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম চারবছরের মধ্যে শহরের ১৬,০০০ নাগরিকের মধ্যে কমপক্ষে ৫৮ জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এসব নিষ্ঠুর শাসন পদ্ধতির প্রভাব ছিল অতি সামান্য। প্রিজার্ভড স্মিথ তাঁর *The Age of the Reformation* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর জেনেভায় অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যায়।

ক্যালভিনের ধর্মমতের সারকথা

Institutes of the Christian Religion গ্রন্থে ক্যালভিনের মতবাদের সারকথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে এবং এরপর এটা অনেকবার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। সেন্ট অগাস্টিন এর ধর্মীয় মতবাদে সাথে ক্যালভিনের মতবাদের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে। ক্যালভিনের মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মহাশক্তিশালী ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আপন মহিমায়। আদি পিতা আদমের পাপের কারণে সমগ্র মানবজাতি প্রকৃতিগতভাবেই পাপী, পাপের উত্তরাধিকার তাকে বহন করতেই হবে এবং এর থেকে তার আর মুক্তি নেই। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর পূর্বেই তার অদৃষ্ট লেখা হয়েছে ঈশ্বরের নির্দেশক্রমে। তিনিই তার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বা অভিশাপ পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং কেউ তার উপর আরোপিত এই বিধান খণ্ডাতে পারবে না।

কিন্তু ক্যালভিনের মতে, এর কারণে কোনো খ্রিস্টান এই পৃথিবীতে তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। যদি তিনি ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরই তার মনে পুণ্যের পথে চালিত হওয়ার অভিপ্রায় সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস ও Sacraments (খ্রিস্টীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান) এ অংশগ্রহণের মাধ্যমেও ঈশ্বরের 'নির্বাচিত

www.icsbook.info

ব্যক্তি' হওয়া সম্ভব। কিন্তু সবার উপরে ক্যালভিনপন্থীদের কাজ ছিল খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে একটি কঠোর নৈতিক জীবনযাপন করা। প্রাচীন হিব্রুদের মতো নিজেদের তারা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাঁর পৃথিবীতে তাঁর মহান লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রেরিত মানবগোষ্ঠী হিসাবেই মনে করত। নিজেদের আত্মার মুক্তি তাদের কাম্য ছিল না, ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তনই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

তবুও ক্যালভিনপন্থীরা ঈশ্বরের নির্দিষ্ট বিধান মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। খুব কম ধর্মাবলম্বীই ক্যালভিন মতবাদের মতো এতখানি মিশনারি কার্যকলাপ, প্রকৃতিকে জয় করার প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে ক্যালভিনের মতবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের ঈশ্বরের 'নির্বাচিত' মনে করে পৃথিবীকে তার আপন লক্ষ্যে চালিত করার ব্রত নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে। এবং ঈশ্বর তার পাশে রয়েছেন এ বিশ্বাস হৃদয়ে স্থাপন করেই সর্ববিধ প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করার সাহস অর্জন করেছে।

লুথার ও ক্যালভিনের মতবাদের পার্থক্য

ক্যালভিনের মতবাদ লুথারের থেকে অনেকাংশেই ছিল পৃথক। প্রথমত লুথার যেখানে ব্যক্তির বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন, সেখানে ক্যালভিন তাঁর ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আইনের ছত্রছায়ায় স্থাপন করে সেই আইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, ঈশ্বর একজন শক্তিশালী বিধান-নির্দেশকারী, যিনি তাঁর বিধানগুলো ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের নিকট কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ক্যালভিনের ধর্মমত লুথারের থেকেও বেশি বাইবেলের পুরাতন টেস্টামেন্টের অনুসারী। Sabbath পালনের মধ্যদিয়ে দুজনের এই পার্থক্য বেশি করে প্রতীয়মান হয়। রবিবারে প্রার্থনার বিষয়ে লুথারের মতবাদ বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত মতবাদের অনেক নিকটবর্তী। রবিবারে গির্জায় প্রার্থনায় উপস্থিত থাকার বিষয়ে লুথার জোর দিতেন, কিন্তু তার অর্থ তাঁর নিকট এটা ছিল না যে দিনের অন্যান্য সময়ে খ্রিস্টানরা আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হতে পারবে না। কিন্তু ক্যালভিন ছিলেন অনেকটা প্রাচীন ইহুদিদের মতানুসারী, যারা রবিবারে প্রার্থনা ভিন্ন অন্য সব পার্থিব কাজকে নিষিদ্ধ বলে মনে করত।

তৃতীয়ত, ক্যালভিনের ধর্মমত তৎকালীন উদীয়মান পুঁজিবাদের বেশি কাছাকাছি ছিল। লুথারের বেশির ভাগ সহানুভূতি ছিল সামন্ত-জমিদারদের প্রতি। অন্যদিকে, ক্যালভিন বণিক ও মহাজনদের তাঁর প্রবর্তিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। ব্যবসাকাজে বণিকের পরিশ্রম তাঁর বিবেচনায় ছিল একটি অত্যন্ত উঁচুদরের কাজ।

সর্বশেষে ক্যালভিনের মতবাদকে লুথারবাদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের একটি উগ্র মতবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। মার্টিন লুথার ক্যাথলিক মতবাদের

www.icsbook.info

প্রার্থনাপদ্ধতির বেশকিছু বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্যালভিন তা পুরোপুরি বর্জন করেন।

ক্যাথলিক গির্জা-সংগঠনের সবকিছু পরিত্যাগ করে ক্যালভিন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথায় তার গির্জা-সংগঠনকে গড়ে তোলেন। উপাসনা পদ্ধতি, গির্জার বাদ্যসহ আবহ সংগীত, রঙিন কাঁচের জানালা বা যিশু, মেরি বা সাধুসন্তদের মূর্তি একেবারে দূর করে ধর্ম ও গির্জাকে শুধুমাত্র চারদেয়াল ও প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ করে আনা হল। এমনকি বড়দিন, ইস্টার পালনও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ধর্মানুসারীরা নিজেদের পুরোহিত ও ধর্মপ্রচারক নিজেরাই নির্বাচিত করতেন এবং সমগ্র চার্চ-সংগঠন পরিচালিত হত একদল মন্ত্রীদের দ্বারা।

ক্যালভিনের মতবাদ শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকল না। পশ্চিম ইউরোপের যেসব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সেসব দেশেই ক্যালভিন মতবাদ প্রসারলাভ করে। ক্যালভিনপন্থীরা এক এক দেশে এক এক নামে পরিচিত ছিল। ফ্রান্সের হিউগনোরা, ইংল্যান্ডের পিউরিটানগণ, স্কটল্যান্ডের প্রেসবাইটারিয়ানবৃন্দ এবং হল্যান্ডের সংশোধিত গির্জার অনুসারীরা– সকলেই ছিলেন ক্যালভিনপন্থী। এটা মূলত ছিল ইউরোপের উদীয়মান বুর্জোয়াদের ধর্মমত, যদিও অন্য শ্রেণী থেকে আগত জনগণ এ মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিল। আধুনিক মূল্যবোধ প্রবর্তনে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহস সঞ্চয়ে এ ধর্মমতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ মতের অনুসারীদের কল্যাণেই ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং নেদারল্যান্ডসের স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এ ধর্মমতের অনুসারীরাই করেছিলেন।

www.icsbook.info

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার বা ধর্মীয় প্রতিসংস্কার

১৬ শতকের ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের ইতিহাস আগেই বর্ণিত হয়েছে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই আল্পস্ পর্বতের উত্তরস্থ ইউরোপের অধিকাংশ দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিস্তার ঘটে। উত্তর ও মধ্য জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জার্মানিতেও অনেকে এ ধর্মমতের অনুসারীতে পরিণত হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলও রোমান ক্যাথলিক চার্চের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করে। স্কটল্যান্ডে ক্যালভিনপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয। সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনসমূহে জুইংলি ও ক্যালভিনের প্রোটেস্ট্যান্ট মতের প্রসার ঘটে। তদুপরি পোল্যান্ডের অভিজাতশ্রেণী প্রোটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেছিল। হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড) এবং ফ্রান্সেও প্রোটেস্ট্যান্ট মতের প্রসার ঘটছিল। এমনকি স্পেন এবং ইতালিতেও প্রোটেস্ট্যান্ট মতের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এভাবে দেখা গেল, একদা পুরো ইউরোপ রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীনস্থ ছিল বটে, কিন্তু ষোলো শতকের মধ্যভাগের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ইউরোপ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মমত অবলম্বন করে।

এ অবস্থায় ষোলো শতকের মধ্যভাগে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরেই একটি সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হয়। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের দোষত্রুটি দূর করে ক্যাথলিক ধর্মমতকেই খ্রিস্টানজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের পুনরায় ক্যাথলিক চার্চের আওতায় নিয়ে আসা। প্রাটেস্ট্যান্ট চার্চের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ নতুন সংস্কার আন্দোলন 'ক্যাথলিক সংস্কার আন্দোলন' বা 'ধর্মীয় প্রতিসংস্কার আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের নানাপ্রকার দোষত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট মতের প্রসারকে রোধ করার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় 'প্রতি-সংস্কার' আন্দোলন (Counter-Reformation)।

ক্যাথলিক চার্চের দ্বারা পরিচালিত প্রতি-সংস্কার আন্দোলন নানা দিক দিয়ে ব্যাপক পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছিল। প্রথমত, ক্যাথলিক চার্চ অনেকাংশে নিজেদেরকে দোষত্রুটি ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের ক্যাথলিক

www.icsbook.info

প্রভাবিত কয়েকটি অঞ্চলে ক্যাথলিক চার্চের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং যেসব অঞ্চল সাময়িকভাবে ক্যাথলিক চার্চের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এমন কয়েকটি স্থানে ক্যাথলিক গির্জার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সতেরো শতকের প্রথম সিকিভাগে দক্ষিণ জার্মানি, পোল্যান্ড, দক্ষিণ নেদারল্যান্ডস, হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়াতে ক্যাথলিক ধর্মমত পুনরায় একক আধিপত্য লাভ করে। এছাড়া, স্পেন ও ইতালি থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বীরা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়। এভাবে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত যখন অর্ধেক ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলে, তখন প্রতি-সংস্কার আন্দোলনই অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরোপকে ক্যাথলিক গির্জার শাসনের অধীনে রাখতে সমর্থ হয়।

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ-সংগঠন

ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তা ক্যাথলিকগণই দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে এসেছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের একটা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ বহুবার গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোনোবারই তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে, প্রাটেস্ট্যান্ট ধর্মমত যখন ইউরোপের এক বড় অংশে জয়লাভ করল তখন ক্যাথলিক গির্জার সংস্কারসাধন ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। ষোলো শতকের মধ্যভাগে পোপ তিনটি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতি-সংস্কার আন্দোলনকে কার্যকর রূপ দেন। এ তিনটি অঙ্গ-সংগঠন হল : (১) ট্রেন্ট এর সাধারণ সভা (Council of Trent), (২) ধর্মীয় আদালত বা ইনকুইজিশন (Inquisition) প্রতিষ্ঠা, (৩) যিশুর সমিতি বা জেসুইট সংঘের প্রতিষ্ঠা।

১. ট্রেন্ট এর সাধারণ সভা

ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরের নানাপ্রকার দুর্নীতি ও দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের একটা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টা অনেককাল ধরেই আলোচিত হচ্ছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের আগে থেকেই ঐক্যবদ্ধ রোমান ক্যাথলিক চার্চের নেতৃস্থানীয় যাজকরা একটা সাধারণ সভা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানাচ্ছিলেন। প্রতিবাদী আন্দোলন বা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা জার্মানির মার্টিন লুথারও প্রথমে এরকম একটা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন শুরু হলে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসও একটা সাধারণ সভা করে সংস্কারের মাধ্যমে একটা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছে খ্রিস্টানদের বিভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টরা রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে পৃথক হয়ে যায়।

অবশ্য এরকম একটা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রথমত, রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের সভা

www.icsbook.info

অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন, কারণ ঐ সাধারণ সভার ক্ষমতা পোপের ক্ষমতার চেয়ে বেশি বলে গণ্য হবে কিনা এ বিষয়ে বিভিন্ন পোপের মনে সন্দেহ ছিল। পরে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেওয়ায় এরকম সাধারণ সভা আহ্বানের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যেও ছিল বিরোধ— যেমন ইতালীয় এবং জার্মানদের মধ্যে। এ ছাড়া দুই প্রধান ক্যাথলিক রাজবংশের মধ্যে এক পর্যায়ে যুদ্ধও শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধ ঘটেছিল ফ্রান্সের রাজবংশ এবং জার্মানি ও স্পেনের শাসক হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের মধ্যে।

এসকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত পোপ তৃতীয় পল (Paul III) ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মানতুয়াতে যাজকদের একটা সাধারণসভা আহ্বান করেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস এবং ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এর মধ্যে তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে ধর্মসভার অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত পোপ তৃতীয় পলই নতুন করে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে ইতালি সীমান্তের ঠিক অপরপারে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার ট্রেন্ট নগরীতে ধর্মসভার আয়োজন করেন। এরপরও নানা কারণে সভা অনুষ্ঠানে বিলম্ব ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ট্রেন্ট নগরে সভার অধিবেশন শুরু হয়। দীর্ঘকাল ধরে সভার কাজ চলতে থাকে। এর মধ্যে ১৫৪৭ সালে ট্রেন্ট নগরে মহামারী দেখা দিলে সভার অধিবেশন বোলোনা (Bologna) নগরে স্থানান্তরিত হয়। এখানে ধর্মসভার কয়েকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ সকল সভায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মসভা পুনরায় ট্রেন্ট নগরীতে ফিরে আসে। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে ট্রেন্ট এর ধর্মসভা চূড়ান্তভাবে মুলতুবি হয়ে যায়। সুতরাং, ট্রেন্ট-এর ধর্মসভা ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল বলে গণ্য করা চলে। তবে, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এ সাধারণ সভা ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

ট্রেন্ট এর ধর্মসভা ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার সাধনে এবং ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ট্রেন্ট এর সাধারণসভায় প্রোটেস্ট্যান্টদেরও উপস্থিত হওয়ার জন্য পোপ আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু এ সভায় প্রোটেস্ট্যান্টরা যোগদান করেননি। শুধুমাত্র রোমান ক্যাথলিক মতের যাজকরাই এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত যাজকদের সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট ছিল না, এক এক অধিবেশনে এক এক রকম উপস্থিতি ছিল। প্রথম অধিবেশনে ভোটদানের ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চপদস্থ যাজকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪ জন। কোনো সময়েই সভায় উপস্থিত যাজকদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না এবং সব অধিবেশনেই ইতালীয় ও স্পেনীয় যাজকদের সংখ্যা বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত যাজকরা এমন বিপুল খ্যাতির অধিকারী ছিলেন যে ট্রেন্ট এর সাধারণ সভা, তার পূর্ববর্তী ১৮টি সাধারণসভার (General Council) সমপর্যায়ের বলে গণ্য হয়েছিল।

কার্যাবলী : ট্রেন্ট এর সাধারণসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম থেকেই মতভেদ দেখা দিয়েছিল। পোপ ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে যে কোনোরকম

www.icsbook.info

সমঝোতা স্থাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী। পোপ চাইছিলেন যে সাধারণসভা ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় তত্ত্বগুলো এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে যেন তার দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় তত্ত্বকে খণ্ডন করা সম্ভব হয় এবং সবরকম বিরুদ্ধবাদীদের দমন করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে, ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে, সবরকম ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের উৎখাত করার জন্য রোমান 'ইনকুইজিশন' বা ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এ বিষয়টা স্থির করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল যে ক্যাথলিক চার্চের বিচারকগণ কোন্ কোন্ তত্ত্বকে সহ্য করবেন এবং কোন্ কোন্ কথাকে বিরুদ্ধবাদী বলে গণ্য করবেন। অপরপক্ষে সম্রাট পঞ্চম চার্লস এর উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম চার্লস শুধু স্পেনেরই সম্রাট ছিলেন না, জার্মানির শাসক হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে 'পবিত্র রোমান সম্রাট' বা 'হোলি রোমান এম্পারার' (Holy Roamn Emperor) হন এবং জার্মানির ভূখণ্ডের সম্রাটও হন। জার্মানির লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের বিদ্রোহের ফলে এ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার ফলে জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। পঞ্চম চার্লস তাই চাইছিলেন যে খ্রিস্টীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও প্রোটেস্ট্যান্টদের পুনরায় রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিতরে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হোক। ট্রেন্ট এর ধর্মসভার দ্বিতীয় দফার অধিবেশন চলাকালে সম্রাট পঞ্চম চার্লস বারবার চাপ দেওয়ায় প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মসভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য দুবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টরা কোনো উত্তর দেয়নি।

শেষপর্যন্ত ট্রেন্ট এর সাধারণসভায় পোপের ইচ্ছা অনুসারেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সভায় প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতিবাদী অভিমতকে মিথ্যা বলে বর্জন করা হয় এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বগুলোকে এমনভাবে সূত্রবদ্ধ করা হয় যে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে কোনোরকম আপোস করার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয় যে খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসের উৎস হিসাবে চার্চের নির্দেশও বাইবেলের মতোই অবশ্যপালনীয়। আর বলা হয় যে, পাপ থেকে মুক্ত হতে হলে শুধু ধর্ম পালন করলেই চলবে না, সৎকাজও করতে হবে (প্রোটেস্ট্যান্টরা বলত যে ধর্মপালনই পাপমুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট)। এ ধর্মসভায় আরও স্থির করা হয় যে ভালগেট (Vulgate) নামে পরিচিত ল্যাটিন ভাষায় লেখা বাইবেলকে একমাত্র প্রামাণ্য বাইবেলরূপে গণ্য করতে হবে ; চার্চের অনুমোদন ছাড়া কোনো বাইবেল ছাপানো চলবে না ; বাইবেলের ব্যাখ্যার অধিকার একমাত্র চার্চেরই থাকবে এবং ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার কারো থাকবে না। এ ধর্মসভায় পূর্বপ্রচলিত সাতটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা স্যাক্রামেন্ট (Sacrament) এর প্রতি পুনরায় সমর্থন জানান হয়। এ সাতটি স্যাক্রামেন্ট হল : খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদান (ব্যাপ্টিজম, baptism) ; যিশুর নৈশভোজ (ইউক্যারিস্ট, eucharist); খ্রিস্টীয় সমাজে পূর্ণদীক্ষাসহ অন্তর্ভুক্ত করা (কনফার্মেশন, confirmation); বিবাহবন্ধন (ম্যাট্রিমনি,

www.icsbook.info

matrimony); Ordination বা ধর্মযাজক পদে নিয়োগ; Penance বা প্রায়শ্চিত্ত আংকশন; extreme unction বা ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পবিত্র তৈল লেপন। প্রোটেস্ট্যান্টরা প্রথম দুটি অনুষ্ঠানকে স্বীকার করতেন, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মসভায় সাতটি অনুষ্ঠানকেই মেনে নেয়া হয়।

ট্রেন্ট এর ধর্মসভা তিনটি লক্ষ্য অর্জন করেছিল। প্রথমত, এ ধর্মসভায় একটি সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ ও কর্তৃত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে ক্যাথলিক গির্জার বিশ্বাস ও ধর্ম আচরণকে (faith এবং practices) সূত্রবদ্ধ করা হয়। মধ্যযুগে চার্চ বা গির্জার বিভিন্ন ধর্মনেতাগণ অনেকরকম অসঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন। ট্রেন্ট এর ধর্মসভা এ সকল অসঙ্গতি এড়িয়ে একটা সুনির্দিষ্ট গোঁড়া ধর্মতত্ত্ব প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, এ ধর্মসভা চার্চ সংগঠনকে শক্তিশালী করে এবং চার্চের প্রশাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্রশাসনাধীন ব্যবস্থায় পরিণত করে; এর ফলে ক্যাথলিক ব্যবস্থা এখন থেকে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে বিরোধীপক্ষের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, এ ধর্মসভা একটা সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করে যার দ্বারা ক্যাথলিক চার্চকে ঐসব অনাচার থেকে মুক্ত করে, যেসব বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে একত্রিত করে তার পূর্ব আধিপত্যকে পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নিল।

পুস্তকের তালিকা (Index) প্রস্তুত করা

ট্রেন্ট এর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পোপ একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ নিষিদ্ধ পুস্তকের একটি নতুন তালিকা প্রকাশ করেন। এতে যেসব বইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হল : (১) মধ্যযুগে নিষিদ্ধ ঘোষিত সমস্ত পুস্তক (২) নীতিবোধকে দূষিত করতে পারে এমন সমস্ত পুস্তক (৩) জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত পুস্তক এবং (৪) ধর্মদ্রোহীদের লেখা সমস্ত পুস্তক। এ জাতীয় সমস্ত বইকে বেআইনি করা হয়। এরপর যেসব বই ছাপা হয় সেগুলো থেকে বাছাই করে নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটা কমিটিও গঠিত হয়েছিল। ১৫৯৬ সালে যে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা পরবর্তী দেড়শো বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই তালিকায় পরে আরো নতুন নতুন বই সংযোজিত হয়েছিল। কেউ বেআইনি বই পড়লে তাকে তৎক্ষণাৎ চার্চের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার (excommunicate) করা হত। যেসব বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ফ্রান্সিস বেকন, বালজাক, অগাস্ট কোঁৎ, ডে কার্টে, আলেকজান্ডার ডুমা, আনাতোল ফ্রাঁস, অলিভার গোল্ডস্মিথ, ভিক্টর হুগো, জন স্টুয়ার্ট মিল, টলস্টয়, ভলতেয়ার, এমিলি জোলা প্রভৃতি লেখকদের লেখা বই। এভাবে ইনকুইজিশন ও পুস্তক নিষিদ্ধকরণের সাহায্যে চার্চ ক্যাথলিক সংস্কার কার্যকর করতে চেষ্টা করেছিল।

www.icsbook.info

২. ধর্মীয় আদালত (ইনকুইজিশন)

খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে ধর্মদ্রোহিতা বা হেরেসি (heresy) কে দমন করার উদ্দেশ্যে পোপ তৃতীয় পল ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে 'সর্বোচ্চ ধর্মীয় আদালত' বা 'সর্বোচ্চ ইনকুইজিশন' নামে একটি ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনকুইজিশন অবশ্য কোনো নতুন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তেরো শতকে ধর্মদ্রোহিতা এবং ধর্মবিরোধী চিন্তার ব্যাপক বিস্তার ঘটায় তৎকালীন পোপ 'পোপের ইনকুইজিশন' নামে একটি বিশেষ ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডোমিনিকান ও ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিচার করতেন। তখন মধ্য-ইউরোপে অনেকগুলো ইনকুইজিশন আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড ও স্পেনে ঐ সময়ে এ প্রথা প্রতিষ্ঠালাভ করেনি।

কার্যাবলী : ইনকুইজিশনের আদালতে তাদেরই বিচার হত, যারা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হত। কিন্তু এসকল ধর্মীয় আদালতে যে পদ্ধতিতে বিচার করা হত এবং অভিযুক্তদের উপর যে পরিমাণ উৎপীড়ন চালানো হত তা আধুনিক মাপকাঠিতে ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হয় না। এ কারণে আধুনিক যুগে ইনকুইজিশনের কার্যপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ইনকুইজিশনের বিচারপদ্ধতিতে বিচার শুরু হওয়ার আগেই অভিযুক্তকে দোষী বলে মনে করা হত। কোনো ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হোক বা না হোক, তাকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে ইনকুইজিশনের সামনে উপস্থিত করা হলেই ঐ ধর্মীয় আদালতের বিচারকরা ঐ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সচেষ্ট হতেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করত, তাহলে তাকে তুলনামূলকভাবে হালকা শাস্তি দেওয়া হত। অনেকেই ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও প্রাণের ভয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি প্রদান করত। যারা স্বীকারোক্তি প্রদান করত না, তাদেরকে নানাভাবে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে, অথবা মিথ্যাকথা বলে অথবা অনাহারে রেখে দুর্বল করে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হত এবং সে নির্যাতন ছিল নির্মম, ভয়াবহ ও পৈশাচিক। নির্যাতনের ফলে বাধ্য হয়ে যারা স্বীকারোক্তি প্রদান করত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হত। আর যারা শত নির্যাতনের পরেও স্বীকারোক্তি প্রদান করত না, তাদেরকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হত। মধ্যযুগে ধর্মদ্রোহিতাকে নরহত্যা বা রাজদ্রোহিতা থেকেও বেশি জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। একজন পোপ বলেছিলেন, মানুষ-প্রভুর বিরোধিতা করার চেয়ে স্বর্গীয় প্রভুর বিরোধিতা করা অসংখ্যগুণ বেশি অপরাধ। চার্চের এ দৃষ্টিভঙ্গি ষোলো শতকেও বিদ্যমান ছিল। তবে, পনেরো শতকের আগেই মধ্য-ইউরোপে ধর্মদ্রোহীদের এমন কঠোরভাবে দমন করা সম্ভব হয় যে পোপের ইনকুইজিশন এর কাজ ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়।

এ পটভূমিতে, পনেরো শতকের শেষদিকে স্পেনে 'স্পেনীয় ইনকুইজিশনের' উদয় ঘটে। এর আগে স্পেনের রাজারা তাদের দেশে পোপের ইনকুইজিশনের কাজ করার অনুমতি দেননি। কিন্তু ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের যুগ্ম শাসক ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা সেভিল নগরে 'স্পেনীয় ইনকুইজিশন' প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। স্পেনীয়

www.icsbook.info

ইনকুইজিশন স্পেনের রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে এটা একই সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্রমে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলো স্পেনীয় ইনকুইজিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্পেনীয় ইনকুইজিশনের নৃশংসতার কথা অতিদ্রুত সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। কত হাজার হাজার মানুষকে যে স্পেনীয় ইনকুইজিশন পুড়িয়ে মেরেছে এবং কত লক্ষ মানুষ যে তার অত্যাচারের শিকার হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। স্পেনীয় ইনকুইজিশনের কঠোর দমননীতির ফলে স্পেনের প্রোটেস্ট্যান্টপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছিল।

স্পেনীয় ইনকুইজিশনের সাফল্য দেখে পোপ তৃতীয় পল প্রভাবিত হন এবং ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যাথলিক চার্চের অধীনস্থ সমস্ত এলাকার তদারকির জন্য একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'রোমান ইনকুইজিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠন পরিচালনার জন্য ৬ জন কার্ডিনাল যাজককে ইনকুইজিটর-জেনারেল (Inquisitor-general) পদে নিয়োগ করা হয়। এই কার্ডিনালদের ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে ধর্মদ্রোহীরূপে অভিযুক্ত যে কোনো লোকের বিচার তাঁরা করতে পারতেন— সে ব্যক্তি প্রজা বা জমিদার যাই হোক না কেন। এ ইনকুইজিশন অন্যান্য স্থানে ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতাও পেয়েছিল। এই 'রোমান ইনকুইজিশন' যে কোনো লোককে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে বন্দি করতে পারত, মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারত। ইনকুইজিশনের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যেত না, শুধু পোপের কাছে আবেদন করা যেত। তবে, রোমান ইনকুইজিশন অন্যান্য দেশে রাজ-সরকারের সহযোগিতা ছাড়া কাজ করতে পারত না বলে, এর ক্ষমতা বাস্তবে ইতালিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরি ফ্রান্সে রোমান ইনকুইজিশন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু প্যারিসের পার্লামেন্টের প্রতিরোধের ফলে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে, ইতালিতে রোমান ইনকুইজিশন প্রোটেস্ট্যান্টপন্থীদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানকার প্রোটেস্ট্যান্টদের একাংশ তাদের বিরুদ্ধবাদী মত প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করে, অন্য একদল দেশত্যাগ করে; আর কিছু সংখ্যক ধর্মদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। রোমান ইনকুইজিশন স্পেনীয় ইনকুইজিশনের আদলেই গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এটা স্পেনীয় ইনকুইজিশনের চেয়ে নমনীয় ছিল।

৩. যিশুর সমিতি (Society of Jesus)

প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি সংগঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তা হল যিশুর সমিতি (Society of Jesus) বা জেসুইটগণ (Jesuits)।

এ ধর্মীয় সংঘটি দক্ষিণ ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক চার্চের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং উত্তর-ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলকে প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বা পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঐ সময়ে এ সংঘটি ছাড়াও 'ঈশ্বরপ্রেমের কথকতা' (অরেটরি অফ ডিভাইন লাভ, Oratory of Divine Love) ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জেসুইটদের সংঘ ছিল এদের

www.icsbook.info

মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও কর্মক্ষম সংগঠন। যিশুর সমিতি নামক এ সংগঠনটি ইগনেটিয়াস লয়োলা (Ignatius Loyola) কর্তৃক ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার ছয় বছর পরে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পোপ এ সংস্থার গঠনতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

লয়োলার জীবনী ও কার্যাবলী

প্রথম জীবনে ইগনেটিয়াস লয়োলা একজন সৈনিক ছিলেন। একজন দেশপ্রেমিক স্পেনীয় হিসাবে তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্পেনের বাস্ক অঞ্চলে লয়োলা দুর্গে আনুমানিক ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে ইগনেটিয়াসের জন্ম হয়েছিল। বাল্যকালে তিনি পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ পাননি, কোনোক্রমে পড়তে এবং লিখতে পারতেন মাত্র। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি আহত হন এবং দীর্ঘকাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন। হাসপাতালে থাকাকালে তিনি যিশুখ্রিস্টের জীবনী ও খ্রিস্টান সাধুদের জীবনী পাঠ করেন। ঐসব বই পড়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম ও চার্চের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা লাভ করেন। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে ইগনেটিয়াস লয়োলা তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনে যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সেখানকার স্থানীয় শাসনকর্তার অনুমতি পেলে তিনি সেখানে খ্রিস্টানধর্ম প্রচার করবেন। কিন্তু তীর্থযাত্রাকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত জ্ঞান তাঁর নেই। তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্পেনে ফিরে গিয়ে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমে তিনি বার্সেলোনাতে তিন বছর ধরে ল্যাটিন ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শেখেন। এরপর আলকালা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারও পরে সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এ দুই জায়গাতেই স্পেনীয় ইনকুইজিশনের সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে, কারণ তিনি কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই রাস্তাঘাটে নিজস্ব পদ্ধতিতে ধর্মপ্রচার করতেন। একবার তাঁকে কারাদণ্ডও দেওয়া হয়। এতে তিনি নিজ জন্মভূমির প্রতি এত ক্রুদ্ধ হন যে শেষ পর্যন্ত প্যারিসে গিয়ে তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। প্যারিসে থাকার সময়েই নতুন একটা ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে লয়োলা এবং তাঁর সমমতাবলম্বী ছয়জন ধার্মিক ব্যক্তি একটি গির্জায় একত্রিত হয়ে কৃচ্ছ্রতা এবং কৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করেন এবং পবিত্রভূমি জেরুজালেমে গিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন ভেনিসীয় প্রজাতন্ত্র এবং তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল বলে তাঁরা প্যালেস্টাইনে যেতে পারেননি। তার বদলে তাঁরা পোপের অধীনে কাজ করার জন্য ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে রোমে যান। পোপ তৃতীয় পল তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন কিন্তু উচ্চপদস্থ পাদ্রিরা নতুন একটা ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহী

www.icsbook.info

ছিলেন না। লয়োলা বারবার আবেদন করায় অবশেষে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পোপ এক নির্দেশ জারি করে যিশুর সমিতিকে অনুমোদনদান করেন।

লয়োলা সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সংগঠন 'যিশুর সমিতি'র সর্বাধিনায়ক (জেনারেল) নির্বাচিত হন। এ সমিতি ঘোষণা করে যে 'আধ্যাত্মিক শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এটা সংগঠিত হয়েছে' এবং 'যেসব মানুষ দেহ ও মনে প্রভু যিশুর প্রতি এবং পৃথিবীতে তাঁর আসল ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধির প্রতি অনুগত', কেবলমাত্র সে ধরনের লোক নিয়ে এ সমিতি গঠিত হয়েছে। জেসুইটদের সংঘ (যিশুর সমিতি) দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে লয়োলার মৃত্যুকালে, এ সংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল এক হাজার এবং এঁরা ১২টি প্রদেশে কার্যরত ছিলেন। জীবনের শেষপর্যায়ে লায়োলা এ সংঘের জন্য একটা গঠনতন্ত্র রচনা করেন, তবে তাঁর মৃত্যুর পরে এটা গৃহীত হয়েছিল। লয়োলা দীর্ঘকাল পড়াশোনায় ব্যাপৃত থাকলেও তিনি কখনও গভীর পাণ্ডিত্য বা প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারেননি, তবে ঐ সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তা ছাড়া তিনি অসাধারণ মনোবলের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি অন্য সব স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারতেন। গভীর কল্পনাশক্তির সাহায্যে তিনি রোমান চার্চকে এমন একটা উচ্চপর্যায়ে স্থাপন করেছিলেন যে তাঁর কাছে চার্চের বিরোধিতা আর ঈশ্বরের বিরোধিতার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর এসকল কৃতিত্বের জন্য চার্চ তাঁকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি প্রদান করে।

জেসুইটদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

জেসুইটদের সংঘ অন্যান্য খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের সংঘ থেকে পৃথক ধরনের ছিল। জেসুইটরা কোনো মঠে আবদ্ধ থাকতেন না। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মধ্যযুগের ধর্মীয় সংঘগুলোর আদর্শ কাজ ছিল জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়া, আর জেসুইটদের লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। যিশুর সমিতির সদস্যদের উপবাস পালন বা যোগী-সন্ন্যাসীদের মতো শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে বাধ্য করা হত না। তাঁদের আচরণে কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাঁরা যেখানে কাজ করতেন সেখানকার পাদ্রিদের মতো পোশাক পরতেন। অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের মতো জেসুইটরাও কৃচ্ছ্রতা, কৌমার্য এবং আনুগত্য পালনের প্রতিজ্ঞা করতেন। কিছু সংখ্যক উচ্চপর্যায়ের বাছাই করা জেসুইট-সদস্য অতিরিক্ত একটি প্রতিজ্ঞা করতেন; সেটা হল, পোপের প্রতি বিশেষ আনুগত্য পালন। পোপের নির্দেশ অনুসারে এঁরা যে কোনো স্থানে যেতে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। সংঘের সদস্য নির্বাচনের সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হত। নিখুঁত স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, যথেষ্ট পরিমাণ বুদ্ধি, জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান ও চেতনা এবং সরল চরিত্র—এসব গুণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। শুধু ভালোমানুষ এবং ঈশ্বরভক্ত হলেই চলত না। কারো বুদ্ধি যদি কম হত, তাহলে হাজার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হলেও তাঁকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত

www.icsbook.info

করা হত না। যাঁরা সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হত, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হত তাঁরা যেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকজনের সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে; যাতে সংঘের কাজে তাঁরা তাঁদের পুরো শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

জেসুইটদের সংঘে চূড়ান্ত আনুগত্যকে সবচেয়ে বড় গুণ বলে বিবেচনা করা হত। 'আনুগত্যের গুণাবলী' নামক একটি প্রবন্ধে (চিঠিতে) লয়োলা বলেছিলেন : 'অন্যান্য ধর্মীয় সংঘ হয়তো উপবাস, রাত্রিজাগরণ, আহার ও পোশাকের বিষয়ে কঠোরতা পালন (ইত্যাদিতে বিষয়ে) আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে ; কিন্তু যে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন তা হচ্ছে-আপনারা যাঁরা এ সংঘে কাজ করছেন তাঁরা নিজস্ব ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে খাঁটি ও নিখুঁত আনুগত্য প্রকাশের গুণ অর্জন করুন এবং এবিষয়ে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করুন।' ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে নিয়ম করা হয়েছিল যে প্রত্যেক জেসুইটকে এ প্রবন্ধটি প্রতি দুইদিনে একবার করে পড়তে হবে। কোনো ব্যক্তি যে মুহূর্তে জেসুইট সংঘের সদস্য হতেন তখন থেকেই তিনি ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করতেন। ঐ মুহূর্ত থেকে চার্চের কর্তৃত্বের প্রতি এবং সংঘের গুরুজনদের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রকাশ করাই ছিল সংঘের প্রতিটি সদস্যের জীবনের মূল নীতি। 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' নামক প্রবন্ধে লয়োলা বলেছেন যে, চার্চ যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে 'একটা জিনিস কালো' তাহলে 'আমার চোখে সেটাকে সাদা মনে হলেও তাকে তৎক্ষণাৎ কালো বলে মনে করতে হবে।' সংঘের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে ঊর্ধ্বতন সদস্যদের প্রতিটি নির্দেশকে বিনাপ্রশ্নে অন্ধের মতো মান্য করাই ছিল নিয়ম।

যিশুর সমিতির সদস্যদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি ছিল লয়োলার লেখা 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' নামক ছোট একটি বই। এ বইটিতে চার ভাগে বা চার সপ্তাহে চার রকম বিষয়ে ধ্যান করার নির্দেশ আছে। প্রথম সপ্তাহে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্ত জেসুইট সদস্যকে পাপের ভয়াবহ রূপ এবং পাপের ভয়ংকর শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হত। দ্বিতীয় সপ্তাহে যিশুখ্রিস্টের জীবনের শেষ রবিবার (Palm Sunday) পর্যন্ত খ্রিস্টের জীবন সম্পর্কে ধ্যান করতে বলা হত। তৃতীয় সপ্তাহে ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের যন্ত্রণা ও মৃত্যু বিষয়ে এবং চতুর্থ সপ্তাহে তাঁর কবর থেকে পুনরুত্থান ও স্বর্গে গমন বিষয়ে ধ্যান করতে হত। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে নবদীক্ষিত জেসুইটদের যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবে মনের চোখ দিয়ে দেখতে হত। যেমন, প্রথম সপ্তাহে তাঁদেরকে কল্পনায় নরকের (দোজখের) আগুনের কুণ্ডকে দেখতে হত, পাপীদের আর্তনাদ ও বিলাপ শুনতে হত, বিবেকের দংশন অনুভব করতে হত, নরকের আগুনের তাপে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করতে হত। এসকল প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল পাপের ভীতি এবং গির্জার প্রতি ভক্তিকে মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট করা। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' (Spiritual Exercise) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল; তার অল্পকাল পরেই পোপ সমস্ত খ্রিস্টানদের পড়ার জন্য বইটিকে অনুমোদন করেন। এর ফলে, ঐ সময় থেকে এ বইটি শুধু জেসুইটদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিষয়েই নয়, বরং সমগ্র ক্যাথলিক জগতের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

www.icsbook.info

যিশুর সমিতির অভ্যন্তরীণ সংগঠন খুবই কঠোর শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। সমিতির সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন একজন অধিনায়ক (জেনারেল)। তাঁর হাতে সমিতির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি সারাজীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং রোম নগরে বাস করতেন। এ অধিনায়ক বা জেনারেল যিশুর সমিতির সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের বরখাস্ত করতেও পারতেন। চার থেকে ছয়জন সহকারী নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ তাঁকে সবরকম কাজে সাহায্য করত। অন্য দেশের সমিতির প্রসার ঘটলে সেখানকার উচ্চপদস্থ জেসুইট কর্মকর্তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। সমস্ত জেসুইট সদস্যরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা : (১) শিক্ষানবিশ, (২) স্কলার বা শিক্ষার্থী, (৩) কো-এডজুটর বা কর্মী, (৪) প্রফেসর বা গুরু। সবচেয়ে নিচের শ্রেণীতে ছিল নবদীক্ষিত বা শিক্ষানবিশরা (novice)। দুবছর ধরে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এবং এরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হত। শিক্ষানবিশদের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে পদোন্নতি দেওয়ার আগে তাদের বাধ্যতা ও আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া হত এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হত যে তারা সংঘের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে যোগ্য কি না। সবরকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাদেরকে পূর্ববর্ণিত তিনটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হত এবং তাঁরা স্কলার নামে অভিহিত হতেন। এঁদেরকে দীর্ঘকাল ধরে জাগতিক বিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এ পর্যায়ে যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিতেন তাঁদেরকে পরবর্তী উচ্চতরশ্রেণী অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হত। এঁদের নাম দেওয়া হত কো-এডজুটর (Co-adjutor)। এঁরা লৌকিক (জাগতিক) ও যাজকীয়—এ দু ধরনের কাজ বেছে নিতে পারতেন। যাঁরা লৌকিক কাজ গ্রহণ করতেন তাঁরা সংঘের রাঁধুনী-বাবুর্চি, মালী বা হাসপাতালের কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। যাঁরা যাজকের কাজ নিতেন, তাঁরা সংঘের স্কুল-কলেজে তরুণ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন অথবা পাদ্রি ও মিশনারি হিসাবে ধর্ম প্রচার করতেন। এ পর্যায়ে অনেক বছর দক্ষতার সাথে কাজ করার পর যাঁরা উপযুক্ত বিবেচিত হতেন তাঁদেরকে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পদোন্নতি দেওয়া হত। এঁদের নাম ছিল 'প্রফেসি সান্ট' (Professi sunt)। এঁরা চতুর্থ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অনুমতি পেতেন— এটা হল পোপের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। এ সর্বোচ্চ শ্রেণীর সম্মানিত সদস্যের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম— সংঘের মোট সদস্যের প্রায় দুই-শতাংশ। ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর থেকেই সংঘের উচ্চপদের কর্মকর্তাদের বাছাই করা হত।

শুরুতে যিশুর সংঘ যে লুথার এবং ক্যালভিনের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের শিক্ষাকে প্রতিহত করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সংঘই ক্যাথলিক ধর্মসংস্কারের মূল স্তম্ভে পরিণত হয়। এ সংঘের নীতিবাক্য ছিল : 'সবকিছুই ঈশ্বরের মহান গৌরবের উদ্দেশে নিবেদিত'। এটাই ছিল যিশুর সমিতির লক্ষ্য। ঈশ্বরের মহান গৌরব বলতে জেসুইটরা একমাত্র রোমান চার্চের সর্বময় আধিপত্যকে বোঝাত। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, এ সংঘের সম্মিলিত শক্তি ক্যাথলিক চার্চের শক্তিবৃদ্ধি ও

www.icsbook.info

ক্যাথলিক মতের বিস্তারসাধনের কাজে নিয়োজিত ছিল। অখ্রিস্টানদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে চার্চের অধীনে নিয়ে আসা, চার্চের অধীনস্থ ক্যাথলিকদের মধ্যে চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং যাঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্যাথলিক ধর্মমতে ফিরিয়ে আনা —এই ছিল জেসুইট সংঘের মূল লক্ষ্য।

জেসুইটদের সাফল্য

জেসুইটরা চার্চের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মতের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথে মিলে সবরকমে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জেসুইটদের সাফল্যের প্রধান ভিত্তি ছিল— ধর্মপ্রচার, পাপ স্বীকার করানো (Confession) এবং শিক্ষার বিস্তার। শুরু থেকেই জেসুইটদের সংঘ প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্যাথলিক মতে ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মপ্রচারকে প্রধান পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। জেসুইট ধর্মপ্রচারকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত যেন তাঁরা সরল, সংক্ষিপ্ত ও জোরালোভাবে এবং সমকালীন অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করতে পারেন। জেসুইট গির্জার ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলা হত এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সংগীত পরিবেশন করা হত। পাপ স্বীকার করানোর অনুষ্ঠানকে তাঁরা একটা সাধারণ ধর্মীয় আচরণ থেকে পরিবর্তিত করে আত্মার পথনির্দেশক পদ্ধতিতে পরিণত করেন। জেসুইটরা ইউরোপের বিভিন্ন রাজাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে অথবা তোষামোদ করে তাঁদের মন জয় করেন এবং সম্রাটের ও অনেক রাজার দরবারে পাপ স্বীকার শ্রবণকারী যাজকের (Confessor) পদ অধিকার করেন। যেসব রাজ্যে জেসুইটরা তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন সেসব স্থানে তাঁরা রাষ্ট্রীয় নীতিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেন। এভাবে তাঁরা ভিয়েনা, ওয়ারস, লিসবন, মাদ্রিদ প্রভৃতি রাজদরবারে এবং ইতালি ও জার্মানির ছোট ছোট রাজদরবারে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। ফ্রান্সে চতুর্থ হেনরির আমল থেকে ষোলোতম লুই এর আমল পর্যন্ত জেসুইটরা ফ্রান্সের সিংহাসনের পিছনে বসে রাজাদের অনুসৃত রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছেন।

জেসুইটরা সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক কার্যকলাপ দিয়ে। শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে কিশোর ও তরুণদের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলা যায়, এ সত্য জেসুইটরা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শোনা যায় যে, তাঁরা বলতেন : 'ছেলেটাকে আমার হাতে দাও, বাবাটা কার হাতে পড়ল তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না।' লয়োলার জীবনকালেই জেসুইট সংঘ ৩৫টি স্কুল স্থাপন করেছিল। স্কুলের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সারা ইউরোপে স্কুল স্থাপিত হয়। জেসুইটরা কোনোরকম বেতন বা টাকাপয়সা না নিয়েই স্কুলে শিক্ষাদান করতেন। জেসুইটরা তাঁদের স্কুলে অন্যান্য স্কুলের মতো এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন কিন্তু তাঁরা উৎসাহের সাথে প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে যত্নের সাথে পড়াতেন, ব্যায়াম শেখাতেন, নীতিশিক্ষা দিতেন, ছাত্রদের সাথে

www.icsbook.info

ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। এর ফলে জেসুইট স্কুলগুলো অল্পসময়েই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করল। প্রচুর সংখ্যক তরুণ ছাত্র তাঁদের স্কুলে ভর্তি হল— বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পড়তে আসত তাঁদের স্কুলে। এ অভিজাতবংশীয় ছাত্ররা পরবর্তী জীবনের জেসুইট সংঘের সমর্থকে পরিণত হত। এমনকি অনেক প্রোটেস্ট্যান্টও তাঁদের ছেলেদের জেসুইট স্কুলে পড়তে পাঠাতেন। এ ছাত্ররা অবশ্য স্বভাবতই ক্যাথলিক মত গ্রহণ করত। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইতালি, পর্তুগাল ও পোল্যান্ডের সমস্ত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্পেন, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির ক্যাথলিক অংশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষালয়কে জেসুইটরা পরিচালিত করতেন। আঠারো শতকের শুরুতে জেসুইট সংঘের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৬৯—পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চল জুড়ে এসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এবং এগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ।

জেসুইটরা তাঁদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে অনেক পরিমাণে সমর্থ হয়েছিলেন। কোনো কোনো স্থানে জেসুইটরা প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের বিস্তৃতিকে প্রতিহত করে ঐসব অঞ্চলকে ক্যাথলিক মতবাদের প্রভাবের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন। অনেক স্থানে তাঁরা উদীয়মান প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে উৎখাত করেন। আবার কোনো কোনো স্থানে তাঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের স্থানে ক্যাথলিক ধর্মমতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেনে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার কাজে অবদান রাখেন। পোল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পোল্যান্ড ক্যালভিনপন্থীদের হস্তগত হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। জেসুইটরা পোল্যান্ডকে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্মের আওতায় নিয়ে আসেন। জেসুইটরা দক্ষিণ (অর্থাৎ স্পেনীয়) নেদারল্যান্ডস থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে উৎখাত করেন। হাঙ্গেরিকেও তাঁরা ক্যাথলিক চার্চের আওতায় ফিরিয়ে আনেন। ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক ধর্মমত উভয়েই প্রাধান্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করছিল; জেসুইটদের উদ্যোগের ফলে ফ্রান্সে ক্যাথলিক মত জয়লাভ করে। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ধর্মকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে জেসুইটদের অবদান ছিল। এমনকি ইংল্যান্ডের জেসুইটরা আইনকে ফাঁকি দিয়ে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেককে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করে। সতেরো শতকে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস এবং পরে দ্বিতীয় জেমস জেসুইটদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জেসুইটদের একটা বড় কৃতিত্ব হল দক্ষিণ জার্মানিতে ধর্মচিন্তার গতি ক্যাথলিক ধর্মের দিকে চালিত করা। দক্ষিণ জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এবং অনেকগুলো শহরে প্রোটেস্ট্যান্টরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জেসুইটরা আপ্রাণ চেষ্টা করে দক্ষিণ জার্মানিকে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবের মধ্যে নিয়ে আসেন। ষোলো শতকের মধ্যভাগের অল্পকাল পরেই যিশুর সংঘ ভিয়েনা এবং ইংগলস্টাডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং তারপর থেকে এ দুটো স্থান জেসুইটদের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর দশ বছরের মধ্যে

www.icsbook.info

ব্যাভারিয়া ও ফ্রাঙ্কোনিয়ার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং রেনিশ প্রদেশসমূহ এবং অস্ট্রিয়ার এক বড় অঞ্চলে জেসুইটদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের অধীনস্থ স্থানগুলো থেকে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। কিন্তু জেসুইটদের প্রচেষ্টার ফলে এসব স্থানে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত এসব স্থান থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। জেসুইটদের ধর্মপ্রচারের কাজ শুধুমাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার উপজাতীয়দের মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ের আদিবাসীদের মধ্যেও খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন।

জেসুইট সংঘের অবসান

আঠারো শতকে জেসুইটদের সংঘ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ সংঘ তাদের আগেকার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে মনোনিবেশ করে। সংঘের স্কুলগুলো অধঃপতিত হয়। সংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ক্ষমতার গর্বে স্ফীত হয়ে দাম্ভিক আচরণ করতে শুরু করেন এবং নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও পিছপা হন না। এমনকি তাঁরা বিভিন্ন রাজাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করেন এবং সফলভাবে হত্যাকাণ্ড সমাধা করেন। রাজা এবং শাসকদের কাছে জেসুইটরা এমন ভয়ানক বিপদ হিসেবে দেখা দেয় যে ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল থেকে, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্পেন থেকে জেসুইট সংঘকে বহিষ্কার করা হয়। একমাত্র স্পেন থেকেই প্রায় ছয় হাজার জেসুইট পাদ্রিকে বিতাড়িত করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ যিশুর সমিতি বা জেসুইট সংঘকে ভেঙে দেন এবং ঘোষণা করেন যে চার্চের শান্তি রক্ষার জন্য এ কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তবে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট এবং প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট তাঁদের দেশে জেসুইটদের বিলোপ সংক্রান্ত পোপের ঘোষণাপত্রকে প্রকাশ করতে অসম্মত হন, কারণ শিক্ষক হিসাবে জেসুইটদের স্থান গ্রহণ করার মতো শিক্ষিত লোক এ দুই দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। এ কারণে একদা মহাশক্তিশালী জেসুইট সংঘের অবশিষ্ট সদস্যরা এ সময়ে এ দুই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেসুইটদের বিলোপ সংক্রান্ত নির্দেশ অবশ্য স্থায়ী হয়নি। ১৮১৪ সালে পোপ সপ্তম পিয়াস (Pope Pius VII) পুনরায় যিশুর সমিতিকে পুরুজ্জীবিত করেন।

যিশুর সমিতি ক্যাথলিক চার্চের শক্তিবৃদ্ধিতে এবং ধর্ম-প্রতিসংস্কার আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

www.icsbook.info

সপ্তম অধ্যায়
স্পেনের ইতিহাস

ষোলো শতকের ইউরোপের ইতিহাস প্রধানত হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের সুবিস্তৃত রাজ্য এবং সাম্রাজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশ বিবাহসূত্রে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল। ষোলো শতকে সম্রাট পঞ্চম চার্লস এ বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং একই সাথে তিনি স্পেনের সম্রাটও হয়েছিলেন।

পঞ্চম চার্লস

পঞ্চম চার্লস ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে নেদারল্যান্ডস রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ রাজ্যটি তখন বিবাহসূত্রে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চম চার্লস মায়ের সূত্রে স্পেন, নেপল্‌স্‌ ও সিসিলির রাজা হন এবং আফ্রিকা ও আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলোর শাসক হন। পিতার মাধ্যমে তিনি হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের অধীনস্থ জার্মানির এবং বার্গান্ডির রাজ্যসমূহের (নেদারল্যান্ডসসহ) রাজা হন। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপ দি ফেয়ার মারা গেলে ছয়বছর বয়স্ক চার্লস বার্গান্ডির রাজবংশের অধীনস্থ রাজ্যগুলোর রাজা হয়েছিলেন। বার্গান্ডির রাজবংশের অধিকৃত রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফ্ল্যান্ডার্স ও আর্টয়, ফ্রাঙ্কে কঁতে (বার্গান্ডির প্রদেশ), লুক্সেমবুর্গ এবং নেদারল্যান্ডস্‌-এর প্রদেশসমূহ। চার্লস-এর প্রপিতামহ ১ম ম্যাক্সিমিলিয়ান বার্গান্ডির মেরিকে বিবাহ করেছিলেন বলে বার্গান্ডির রাজবংশের রাজ্যসমূহ শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের অধীনস্থ হয়েছিল।

চার্লস-এর শৈশব

চার্লস লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি। দক্ষ শিক্ষকরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দেননি। যখন তিনি স্পেনের রাজা হন তখন স্পেনীয় ভাষাও জানতেন না। অবশ্য পরে তিনি এ ভাষাটি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু চার্লস তিরিশ বছর জার্মানিতে রাজত্ব করা সত্ত্বেও কখনও জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেননি। তিনি 'পবিত্র রোমান সম্রাটে'র পদ অধিকার করেছিলেন কিন্তু ল্যাটিন ভাষা প্রায় জানতেনই না। ছোটকালে তিনি ফরাসি ভাষা

www.icsbook.info

শিখেছিলেন এবং এ ভাষাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারতেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও মার্জিত ফরাসি ভাষা তিনি কখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহ না থাকলেও ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার খেলা, কুস্তি করা এবং বন্দুক চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন চার্লস।

স্পেনের সিংহাসনে পঞ্চম চার্লস

চার্লস-এর বয়স যখন ষোলো বছর, তখন তিনি স্পেনের রাজা হলেন (১৫১৬)। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ মারা যাওয়ার পরে তাঁর মেয়ে জুয়ানা'র রানী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জুয়ানা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় তাঁর বড়ছেলে চার্লস স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। একই সাথে চার্লস নেপল্স্, সিসিলি, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলোর শাসক হন।

স্পেনীয়রা চার্লসকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। চার্লসকে তারা বিদেশী হিসাবে গণ্য করত। তিনি যে স্পেনীয় ভাষা জানতেন না এটাও স্পেনীয়রা ভালো চোখে দেখত না। চার্লস ১৫১৬ সালে রাজা হলেও তিনি পরের বছরের শেষভাগে নেদারল্যান্ডস থেকে স্পেনে গমন করেন। স্পেনে যাওয়ার সময়ে তিনি সাথে করে বহুসংখ্যক সহচর নিয়ে যান যাঁদের তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করেন। স্পেনীয়রা এতে বিক্ষুব্ধ হয় এবং ক্যাস্টিল ও আরাগনের প্রতিনিধি পরিষদ (কর্টেজ) চার্লসকে শর্তসাপেক্ষে রাজা হিসাবে মেনে নেয়। স্পেনীয়রা দাবি করে যে চার্লসকে তাদের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।[১]

চার্লস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

এ পরিস্থিতিতে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান মারা গেলে স্পেনের পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। চার্লস এখন হ্যাপ্স্বুর্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী এবং 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে'র সিংহাসনের দাবিদারে পরিণত হন। স্পেনীয়রা এতে অখুশি হয়, কারণ স্পেনের রাজা স্পেনে না থেকে সম্রাট হয়ে জার্মানিতে চলে যাবেন এটা তারা পছন্দ করেনি। কিন্তু চার্লস স্পেনীয়দের মতামতকে তুচ্ছ করে সম্রাট হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত নির্বাচকদের প্রভাবিত করার জন্য তাঁদের নিকট বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন এবং নিজেও জার্মানি যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। চার্লস তাঁর বিদেশী (ফ্লেমিশ) শিক্ষককে স্পেনে তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেখে যান। এতে স্পেনীয়রা বিক্ষুব্ধ হয় এবং বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা 'সান্টা জুন্টা' (Santa Junta) নামক সংস্থা গঠন করে। প্রথমে বিদ্রোহ ঘটেছিল রাজার বিরুদ্ধে। তখন অভিজাতশ্রেণী বিদ্রোহীদের সমর্থনও করেছিলেন। কারণ স্পেনীয় প্রজাদের এবং অভিজাতদের দাবি ছিল উচ্চ রাজপদে বিদেশী অর্থাৎ অস্পেনীয়দের নিয়োগ করা চলবে না। কিন্তু যখন বিদ্রোহীরা অভিজাতশ্রেণীর অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে তখন অভিজাতরা একজোট হয়ে বিদ্রোহ দমন করে। এভাবে চার্লস-এর হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিদ্রোহ দমিত হয়।

www.icsbook.info

চার্লস জার্মানি থাকাকালে রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে ফিরে এসে তিনি প্রজাদের সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন। স্পেনীয়দের একটা দাবি ছিল এই যে উচ্চ রাজপদে বিদেশীদের অর্থাৎ ফ্লেমিশ বা অন্যান্যদের নিয়োগ করা চলবে না। চার্লস সে অনুসারে কয়েকটি পদ ছাড়া সমস্ত উচ্চ রাজপদে স্থানীয়দের অর্থাৎ স্পেনীয়দের নিয়োগ করেন। এমনকি প্রজাদের ইচ্ছা অনুসারে তিনি পর্তুগালের রাজার ভগ্নী ইসাবেলাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ও ইসাবেলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। চার্লস ও ইসাবেলার ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ পরে স্পেনের সম্রাট হয়েছিলেন এবং মায়ের সূত্রে পর্তুগালের সিংহাসনও অধিকার করেছিলেন। ইসাবেলা ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

চার্লস-এর নীতি

পঞ্চম চার্লস-এর লক্ষ্য ছিল স্পেনের বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি সবগুলো রাজ্যকে একটা রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেননি, তবে তিনি ঐ রাজ্যগুলোর বিভেদ কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য ক্যাস্টিল এবং আরাগনের সিংহাসন আগেই সংযুক্ত হয়েছিল এবং চার্লস ছিলেন এ দুই রাজ্যেরই রাজা। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, চার্লস স্পেনকে ইউরোপের প্রধান শক্তিতে পরিণত করতে চান। এ নীতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে চার্লস অনেকগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ সকল যুদ্ধ চালাতে গিয়ে স্পেনের রাজকোষের অর্থ নিঃশেষিত হয়। এমনকি আমেরিকা মহাদেশের মেক্সিকো এবং পেরু থেকে যে বিপুল পরিমাণ সোনা স্পেনের রাজকোষে জমা হত, তাতেও যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান হত না। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য চার্লস অনেকবার ফরমান জারি করে প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করেন। তাঁর আমলে বারবার কর বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং শেষপর্যন্ত প্রজারা তিনগুণ কর দিতে বাধ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর পরিমাণ ঘাটতি ও ঋণের বোঝা দেশের উপর চাপিয়ে যান। যুদ্ধের ফলে অগণিত লোকক্ষয়ও ঘটে। হাজার হাজার স্পেনীয় সৈন্য ইতালি, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। অজস্র সৈন্য আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশসমূহের উদ্দেশে ও দেশত্যাগ করে।

পঞ্চম চার্লস-এর জার্মানি গমন

১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ১ম ম্যাক্সিমিলিয়ান মারা গেলে পবিত্র রোমান সম্রাটের পদ শূন্য হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ছিল নামেমাত্র সাম্রাজ্য, এর অধীনে কোনো ভূখণ্ড ছিল না বা এ সম্রাটের কোনো ক্ষমতাও ছিল না। তবুও সম্রাট (পবিত্র রোমান সম্রাট) উপাধিটা ইউরোপে সবচেয়ে সম্মানজনক উপাধি বলে গণ্য হত। সাতজন জার্মান রাজা পবিত্র রোমান সম্রাটের নির্বাচক বলে স্বীকৃত ছিলেন। তবে ষোলো শতকে প্রথাগতভাবে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের শাসকরাই পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে নির্বাচিত হতেন।

www.icsbook.info

পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ম্যাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর পবিত্র রোমান সম্রাটের শূন্যপদের জন্য দুজন মূল প্রতিদ্বন্দ্বীর উদয় ঘটে। একজন ছিলেন ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, অপরজন ছিলেন স্পেনের রাজা চার্লস। দুজনই নির্বাচকদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন। চার্লস ছিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ানের নাতি এবং সে সূত্রে হ্যাপ্স্বুর্গ রাজবংশের সন্তান। চার্লস শেষপর্যন্ত পোপের সমর্থন লাভ করে সর্বসম্মত ভোটে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে নির্বাচিত হন। এখন থেকে তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লস নামে পরিচিত হন, কারণ তিনি ছিলেন চার্লস নামধারী পঞ্চম সম্রাট। সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার একবছর পর তিনি জার্মানিতে গমন করেন। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্পেনে ফিরে আসার আগে চার্লস জার্মানির ওয়ার্মস (Worms) নামক স্থানে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ডায়েট বা পার্লামেন্টের এক সভা আহ্বান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য সৈন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করা। চার্লস যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে কম অর্থ ও সৈন্য তিনি পান। ডায়েট তাঁকে ২৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করার অনুমোদন দান করে। ওয়ার্মস-এর সম্মেলনের পরে চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

ফরাসিদের বিরুদ্ধে পঞ্চম চার্লস-এর লড়াই

পঞ্চম চার্লস সম্রাট হওয়ার ফলে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস-এর সাথে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। ফ্রান্স এখন বিপন্ন বোধ করতে লাগল, কারণ হ্যাপ্স্বুর্গ রাজবংশের রাজ্য অস্ট্রিয়া থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হল এবং ফ্রান্সকে সব দিক থেকে ঘিরে রাখল। তা ছাড়া চার্লস ও ফ্রান্সিস প্রত্যেকেই অন্যের অধিকৃত ভূখণ্ডের উপর দাবি জানাতে শুরু করেন। ফ্রান্সিস দাবি করলেন যে ডাচি অফ বার্গান্ডি ভূখণ্ডকে স্পেনের কাছে ফেরত দিতে হবে, কারণ একাদশ লুই এটা স্পেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া ফ্রান্সিস সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইতালির মিলান ভূখণ্ডকে দখল করেছিল; চার্লস সেটাকে সাম্রাজ্যের জায়গির হিসেবে ফেরত চাইলেন। স্পেন ও ফ্রান্সের রাজবংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। আবার অস্ট্রিয়ার রাজবংশ এবং ফ্রান্সের রাজবংশের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এসকল বিবাদও চার্লস এবং ফ্রান্সিসের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হিসাবে কাজ করেছিল।

ফ্রান্সই প্রথম যুদ্ধ শুরু করে। স্পেনে সান্টা জুন্টার বিদ্রোহ চলছিল। আর জার্মানিতে লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের আন্দোলন সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। স্পেনে ও জার্মানিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকায় পঞ্চম চার্লস তখন বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফ্রান্স ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের অধীনস্থ ন্যাভারে ভূখণ্ডকে আক্রমণ করল। এ আক্রমণকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে পঞ্চম চার্লস পোপ এবং ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির সাথে একটা জোট গঠন করতে সক্ষম হলেন। এরপর স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে

www.icsbook.info

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হল। এ অর্থহীন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মাঝে মাঝে বিরতিসহ প্রায় চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রথমে ফরাসি বাহিনী ন্যাভারে দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপর সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর বাহিনী ফরাসিদের বিতাড়িত করে। এ সময়ে ফরাসী সেনাপতি ডিউক অফ বুরবঁ (এঁর নাম ছিল চার্লস) ফরাসি রাজার পক্ষ ত্যাগ করে পবিত্র রোমান সম্রাট তথা পঞ্চম চার্লস-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এর ফলে ফরাসিদের যথেষ্ট শক্তিহানি ঘটেছিল। শেষপর্যন্ত ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত ক্যাটু ক্যামব্রেসিস-এর চুক্তি অনুসারে ন্যাভারে-এর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল।

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার যুদ্ধ

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতালিতে। প্রথমে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও পোপের সম্মিলিত বাহিনী মিলান থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পাভিয়ার যুদ্ধের পরে ফরাসিদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। ফ্রান্সিস যখন সসৈন্যে আল্পস্ অতিক্রম করে মিলান অবরোধ করেন, তখনই জার্মানি থেকে নতুন সৈন্যদলসহ ডিউক অফ বুরবঁ এসে ফরাসিদের উৎখাত করেন। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসকে বন্দি করে স্পেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি অনেক মাস বন্দি থাকেন। তারপর 'মাদ্রিদ চুক্তি'-তে (১৫২৬) স্বাক্ষর করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মাদ্রিদ চুক্তির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সিস ইতালির প্রদেশসমূহের উপর থেকে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করেন এবং ফ্ল্যান্ডার্স, আর্টয় ও টুর্নে-র উপর থেকে কর্তৃত্বের দাবি প্রত্যাহার করেন। ডিউক অফ বুরবঁ-র যেসব ভূসম্পত্তি দখল করা হয়েছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার এবং ফরাসি পার্লামেন্টের মাধ্যমে ডাচি অফ বার্গান্ডিকে পঞ্চম চার্লস এর নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ফ্রান্সিস প্রদান করেন। ফরাসি রাজা প্রথম ফ্রান্সিস বাইবেলের নামে শপথ করে চুক্তি পালনের প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন কিন্তু মুক্তিলাভ করেই তিনি বললেন যে তাঁর থেকে জোর করে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছিল এবং মাদ্রিদ চুক্তি মানতে তিনি বাধ্য নন।

ইতালিতে চার্লস এর সৈন্যদের তাণ্ডব

এদিকে সম্রাট পঞ্চম চার্লস শক্তিশালী হয়ে ওঠায় প্রতিবেশী রাজ্য ভীত হয়ে ওঠে। পোপ, মিলানের ডিউক এবং ভেনিস ও ফ্লোরেন্স শহর একত্রিত হয়ে জোট গঠন করেন। ইংল্যান্ড এ জোটের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানায়। কিন্তু এ জোটটি তেমন সক্রিয় ছিল না। অন্যদিকে ফ্রান্সিসও বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় চার্লস-এর স্পেনীয় ও জার্মান সৈন্য ডিউক অফ বুরবঁর নেতৃত্বে উত্তর ইতালির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়। এ সৈন্যদল বেতন না পাওয়ার ফলে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং লুটতরাজ শুরু করে। ফ্লোরেন্সের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্ভেদ্য ছিল বলে চার্লস এর সৈন্যরা রোমনগরী আক্রমণ করে। সৈন্যরা লুণ্ঠনকার্য শুরু করলে স্থানীয় ইতালীয়রাও এসে তাতে অংশগ্রহণ করে। আটদিন ধরে রোমনগরী লুণ্ঠিত হয়।

www.icsbook.info

হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক মারা যায়। পোপকে সেন্ট এঞ্জেলো দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। সম্রাট পঞ্চম চার্লস রোমে তাঁর সৈন্যরা যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছে তার জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু পোপকে মুক্ত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

রোম দখলের সংবাদ পেয়ে ফরাসি রাজা ফ্রান্সিস আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং ইতালিতে একদল সৈন্য পাঠান। ফরাসি সৈন্যদল অল্পকালের মধ্যেই মিলান ছাড়া পুরো লোম্বার্ডি অধিকার করে। এদিকে পোপ অষ্টম ক্লেমেন্টকে বন্দি করে রাখায় স্পেন ও ইংল্যান্ডের লোকের মনে চার্লস এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। এখন ফরাসিরা জয়লাভ করায় চার্লস পোপকে মুক্ত করে দিলেন, তবে শর্ত থাকল যে এরপর থেকে পোপ নিরপেক্ষ থাকবেন। এরপর পঞ্চম চার্লস ফরাসি সৈন্যদলকে পরাজিত করলেন। জার্মানির লুথারপন্থীদের কার্যকলাপ এবং তুরস্কের আক্রমণের আশঙ্কা তখন চার্লসকে বিব্রত করেছিল। তাই পঞ্চম চার্লস ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে কামব্রাইয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে বিরোধের অবসান ঘটালেন। এ চুক্তির শর্তগুলো মাদ্রিদের চুক্তির তুলনায় সহজ ছিল।

কিন্তু এ শান্তি স্থায়ী হয়নি। ফ্রান্সিস নিজেই নতুন করে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি ডেনমার্ক, সুইডেন ও জার্মানির ছোট-বড় রাজাদের সাথে জোট গঠন করলেন। ফ্রান্সিস তুরস্কের সুলতানের সাথেও মৈত্রী স্থাপন করলেন। তুর্কীদের সাথে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের জোট গঠন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ভালো চোখে দেখল না। এর ফলে জার্মানির রাজারাও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। কিন্তু রাজা ফ্রান্সিস তাঁর যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়ে গেলেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মিলানের ডিউক মারা গেলে ফ্রান্সিস তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নামে মিলান দখলের জন্য সৈন্য পাঠালেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার পর ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রেসপির চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ফ্রান্সিস মারা যাওয়ায় ঐ মুহূর্তে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হতে পারেনি।

তুরস্কের সাথে বিরোধ

চার্লস এর সাম্রাজ্য এসময় তুরস্কের দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হয়। অটোমান তুর্কীরা মধ্যএশিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ক্রমে শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তুর্কীরা এশিয়া মাইনর দখল করতে সক্ষম হয়। চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে তুর্কীরা বসফোরাস প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপ ভূখণ্ডে পদার্পণ করে। এ অঞ্চলে আগে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আধিপত্য ছিল। তুর্কীরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডকে গ্রাস করে এবং শেষপর্যন্ত ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকেও তুর্কীরা জয় করে নেয়। অটোমান তুর্কীরা এরপর বল্কান অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগী হয়।

তুর্কী সুলতান সুলায়মান (রাজত্বকাল ১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড দখল করেন। এর ফলে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্য বিপদের সম্মুখীন হয়। পরের বছর সুলায়মান ভূমধ্যসাগরে রোড্‌স্ দ্বীপ অধিকার করেন। এর ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে

www.icsbook.info

মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ববর্তী দুশো বছর ইউরোপীয়রা রোড্‌স্ দ্বীপকে ঘাঁটি বানিয়ে তুর্কী মুসলমানদের বাণিজ্যকে ব্যাহত করেছিল।

সুলায়মান এরপর হাঙ্গেরির এক বড় অংশ দখল করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে। হাঙ্গেরির রাজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকালে পানিতে ডুবে মারা যান। তখন তাঁর শ্যালক অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফার্দিনান্দ হাঙ্গেরী আক্রমণ করে বুদাপেস্ত দখল করেন ও তুর্কী রাজপ্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। সুলায়মান তখন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাঙ্গেরি পুনর্দখল করেন। এরপর ফার্দিনান্দকে আঘাত করার জন্য অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেন ও ভিয়েনা অবরোধ করেন (১৫২৯ খ্রি.)। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে সুলায়মান অবরোধ তুলে ফিরে যেতে বাধ্য হন কিন্তু পরের বছর আবার বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। এবার সম্রাট পঞ্চম চার্লস নিজেই এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুর্কীদের প্রতিরোধ করেন। সুলায়মান যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন (১৫৩৩ খ্রি.)। চুক্তির শর্ত অনুসারে হাঙ্গেরিকে ফার্দিনান্দ ও তুর্কী সুলতানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ফার্দিনান্দ এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পুরো হাঙ্গেরি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান পুনরায় হাঙ্গেরি আক্রমণ করেন এবং হাঙ্গেরির অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে নেন। এরপর ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঁচ বছরের জন্য সন্ধি স্থাপন করেন।

এ সময়ে সুলায়মানের এক সামন্তরাজা খায়েরুদ্দীন বারবারোসা আফ্রিকার উপকূলের আলজিয়ার্স ও টিউনিস অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে ইউরোপীয়দের ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করেন। খায়েরুদ্দীন এক নৌবাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ইউরোপীয় দেশগুলোকে আক্রমণ করেন এবং বহু মানুষকে হত্যা করেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস খ্রিস্টানদের রক্ষা করার জন্য ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনশতাধিক জাহাজের এক বিশাল নৌবাহিনী ও তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে টিউনিস আক্রমণ করেন এবং খায়েরুদ্দীনের সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করেন। টিউনিস অধিকার করে তিনি ২২ হাজার খ্রিস্টান বন্দিকে মুক্ত করেছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তা হিসাবে সম্মানলাভ করেন। পরের বছর তিনি আলজিয়ার্স আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু ফ্রান্সের সাথে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলজিয়ার্স আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঝড়ের আক্রমণে তাঁর জাহাজ ও সৈন্যদলের ক্ষতি হওয়ায় তিনি ফিরে আসেন।

পঞ্চম চার্লস এর অবসরগ্রহণ

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের পরে চার্লস কিছুকালের জন্য সর্বাধিক শক্তির অধিকারী হন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দের পর ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের সাথে তাঁর শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস এবং ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি উভয়েই মারা যান। এর ফলে খ্রিস্টান ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা

www.icsbook.info

দেয়। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সুলতান পাঁচ বছরের জন্য সন্ধিস্থাপন করায় চার্লস স্বস্তি লাভ করেন। জার্মানির বিদ্রোহী রাজা এবং ধর্মীয় প্রতিপক্ষদেরও শান্ত করা সম্ভব হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত মুহ্‌লবার্গ এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট রাজারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানিতে চার্লস আর শান্তিলাভ করেননি।

চার্লস ভেবেছিলেন, ট্রেন্টএ অনুষ্ঠেয় সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ধর্মীয় বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে চার্লস যে অন্তর্বর্তীকালীন ফরমান জারি করেন তা ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়কেই অখুশি করে। আবার জার্মানির সব রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রস্তাব সম্রাট পঞ্চম চার্লস উত্থাপন করেছিলেন তা জার্মান ডায়েট অনুমোদন করতে সম্মত হয়নি। একে তো ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা একসাথে বসতে রাজি ছিল না, তা ছাড়া দুই দলই সম্রাটের শক্তিবৃদ্ধিকে আশঙ্কার চোখে দেখত। এসময়ে স্যাক্সনির মরিস পঞ্চম চার্লস এর পক্ষ ত্যাগ করার ফলে জার্মানিতে চার্লস এর রাজনৈতিক শক্তি লোপ পায়। মরিস যখন বুঝতে পারলেন যে সম্রাটের সাথে থাকলেও তাঁর ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে জার্মানি থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করলেন। ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে মরিস মারা যান কিন্তু তাতে চার্লস এর পক্ষে অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটল না। ফ্রান্সের নতুন রাজা দ্বিতীয় হেনরি চার্লস এর বিরোধিতায় লিপ্ত হন। দ্বিতীয় হেনরিই জার্মানিতে চার্লস-এর যেসব বিরোধীশক্তি ছিল তাদের অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। ইতালিতে হেনরি পঞ্চম চার্লস এর জামাতা অটাভিয়া ফ্রানিজকে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেন। তুর্কী সুলতানের নৌসেনারা আবার ইউরোপের দক্ষিণ উপকূল আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে এবং বহু লোককে বন্দি করে নিয়ে যায়।

শেষ জীবনে চার্লস স্বাস্থ্য ও মনোবল হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। সব রকম দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় তিনি ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছেলে ফিলিপ-এর হাতে নেদারল্যান্ডস এর শাসনভার অর্পণ করেন। পরের বছর, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে, তিনি স্পেনের রাজপদ এবং তাঁর অধীনস্থ ইতালির অঞ্চলসমূহের শাসনভার ফিলিপের হাতে অর্পণ করেন। পবিত্র রোমান সম্রাটের পদটি লাভ করেন পঞ্চম চার্লস এর ভাই ফার্দিনান্দ। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ফার্দিনান্দকে সম্রাটের পদের জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেছিলেন। শেষজীবনে চার্লস উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পুত্র ফিলিপই ঐ পদের বৈধ উত্তরাধিকারী। কিন্তু তখন ফার্দিনান্দ এ প্রস্তাবে সম্মত হতেন না। তাই ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে চার্লস পবিত্র রোমান সম্রাটের পদটি তাঁর ভাই ফার্দিনান্দের নিকট হস্তান্তরিত করেন। দুই বছর বিরলে অবসর জীবন যাপন করার পর ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় ফিলিপ

ষোড়শ শতকের প্রথম অর্ধেককে যদি 'পঞ্চম চার্লস-এর যুগ' বলা যায়, তাহলে ঐ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেককে বলা যায় 'দ্বিতীয় ফিলিপ-এর যুগ'।

দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর পিতা পঞ্চম চার্লস এর সবটুকু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেননি। তাঁর পিতৃব্য ফার্দিনান্দ অস্ট্রিয়ার আর্চডাচি ও তার অধীনস্থ রাজ্যগুলোর অধীশ্বর হন। উপরন্তু তিনি বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরির (তুর্কী অধিকৃত অংশ ব্যতীত) অংশবিশেষ প্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও পবিত্র রোমান সম্রাট-এর উপাধিও তিনি লাভ করেন। স্বভাবতই ফিলিপের ভাগে পড়েছিল তাঁর পিতার সাম্রাজ্যের খণ্ডাংশ মাত্র, কিন্তু খণ্ডাংশ নিয়েই তিনি গৌরবের শিখরে আরোহণ করেছিলেন। এই অংশে ছিল স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রাঙ্কে কঁতে, ইতালির নেপল্স্, সিসিলি, মিলান, আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ এবং ফিলিপাইন। উপরন্তু ফিলিপ তাঁর স্পেনীয় সাম্রাজ্য এবং তাঁর পিতৃব্যের অস্ট্রীয়-সাম্রাজ্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। ফার্দিনান্দ এর পুত্র ফিলিপের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। একইভাবে ফিলিপের পুত্রের সাথে ফার্দিনান্দ এর পৌত্রীর বিবাহ হয়।

দ্বিতীয় ফিলিপের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরলে তাঁর চরিত্রের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

প্রথমত দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনকে প্রকৃত অর্থে তাঁর স্বদেশ হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সারাজীবন সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসেবে স্পেনের গৌরবকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

দ্বিতীয়ত ফিলিপ সম্পূর্ণভাবে ক্যাথলিক ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সমগ্র খ্রিস্টান ধর্মমতকে যে-কোনো মূল্যে উঁচুতে তুলে ধরার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। যদি কখনো স্পেনের অগ্রাধিকার ও ক্যাথলিক গির্জার স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত, তিনি এক কথায় দেশের স্বার্থকে গির্জার স্বার্থে বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন।

ফিলিপ শুধু যে নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, তাঁর ছিল কাজের প্রতি একাগ্রতা ও অপরিসীম কার্যক্ষমতা। যুদ্ধের চেয়ে তিনি কূটনীতিকে অধিক প্রাধান্য দিতেন, যদিও তিনি ন্যায়ের স্বার্থে (তাঁর মতে) যুদ্ধ করতে কখনো পিছপা হতেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তরবারির চেয়ে কলমকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন এবং তাঁর রাজদরবারের কোনো আমলাই তাঁর মতো কলম চালনায় দক্ষ ছিলেন না। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ের খুঁটিনাটি কাগজপত্রের উপর ঝুঁকে থাকতেন। তাঁর এই সাবধানতার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হতেন প্রকাশ্যে, জনগণের নিকট। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং একান্তভাবে তাঁর পরিজন ও ভৃত্যদের প্রতি অনুরক্ত। আনুগত্য ছিল ফিলিপের সবচেয়ে বড় গুণ।

উপরোক্ত গুণাবলী সত্ত্বেও ফিলিপের চরিত্রের বিপরীত দিক হল, তিনি ছিলেন ভীষণভাবে সন্দেহপরায়ণ। প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি এত নিমগ্ন থাকতেন যে

www.icsbook.info

রাজ্যশাসন বিষয়ের বড় বড় সমস্যা তাঁর নজর এড়িয়ে যেত। রাজ্যের এবং গির্জার বিরুদ্ধমতবাদীদের বিষয়ে তাঁর এত প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল যে চরম সহিষ্ণুতার যুগেও তিনি প্রবল অসহিষ্ণু হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

স্পেনকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করার এবং বিভিন্ন খ্রিস্টান ধর্মমতকে একই মতের (ক্যাথলিক) পতাকাতলে স্থাপিত করার উদ্যোগ নিয়ে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এ ব্যর্থতার কারণ হল যে তিনি একই সাথে বিভিন্ন ধরনের জটিল ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি যদি একসময়ে একটি কাজ নিয়ে লিপ্ত হতেন, তাহলে হয়তো তিনি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারতেন। তা না করে একাধিক বিশাল বিশাল পরিকল্পনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এগুলো হল, নিজের বিশাল সাম্রাজ্য থাকা সত্ত্বেও পর্তুগাল রাজ্যটিকে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা; একটি বিশাল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের কাজে হাত দেওয়া ; নেদারল্যান্ডস বিদ্রোহের পটভূমি তৈরি ও দমন করা ; ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা এবং খ্রিস্টান ইউরোপকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এর প্রতিটি প্রচেষ্টাই দেশের বিপুল অর্থনৈতিক ঘাটতি সৃষ্টি করে এবং শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ তৈরি করে দেয়। দ্বিতীয় ফিলিপ এমন একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন যার ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য। তিনি জাতীয় ঐকমত্যে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্তত স্পেনের জন্য হলেও। এর অর্থ হল, রাজার জন্য অধিক ক্ষমতা। রাজনৈতিকভাবে ফিলিপ কখনও তাঁর সভাসদদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলাপ করতেন না। করটেস এর অধিবেশন ডাকা হত শুধু নতুন কর আরোপের জন্য, যদিও তিনি মনে করতেন যে পুরোনো করগুলো চিরকালের জন্যই আরোপিত হয়েছে এবং রাজার নিয়মিত রাজস্বরূপেই এগুলো গণ্য হবে।

পারিষদদের তিনি রাজদরবারের অলংকাররূপেই গণ্য করতেন। পিতা পঞ্চম চার্লস এর অনুসৃত পন্থার বিপরীতে তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে রাজ্যশাসনের সবকিছুই পরিচালিত হবে রাজার নির্দেশে, তাঁর আমলাদের মাধ্যমে। এর ফল হয়েছিল আমলতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ও সর্বপ্রকার স্থানীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং একটি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বের একটি বড় ঘটনা হল আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশ বিস্তার ও সংহতিকরণ। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার স্পেনীয় অভিবাসী আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে এবং প্রায় দুইশত শহর ও নগর গড়ে তোলে।

স্পেনের উপনিবেশের স্বরূপ

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসিত হত রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) ও গভর্নরদের দ্বারা। এঁরা প্রত্যক্ষভাবে স্পেনের সেভিল নগরীতে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণভাবে রাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। একইভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গির্জা ছিল সরাসরি রাজার অধীনে। এ গির্জা রাজার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হাতিয়াররূপে

www.icsbook.info

ব্যবহৃত হত। ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্য চারটি আর্কবিশপ-এর এলাকা, ২৪টি বিশপ-এর এলাকা, প্রায় ৩৬০টি মঠ, কনভেন্ট, ধর্মীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য ফিলিপ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলোর সমৃদ্ধ রুপার খনিগুলো থেকে প্রতিকণা সম্ভব রুপা উত্তোলন করেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে পেরুর 'পতোসি' খনি এবং পর বছর মেক্সিকোর 'জাকাতেকাস' খনির খনন থেকে প্রমাণিত হয় যে ইন্ডিয়ানদের সাম্রাজ্য লুট করে পাওয়া রুপার পরিমাণ এ খনি থেকে উত্তোলিত রুপার পরিমাণের তুলনায় অতি সামান্য। অন্যান্য খনিগুলোও খনন করা হল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এর ফলে আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপার আমদানি হতে লাগল স্পেনে। ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে এটা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়।

চার্লস তাঁর অধীনস্থ ওলন্দাজ ও জার্মান ব্যাংকারদের স্পেনীয় উপনিবেশ তৈরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের সময়ে এটা সম্পূর্ণরূপে স্পেনীয়, বিশেষ করে ক্যাস্টিলের অধিবাসীদের জন্য সীমিত করে দেওয়া হল। সকল বাণিজ্যপণ্য (রুপাসহ) বেসরকারি ব্যবসায়ীদের দ্বারা আনীত হলেও কেবলমাত্র রাজকীয় জাহাজ দ্বারা বাহিত হতে শুরু হল। আমেরিকার উপনিবেশের সাথে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য কেবলমাত্র স্পেনের একটি বন্দর এ ব্যবহৃত হতে লাগল। এসব পণ্য নিয়ে একটি দুটির পরিবর্তে জাহাজের বহর চলত নিরাপত্তার খাতিরে। বছরে একদিকে চলত এমনিভাবে দুটি বহর। রাজার সিল-করা নির্দেশ নিয়ে রওনা হত বাণিজ্যবহরগুলো। প্রতি বছর গন্তব্যের গতি ও দিক পরিবর্তন করা হত বিদেশী শক্তি ও জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

আমেরিকার বাণিজ্য, বিশেষ করে আমদানি করা রুপা, যার এক-পঞ্চমাংশ রাজার জন্য খাজনা হিসেবে নির্বাচিত ছিল, বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হত 'হাউস অফ ট্রেড' [House of Trade (casa de contracion)] দ্বারা। এটার সাহায্যার্থে নিয়োজিত ছিল একটি বণিক আদালত (consullado), যা বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করত। রূপার চোরাচালান নিরোধের জন্য অত্যন্ত কঠোর আইন বলবৎ করা হত।

যদিও কাগজে-কলমে ফিলিপের অধীনস্থ স্পেনের একচেটিয়া দখল ছিল আমেরিকার সাথে বাণিজ্য ও আমেরিকার রৌপ্যসম্পদের উপর, কিন্তু এটা বহাল রাখতে এবং ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে একে রক্ষা করতে অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি রাখতে হত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত দেশের বণিকরা স্পেনের সাথে আমেরিকার বাণিজ্যের একটা বিশেষ অংশ লাভ করত বিভিন্ন উপায়ে—বৈধ ও অবৈধভাবে। বৈধভাবে তারা এমন সব পণ্য প্রস্তুত করে স্পেনের নিকট বিক্রি করত উপনিবেশগুলোর জন্য যা স্পেন তৈরি করতে অক্ষম ছিল। অবৈধভাবে তারা স্পেনীয় বণিকদের ঘুস দিয়ে তাদের জাহাজে মাল ওঠাত অথবা চোরাচালানের মাধ্যমে উপনিবেশগুলো থেকে মাল

www.icsbook.info

পাচার করত অথবা উপনিবেশগুলোতে মাল চালান দিত। এছাড়াও মহাসমুদ্রে স্পেনীয় পণ্যবাহী জাহাজ আক্রমণ করে লুট করা ছিল নিয়মিত ব্যাপার।

আমেরিকার এত সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও স্পেনের সম্পদ দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনকালে ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছিল। দেশীয় বাজারে পণ্যের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং স্পেনীয় পণ্য বিদেশীদের সাথে ক্রমেই প্রতিযোগিতায় হেরে যায় এবং ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপা এসে স্পেনে জমা হল স্পেনের বাজারে এবং স্পেনীয় মুদ্রার আকারে সেগুলো লাগল বাজারে জিনিস কেনার কাজে এবং রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য।

দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। শতকরা ১০ ভাগ বিক্রয়-কর (alcabala) যা প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত ও সংগৃহীত হত তা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উৎপাদনকে বিঘ্নিত করে। কৃষির পরিবর্তে ভেড়াপালন সংস্থাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইহুদি ও ম্যুর (মুসলমান) দের উপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। স্পেনকে এর ফলে দক্ষ জনশক্তি থেকে বঞ্চিত করে তার শিল্পোৎপাদনকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কোনোভাবেই সফল হতে পারেননি। ক্যাস্টিল ছিল তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে দরিদ্র প্রদেশ। এখান থেকে আগত কর ছিল অত্যন্ত সামান্য। স্পেনের আরেকটি প্রদেশ আরাগনের কর্টেস (পার্লামেন্ট) ফিলিপকে অত্যন্ত অপছন্দ করত তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার জন্য এবং এ কারণে তাঁকে কর দেওয়ার বিষয়েও এর কার্পণ্যের ক্রটি ছিল না।

ফিলিপের ইতালীয় অংশ থেকে সামান্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত। একমাত্র অর্থের আগমন ঘটত সমৃদ্ধ নেদারল্যান্ডস থেকে, যা ফিলিপের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য স্পেনের হাতছাড়া হয়ে যায়।

www.icsbook.info

অষ্টম অধ্যায়
নেদারল্যান্ডস-এর ইতিহাস

নেদারল্যান্ডস-এর পরিচয়

ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থলে অবস্থিত, বর্তমানে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডস (বা হল্যান্ড) নামে পরিচিতি রাজ্যদুটি, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শুধুমাত্র নেদারল্যান্ডস নামেই পরিচিত ছিল। নেদারল্যান্ডস শব্দের অর্থ 'নিচু দেশ'। মধ্যযুগে এই দেশটি কতকগুলো খণ্ড খণ্ড সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে এ রাজ্যগুলো বার্গান্ডির ডিউকের অধীনে একত্রিত হয়। ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে বার্গান্ডির ডিউক চার্লস দি বোল্ড এর কন্যা ও একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মেরির সাথে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ম্যাক্সিমিলিয়ানের বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে নেদারল্যান্ডস দেশটি অস্ট্রিয়ার অধীনে চলে যায়। ম্যাক্সিমিলিয়ান পরে পবিত্র রোমান সম্রাট নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে স্পেনের রাজবংশের হাতে নেদারল্যান্ডস এর কর্তৃত্ব চলে যায়।

রাজনৈতিকভাবে নেদারল্যান্ডস কোনো একক রাজ্য ছিল না। সমগ্র দেশটি ছিল সতেরোটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি প্রদেশের ছিল নিজস্ব আইনকানুন, নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও নিজস্ব আইনসভা (Assembly of States)। কয়েকটি প্রদেশের ছিল স্থানীয় প্রশাসক বা স্ট্যাট হোল্ডার (Stadtholder)। এ ছাড়াও সমগ্র দেশের জন্য ছিল একটি সাধারণ পরিষদ (States General); নেদারল্যান্ডস এর সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্য এর অধিবেশন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হলেও এর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। নেদারল্যান্ডস এর প্রতিটি প্রদেশ তার স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেটা রক্ষা করত। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস যখন নেদারল্যান্ডস এর শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি কয়েকটি কাউন্সিল গঠন করে তাদের উপর নেদারল্যান্ডস এর বড় বড় অভিজাতদের নিয়ে একটি কাউন্সিল অব স্টেট (Council of State) গঠন করে তার উপর বৈদেশিক দপ্তর ও অন্যান্য কাউন্সিলের উপর কর্তৃত্ব করার সামগ্রিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তা সত্ত্বেও নেদারল্যান্ডস প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশনই রয়ে গেল—একটি একক রাজ্যে রূপান্তরিত হতে পারল না।

www.icsbook.info

নেদারল্যান্ডস-এর অর্থনীতি

নেদারল্যান্ডস-এর সবচেয়ে বড় শিল্প ছিল মৎস্যশিল্প। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে হেরিং মৎস্য সংরক্ষণের এক উন্নততর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হেরিং মাছ সংরক্ষণ করা যেত। নেদারল্যান্ডস-এর অন্তর্গত জিল্যান্ড প্রদেশের উইলিয়াম বিউকেল্‌স্ নামে একজন অখ্যাত মৎস্যশিকারি এই সংরক্ষণ-পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। এই আবিষ্কার ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। এতদিন পর্যন্ত হেরিং মাছ এর যে ঝাঁক নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের উপকূলে সমবেত হত, তারা অকস্মাৎ তাদের গতি পরিবর্তন করে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস এর সমুদ্রোপকূলে দল বেঁধে সমবেত হতে শুরু করে। আর ওলন্দাজরা (নেদারল্যান্ডস এর অধিবাসীদের ওলন্দাজ বলা হয়) প্রচুর হেরিং মাছ সংগ্রহ করে তাদের সংরক্ষণ করে রেখে দিত সারাবছর ইউরোপের বাজারে বিক্রি করার জন্য। যেহেতু শুক্রবারে ও অন্যান্য ধর্মীয় পরবের দিনে এবং ইস্টারের পূর্বে চল্লিশদিন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের জন্য মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল, তার ফলে ইউরোপে ওলন্দাজরা তাদের হেরিং মাছের একটি বিরাট বাজার পেয়ে যায়। ক্রমশ মৎস্যশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাজার হাজার মৎস্যশিকারি নিযুক্ত হল মাছধরার কাজে এবং বিপুল পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত হল জাহাজগুলোতে।

বস্তুতপক্ষে আমস্টার্ডাম বন্দরের উৎপত্তির মূলে ছিল হেরিং মৎস্যশিল্প। ১৫৫০ শতকের পর থেকে এন্টওয়ার্পের পরে আমস্টার্ডামই ছিল নেদারল্যান্ডস এর দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। মৎস্যশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে গড়ে ওঠে নেদারল্যান্ডস এর নিজস্ব বাণিজ্যিক নৌবহর। পরবর্তীতে ইউরোপের বাণিজ্যের সিংহভাগ ওলন্দাজদের দখলে চলে যাওয়ার কারণ এই নৌবহরের সাফল্যের মধ্যেই নিহিত ছিল।

সমুদ্রের মধ্যে বাঁধ (dike) নির্মাণ করে সমুদ্র থেকে প্রচুর জমি ওলন্দাজরা উদ্ধার করে। খাল কেটে কেটে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে এই জমি নেদারল্যান্ডসবাসীরা উদ্ধার করেছিল।

নেদারল্যান্ডস এর স্বাধীনতাযুদ্ধ

স্পেনের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর মধ্যে নেদারল্যান্ডস ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এর অধিবাসীরা ছিল কর্মঠ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে দেশটি ছিল উন্নত। স্পেনীয় রাজবংশের একটি বিরাট আয়ের উৎস ছিল নেদারল্যান্ডস। দেশটিকে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন বলে ধরা হত। স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাঁর যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য দুই-পঞ্চমাংশ অর্থের যোগান পেতেন নেদারল্যান্ডস থেকে। কিন্তু তাঁরই পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ এর রাজত্বকালে এই প্রদেশটি স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মরণপণ স্বাধীনতাযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে দক্ষিণের প্রদেশগুলো স্পেনের অধীনেই থেকে যায় এবং উত্তরের প্রদেশগুলো তাদের সংগ্রাম চালিয়ে শেষপর্যন্ত ১৬০৯ সালে স্পেনের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে 'নেদারল্যান্ডস' নামে একটি স্বতন্ত্র দেশ গঠন করে।

www.icsbook.info

নেদারল্যান্ডস এর স্বাধীনতাযুদ্ধের কারণগুলোকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল ফিলিপের ব্যক্তিগত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

ক. রাজনৈতিক কারণ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নেদারল্যান্ডস ছিল সতেরোটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশন, এর কাউন্সিল অব স্টেট-এর সদস্যরা ছিলেন অভিজাত বংশোদ্ভূত। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এসকল অভিজাতদের মতামত অগ্রাহ্য করেই নেদারল্যান্ডস শাসন করতে শুরু করেন। কয়েকটি শহর থেকে অভিজাত পরিবারের শাসন উচ্ছেদ করা হয় এবং এসব স্থানের শাসনভার অর্পণ করা হয় স্পেনীয়দের উপর। ১৫৫৫ সালের পর ফিলিপ কখনও নেদারল্যান্ডস-এ পদার্পণ করেননি। নেদারল্যান্ডস-এর শাসন ব্যাপারে তিনি সর্বতোভাবে স্পেনীয়দের উপর নির্ভর করতেন। উচ্চপদে নিযুক্ত করা হত স্পেনীয়দের। ফিলিপের বৈমাত্রেয় ভগ্নী মার্গারেট অব পারমা কে নেদারল্যান্ডস এ স্পেনের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হল । তাঁর উপদেষ্টাদের সকলেই ছিলেন স্পেনীয়। ওলন্দাজ অভিজাতদের উচ্ছেদ করা হল উচ্চ রাজপদ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জাতীয়সত্তাকে আঘাত করা হল, যার পরিণামস্বরূপ তারা ফিলিপ ও তাঁর শাসনকে বিদেশী শাসন বলেই ভাবতে শুরু করল।

খ. অর্থনৈতিক কারণ : ফিলিপের পিতা সম্রাট পঞ্চম চার্লস এর সময় থেকেই নেদারল্যান্ডস এর উপর কর-ভার চাপানো হয়। ফিলিপ এই করের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেন। আদায়কৃত কর নেদারল্যান্ডস এ ব্যবহৃত না হয়ে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্য অংশের ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হত। এছাড়াও স্পেনীয় বাণিজ্যের স্বার্থে ফিলিপ নেদারল্যান্ডস এর ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন, স্বাভাবিকভাবেই সেটা ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত করে এবং দেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতিকে প্রায় পঙ্গু করে তোলে।

গ. ধর্মীয় কারণ : কিন্তু ওলন্দাজরা ফিলিপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ হয়েছিল তাঁর ধর্মীয় নীতির কারণে। ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন প্রসারের যুগে নেদারল্যান্ডসএ এ ধর্মীয় আন্দোলন ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে লুথারপন্থীদের প্রভাবে এবং পরে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত ক্যালভিনপন্থীদের প্রভাবে নেদারল্যান্ডস এর কয়েকটি প্রদেশ থেকে ক্যাথলিকদের ধর্ম প্রায় নির্বাসিত হয়ে যায়। পঞ্চম চার্লস অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সাথে নেদারল্যান্ডস এ প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের প্রসার লক্ষ্য করেন। ১৫২২ সাল থেকেই তিনি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। লুথারের লিখিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হল এবং এর প্রকাশনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হল। সর্বোপরি স্পেনে ধর্মদ্রোহী বা প্রোটেস্ট্যান্টদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের জন্য ইনকুইজিশন (Inquisition) বা ধর্মীয় আদালত স্থাপন করা হল। পরবর্তী বছরগুলোতে নতুন নতুন আইন জারি করা হল এবং সাথে সাথে প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি করা হল। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জারি করা হল 'রক্তের বিধান' (Edict of Blood) নামের

www.icsbook.info

আইন। এর দ্বারা যে কেউ ধর্মদ্রোহিতামূলক গ্রন্থ রাখা, বিক্রি করা বা অনুলিপি করা প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হলে, অথবা সাধুসন্ন্যাসীদের মূর্তি ভঙ্গ করলে বা ক্ষতি করলে, অথবা ধর্মীয় গ্রন্থাদি ব্যাপারে প্রকাশ্যে বা গোপনে বিতর্কে লিপ্ত হলে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান দেয়া হয়। এই আইন প্রয়োগ করে নেদারল্যান্ডস এ শত শত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়। নতুন নতুন ধর্মীয় আদালত স্থাপনের মাধ্যমে ফিলিপ নেদারল্যান্ডস থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৫৫৯ সালে ফিলিপ নেদারল্যান্ডস এ ধর্মীয় এলাকার (Bishopric) সংখ্যা বৃদ্ধি করে তিন থেকে পনেরোতে উন্নীত করেন। এসব এলাকার বিশপরা রাজার দ্বারা মনোনীত হবেন। সকলে মনে করল যে এঁরা রাজার চর হিসাবে কাজ করবেন। এঁদের নিযুক্তির বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট নির্বিশেষে নেদারল্যান্ডস এর সকল অধিবাসীরা সোচ্চার হল।

ঘ. ব্যক্তিগত বিষয় : উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও ফিলিপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এ বিদ্রোহের জন্য দায়ী ছিল। ফিলিপের পিতা পঞ্চম চার্লস নেদারল্যান্ডস এ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিতপালিত হন। ফলে স্বভাবতই নেদারল্যান্ডস-এর অধিবাসীরা তাঁকে স্বজাতি বলেই ভাবত। অন্যদিকে ফিলিপের জন্ম স্পেনে। সেখানেই তাঁর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়। তিনি যে ভাষায় কথা বলতেন, ওলন্দাজদের কাছে সেটা ছিল বিদেশী ভাষা। ফিলিপ ওলন্দাজদের নিকট বিদেশী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তদুপরি ফিলিপকে তারা তাঁর সংকীর্ণ মনোভাব ও নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য ঘোরতর অপছন্দ করত। তাঁর প্রতিটি কাজই ওলন্দাজদের নিকট সন্দেহের উদ্রেক করত। তাঁর ধর্মীয় কাজগুলো তাদের কাছে ফিলিপের ক্রূর আচরণের প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান হত। স্পেনীয়দের প্রতি ফিলিপের পক্ষপাতিত্ব এবং নেদারল্যান্ডস-এর রাজনীতিতে তাদের জোর করে স্থাপনের প্রচেষ্টা ওলন্দাজদের কাছে বিদেশী শাসন চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা বলেই প্রতীয়মান হয়। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়।

এই বিদ্রোহর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৫৬৬ সালের এপ্রিল মাসে। নেদারল্যান্ডস এর বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় চারশো প্রতিনিধি ব্রাসেলস শহরে সমবেত হয়ে স্পেনের রাজপ্রতিনিধি মার্গারেট অব পারমার কাছে প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আদালত ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইনের কঠোরতা হ্রাস করার আবেদন জানায়। তারা একই সাথে স্টেটস-জেনারেল এর সভাও নিয়মিতভাবে আহ্বানের দাবি পেশ করে। অন্যথায় বিদ্রোহের আগুন যে ভীষণভাবে জ্বলে উঠবে এ বিষয়েও তারা রাজপ্রতিনিধিকে অবহিত করে। মার্গারেট তাদের আবেদনের প্রতি সুবিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁরই একজন উপদেষ্টা বলে ওঠেন, 'এটা কি সম্ভব যে মহামান্যা রাজপ্রতিনিধি এইসব ভিক্ষুকদের ভয় করবেন!' (Is it possible that your Highness can fear these beggars!)। যেই মাত্র এই মন্তব্য জনপ্রতিনিধিদের কানে পৌঁছুল,

www.icsbook.info

তখন থেকেই তারা ভিক্ষুক (Gueux) নাম গ্রহণ করল এবং ভিক্ষুকদের প্রতীকস্বরূপ একটি ভিক্ষার ঝুলি ও ভিক্ষাপাত্র বহন করতে শুরু করল।

এন্টওয়ার্পে বিদ্রোহ : প্রতিনিধিদের আবেদন যথাসময়ে ফিলিপের কাছে পেশ করা হল। ফিলিপ এ আবেদনের প্রেক্ষিতে একটু নমনীয় হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক একই সময়ে তাঁর কাছে পৌঁছুল এন্টওয়ার্প এর দাঙ্গার খবর। এন্টওয়ার্প শহরে ক্যালভিনপন্থীরা শহরের ক্যাথলিক গির্জাগুলোতে প্রবেশ করে সেখানকার সুন্দর সুন্দর মূর্তি, দেয়ালের সুদৃশ্য চিত্রাবলী এবং গির্জার রঙিন চিত্রিত কাচের জানালাগুলো ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। এই মূর্তি ভাঙার ঢেউ অন্যান্য শহরে গিয়েও পৌঁছায় এবং পুরো দেশজুড়ে চলে এই অরাজক পরিস্থিতি।

বিরোধীপক্ষের অপেক্ষাকৃত ধীরস্থির স্বভাবের নেতাদের প্রভাবে এ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা হয় এবং প্রধানত এ দলের প্রধান প্রিন্স অব অরেঞ্জ এর সহায়তায় মার্গারেট অব পারমা আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এ দাঙ্গার ফলে মধ্যযুগের শিল্পকলার বিশিষ্ট নিদর্শনগুলোই শুধু ধ্বংস হয়নি, রোমান ক্যাথলিক অভিজাত সম্প্রদায়ও তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

ডিউক অব আলভা

ফিলিপ এ দাঙ্গার খবর প্রাপ্ত হলে পূর্বের চেয়েও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি ডিউক অব আলভাকে দশ হাজার সৈন্যসহ নেদারল্যান্ডসএ পাঠান। তাঁর উপর দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টান্তমূলকভাবে শাস্তিদানের ভার অর্পণ করা হয়। তাঁকে প্রকৃতপক্ষে সামরিক একনায়কের ক্ষমতা দেয়া হল। আলভার আগমনের সংবাদ পেয়ে অনেকেই প্রাণভয়ে নেদারল্যান্ডস ছেড়ে অন্যান্য দেশে পালিয়ে গেলেন। অনেকে আবার আশায় রইলেন যে আলভা হয়তো অতখানি নিষ্ঠুর হবে না। কিন্তু তাদের সব আশাই অস্তমিত হল যখন আলভা 'কাউন্সিল অব ট্রাবলস' (Council of Troubles) নামে একটি পরিষদ গঠন করলেন। নিষ্ঠুরতার জন্য এ পরিষদ এতখানি কুখ্যাতি লাভ করল যে জনগণ এটার নাম দিল 'রক্তের পরিষদ' (Council of Blood)। নেদারল্যান্ডস থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ নির্মূল করাই ছিল এ পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মার্গারেট যখন দেখলেন যে তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই তখন তিনি পদত্যাগ করলেন। ফিরে যাওয়ার পূর্বে তিনি আলভাকে সাবধান করে বলে গেলেন যে তাঁর কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আলভা অবশ্য সে-কথায় কর্ণপাত করেননি। দলে দলে লোক ধরে নিয়ে আসা হত পরিষদের সম্মুখে। বিচারের নামে অনুষ্ঠিত হত প্রহসন এবং তার পরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত। মৃতব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজকীয় তোষাখানায় জমা দেয়া হত। নেদারল্যান্ডস এর কোনো নাগরিকই বিপদমুক্ত ছিল না। আলভার পদ্ধতি এত ভয়াবহ ছিল যে স্বয়ং পোপ এবং এমনকি ফিলিপের উপদেষ্টারাও এর বিরোধিতা করেন। আলভা নিজেই গর্ব করে বলেছেন যে তিনি তাঁর ছয় বছরের

www.icsbook.info

শাসনকালে আঠারো হাজার লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আলভার নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এগমন্ট ও হর্ন কাউন্টদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মৃত্যুতে দেশবাসী এতখানি বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তারা নতুন করে আলভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে আবার প্রাণ দিতে হল আলভার ফাঁসিকাঠে। প্রিন্স অব অরেঞ্জ এর বিরুদ্ধেও যখন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি হল তখন তিনি প্রাণভয়ে জার্মানিতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল এবং তাঁকে আইনবহির্ভূত ব্যক্তি (out law) বলে ঘোষণা করা হল।

আলভার অত্যাচার চরমে উঠল যখন ১৫৬৯ সালে আলভা তাঁর নিষ্ঠুর শাসন পরিচালনার খরচ নেদারল্যান্ডসবাসীর উপরই চাপিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর এক শতাংশ কর, সকল স্থাবর সম্পত্তির উপর পাঁচ শতাংশ এবং সকল অস্থাবর সম্পত্তির উপর দশ শতাংশ বিক্রয়-কর চাপানো হল। শেষোক্ত কর আরোপ করার ফলে, যদিও সেটা ১৫৭১ সালের পূর্বে সংগ্রহ করা হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক ক্ষতি হল এবং সাধারণ মেহনতি মানুষের উপর এত বিপুল পরিমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হল যে তার ফলে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট নির্বিশেষে সকলে ফিলিপের কাছে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। কর আরোপ করার বিরুদ্ধে যে বিপুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তারই প্রেক্ষিতে আলভাকে সকল কাঁচামাল এবং বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের উপর থেকে বিক্রয় কর উঠিয়ে নিতে হয় এবং পরিশেষে এ কর সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়।

অবশেষে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলভা ছয় বছরে অমানুষিক নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ছয় বছরে তিনি তাঁর প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে বা নেদারল্যান্ডসবাসীদের শান্ত করতে অথবা প্রোটেস্ট্যান্টদের নির্মূল করতে– কোনোটাতেই সক্ষম হননি।

বিদ্রোহীদের নেতা উইলিয়াম অব অরেঞ্জ, যিনি ইতিহাসে উইলিয়াম দি সাইলেন্ট (William the Silent) নামেও পরিচিত, জার্মানিতে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট, জার্মান ভাড়াটে সৈন্য এবং নির্বাসিত ওলন্দাজ-এদের নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠিত হয়। কিন্তু উইলিয়াম ও তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রাথমিক অভিযানগুলো ব্যর্থ হয়। ওলন্দাজদের প্রথম বিজয় সূচিত হয় জলযুদ্ধে। উইলিয়াম ছোটখাটো জলযান যোগাড় করতে লাগলেন, যাদের কাজ হল যেখানে সেখানে স্পেনীয় জাহাজের উপর হামলা করা। 'সাগর ভিক্ষুক' (Sea Beggars) নামে পরিচিত এ জাহাজগুলোর ক্রমাগত হামলায় উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেল থেকে সকল স্পেনীয় জলযান বিতাড়িত হল। বিদ্রোহীরা আলভার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিল স্পেনীয় ঘাঁটিগুলোকে আক্রমণ করে এবং স্পেনীয় জাহাজের নাবিকদের হত্যা করে।

প্রথম প্রথম বিদ্রোহীদের আশ্রয় নেয়ার কোনো স্থান না-থাকায় তারা ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের সম্মতিক্রমে ব্রিটিশ বন্দরগুলোতে আশ্রয় নিত। কিন্তু ইংল্যান্ডের

www.icsbook.info

স্পেনীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে স্পেন প্রতিবাদ জানালে ইংল্যান্ড বিদ্রোহীদের তার বন্দরে আশ্রয় নিতে নিষেধ করে। বিদ্রোহী ওলন্দাজরা তখন মিউজ নদীর মোহনায় অবস্থিত ব্রিয়েল (Brielle) বন্দরটি দখল করে নেয় (১৫৭২ খ্রি.)। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নেদারল্যান্ডস এর প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা ডরড্রেক্ট (Dordrecht)-এ মিলিত হয়ে প্রকাশ্যভাবে উইলিয়াম অব অরেঞ্জকে তাদের গভর্নর (Stadtholder) ঘোষণা করে তাঁকে সর্বতোভাবে যুদ্ধ-পরিচালনায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করে উইলিয়াম নিজেকে একজন দক্ষ সমরনায়ক, একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ এবং দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে আলভা স্পেনে ফিরে গেলে ডন লুই ডি রিকোয়েসেন্স (Don Luis de requesens) নেদারল্যান্ডস-এর গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। অপেক্ষাকৃত নমনীয় স্বভাবের এই নতুন গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল অব ট্রাবলস বিলুপ্ত করে ফিলিপ এবং নেদারল্যান্ডস-এর জনগণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রিকোয়েসেন্স ১৫৭৬ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরপরই নেদারল্যান্ডস এ অবস্থানরত স্পেনীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন ও খাদ্য না পেয়ে বিদ্রোহ করে এবং এন্টওয়ার্পসহ কয়েকটি শহর বর্বরতার সাথে লুঠতরাজ করে। ইতিহাসে এ ঘটনাকে স্পেনীয় রোষ (Spanish Fury) নামে আখ্যা দেয়া হয়।

নেদারল্যান্ডস এর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা ১৫৭৬ সালে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে (Pacification of Ghent) স্পেনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মূলত ধর্মীয় সমাঝোতার ভিত্তিতে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। কাজেই পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ফিলিপের সৎভাই লেপান্টোর যুদ্ধবিজয়ী অস্ট্রিয়ার ডন জন (Don John of Austria) যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তাঁকে ওলন্দাজদের সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলা করতে হয়। ডন জন অবশ্যই নমনীয় ভাব দেখান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নেদারল্যান্ডস-এর পরিস্থিতি শান্ত করে এদেশকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা। তাঁর সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। উইলিয়াম ও তাঁর দলবল ডন জনের কথায় আস্থা স্থাপন করেননি, অন্যদিকে ফিলিপও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ডন জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভয় পেতেন। সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ডন জন ১৫৭৮ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল আলেকজান্ডার ফার্নেস (প্রিন্স অব পারমা) নেদারল্যান্ডস এ পদার্পণ করলে অবস্থা কিঞ্চিৎ স্পেনের অনুকূলে দেখতে পান। স্টেটস জেনারেল বা প্রতিনিধিসভার অভ্যন্তরে ক্যাথলিক ও ক্যালভিনপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফার্নেস সুচতুরভাবে এ বিরোধকে কাজে লাগান। ক্যাথলিকরা ছিল দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ছিল মূলত উৎপাদনকারী এবং জাতীয়তার দিক দিয়ে ফরাসিদের কাছাকাছি। অন্যদিকে

www.icsbook.info

উত্তরের প্রদেশগুলোতে ক্যালভিনপন্থীরাই ছিল সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি। তারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী এবং জাতিগতভাবে পুরোপুরি ওলন্দাজ।

ফার্নেস ক্যালভিনপন্থী এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে ক্যাথলিকদের নিজের পক্ষে আনতে সমর্থ হন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের লোভ এবং ভীতি দুটোই প্রদর্শন করেন। ফলে ক্যাথলিকরা উইলিয়ামের নেতৃত্ব ছেড়ে নিজেদের ধর্মরক্ষার্থে একত্রিত হল (League of Arras. ১৫৭৯ খ্রি.) এবং স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা থেকে তারা নিজেদের বিরত রাখল। অন্যদিকে ইউটরেক্ট এর চুক্তি (Treaty of Utrecht) দ্বারা উত্তরের সাতটি প্রদেশ সম্মিলিতভাবে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ফিলিপ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করল। ফলে কার্যত ঘেন্ট এর চুক্তি ভেঙে গেল।

ইউটরেক্ট এর চুক্তির ধারাগুলোই পরবর্তীতে স্বাধীন নেদারল্যান্ডস এর সংবিধানরূপে গৃহীত হয়। স্পেনের আধিপত্যকে অস্বীকার করার মধ্যদিয়েই প্রকৃতপক্ষে ওলন্দাজদের জনগণের অধিকারের বাণী (Dutch Declaration of the Rights of Man) ঘোষিত হল। এই অধিকারের দাবি পরবর্তীতে ঘোষিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪০ খ্রি.) ও গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রি.) কালে। একই অধিকারের বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সনদে ও ফরাসি বিপ্লবের সংবিধানে।

নেদারল্যান্ডস-এর স্বাধীনতার দলিলে স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল রাজার সাথে প্রজার সম্পর্ক— "The people were not created by God for the sake of the prince .... but, on the contrary, the prince was made for the good of the people". (জনগণ রাজাদের স্বার্থে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি... বরং রাজাকে সৃষ্টি করা হয়েছে জনগণের কল্যাণের জন্য)। এই ঘোষণামতে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক দেশের আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং যেহেতু ফিলিপ সেই আইন মেনে চলেননি, অতএব নেদারল্যান্ডসবাসীর অধিকার রয়েছে তাঁকে অমান্য করার।

ওলন্দাজদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোনো ভাবে দমন করতে না পেরে ফিলিপ তাদের নেতা উইলিয়াম অব অরেঞ্জকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। যে কেউ তাঁকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে অথবা হত্যা করতে পারবে, তাকে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার এবং সেইসাথে উইলিয়ামের সম্পত্তির একাংশ ও অভিজাতের সম্মান প্রদান করা হবে। মূলত এই পুরস্কারের লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু লোক তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। পরপর কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৫৮৪ সালে বালথাসার জেরার্ড (Balthasar Gerard) নামের একজন বার্গেন্ডীয় যুবক গোপনে উইলিয়ামের বাড়িতে ঢুকে পিস্তলের গুলি ছুড়ে তাঁকে হত্যা করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়েকজন নেতা তাঁদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন উইলিয়াম অব অরেঞ্জ তাঁদের মধ্যে একজন। প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদনার যুগেও তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে উদার ও নমনীয়। তিনি হয়তো ক্রমওয়েল বা জর্জ

www.icsbook.info

ওয়াশিংটনের মতো যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব প্রদান, রাষ্ট্রচালনা ও কূটনীতির প্রয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে সংগ্রামকে সফলভাবে পরিচালনা করার মধ্যদিয়ে নেদারল্যান্ডস এর স্বাধীনতার পথ তিনি প্রশস্ত করে রেখে যান। তাঁর মৃত্যুতে ওলন্দাজবাসীরা তাঁদের প্রিয় দেশনেতা ও সংগ্রামী সাথীকে হারাল।

উইলিয়াম এর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফিলিপ আনন্দে উল্লসিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর সবচেয়ে বড় পথের কাঁটা অপসারিত হল। কিন্তু তাঁর সব হিসাব ভুল হয়ে যায়। উইলিয়াম এর মৃত্যু ওলন্দাজবাসীদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমন করতে পারেনি। উইলিয়াম এর দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স মরিস পিতার স্থান অধিকার করেন। তিনি সফলভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর জীবিতকালে নেদারল্যান্ডস এর স্বাধীনতা দিতে সম্মত হননি। অবশেষে তাঁর পুত্র তৃতীয় ফিলিপ ১৬০৯ সালে নেদারল্যান্ডস-এর সাথে একটি বারো-বছরের চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৬০৯ সাল থেকেই নেদারল্যান্ডস কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়, যদিও ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি (ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে সম্পাদিত) দ্বারা এই স্বাধীনতা সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৬৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মুনস্টার এ সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নেদারল্যান্ডস এর সাতটি প্রদেশ (United provinces) স্বাধীন 'হল্যান্ড' নামে পরিচিত হল। এই সাতটি যুক্ত প্রদেশ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একটি কনফেডারেশন গঠন করল। প্রতিটি প্রদেশের জন্য গঠিত হল একটি স্বতন্ত্র সরকার, কিন্তু সকলের জন্য রইল একটি সাধারণ পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধিসভা (The States General)। একইভাবে একজন প্রশাসক বা গভর্নর (Stadtholder)-এর অধীনে সমবেত হল সাতটি প্রদেশ। অরেঞ্জ-পরিবারকে বংশপরম্পরায় এই প্রশাসক পদের অধিকার দেয়া হল। পুরো সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে আইন পরিষদ ও গভর্নর-এর মধ্যে বিবাদ চলে। আইন পরিষদের পক্ষ নেয় দেশের সমৃদ্ধিশালী বণিকশ্রেণী। তারা ছিল একটি শিথিল, নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি পরিচালিত (Oligarchy) ফেডারেশনস-এর পক্ষে। অপরপক্ষে ছিল দেশের দরিদ্র জনগণ, অরেঞ্জ পরিবারের নেতৃত্বে একটি রাজতন্ত্র গড়ে তোলার তারা পক্ষপাতী ছিল।

নেদারল্যান্ডস-এর দক্ষিণের প্রদেশগুলো পরবর্তীতে বেলজিয়াম নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী দু-শতাব্দী ধরে এ অঞ্চল অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশ দ্বারা শাসিত ছিল। কখনও কখনও এটাকে 'স্পেনীয় নেদারল্যান্ডস' বা 'অস্ট্রীয় নেদারল্যান্ডস' নামে অভিহিত করা হত। যুদ্ধে হল্যান্ড অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরবর্তীকালে বেলজিয়ামের তুলনায় বেশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। ওলন্দাজরা শেল্ট নদী (The Scheldt) ও তার আশপাশের সমুদ্রে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে এন্টওয়ার্প-এর বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এর ফলে ওলন্দাজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র তাদের প্রধান শহর আমস্টার্ডাম-এ স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়।

www.icsbook.info

ওলন্দাজদের সাফল্যের কারণ

স্বাধীনতা সংগ্রামে ওলন্দাজদের সাফল্যের পাশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত নেদারল্যান্ডস-এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দেশটিকে অসংখ্য খালদ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে। এর ফলে দেশের উপর আক্রমণ ও অভ্যন্তরভাগে সৈন্য পরিচালনা স্বভাবতই অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য খাল শত্রুর প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। শত্রুর প্রবেশমুখে ডাইক (dike) বা বাঁধগুলো ভেঙে দিয়ে তাদের অভিযান প্রতিহত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সমুদ্রপথে নির্ভীক ও সুদক্ষ অভিযানকারীরূপে পরিচিত ওলন্দাজরা সহজেই জলদস্যুর মতো স্পেনীয় ও পর্তুগিজ জাহাজগুলোর উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের বাণিজ্য ও যুদ্ধজাহাজগুলোর ক্ষতিসাধন করত।

তৃতীয়ত, যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্য নিযুক্ত করার ফলে নেদারল্যান্ডসবাসীরা নিজ দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়। দেশের অভ্যন্তরভাগ নিরুপদ্রব থাকায় অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে তারা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলে। ফলে যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যেও দেশ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উইলিয়াম-এর সুযোগ্য নীতি নেদারল্যান্ডসবাসীকে কোনো বড় ধরনের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়া থেকে প্রতিহত করে।

চতুর্থত, স্বাধীনতাযুদ্ধে নেদারল্যান্ডস ইউরোপের অন্যান্য দেশ, যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্স-এর প্রোটেস্ট্যান্টদের থেকেও সাহায্যলাভ করে।

পরিশেষে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্স-এর বিরুদ্ধে স্পেন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ কোনো যুদ্ধেই সফলতা অর্জন করতে পারেননি। নেদারল্যান্ডস-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্যের এটাও একটা প্রধান কারণ।

স্পেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেদারল্যান্ডস-এর উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলো (যারা নেদারল্যান্ডস রাজ্য গঠন করল) সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে দক্ষিণের প্রদেশগুলো (বেলজিয়াম রাজ্য নামে পরিচিত) এই যুদ্ধের মধ্যদিয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধর্মীয় বিরোধ, ওলন্দাজদের আক্রমণ এবং সর্বোপরি স্পেনীয় সৈন্যদের উন্মত্ততা ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দক্ষিণের শহরগুলোর সম্পদ ও সমৃদ্ধির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর ইউরোপের তৎকালীন সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র দক্ষিণের এন্টওয়ার্প শহরটির বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সূচনা হয়। স্পেনীয়রা এ শহরটি থেকে শুধু প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ নির্মূল করেনি, জনগণের উপর বিপুল পরিমাণ করের বোঝাও চাপিয়ে দেয়। ফলে, এককালের সমৃদ্ধিশালী নগরী এন্টওয়ার্প ত্যাগ করে দলে দলে সকল প্রোটেস্ট্যান্ট এবং এমনকি অনেক ক্যাথলিকও অন্যান্য স্থানে বিশেষভাবে উত্তরের ওলন্দাজ শহরগুলোতে চলে যায়। কুড়ি হাজার ব্যবসায়ী ও কারিগর এক দফায় এন্টওয়ার্প শহর ছেড়ে আমস্টার্ডামে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। উপরন্তু, ওলন্দাজরা শেল্ট (The Scheldt) নদীর পারে দুর্গ নির্মাণ করে এন্টওয়ার্প অভিমুখে গমনকারী সকল জাহাজের

www.icsbook.info

গতিরোধ করে বাধা দেয়। এ ছাড়া তারা এন্টওয়ার্প শহরের প্রবেশমুখে পাথরভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে সে শহরে যে-কোনো জাহাজের প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এভাবে তারা এন্টওয়ার্পকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ক্রমশ আমস্টার্ডামের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এভাবে ওলন্দাজ শহরগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সূচনা করে।

নেদারল্যান্ডস-এর পরবর্তী ইতিহাস

স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস-এর শিল্প এতখানি প্রসারতা লাভ করে যে এদেশটি সে-যুগের ইউরোপের সর্বপ্রধান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। দক্ষিণের সুদক্ষ কারিগররা নেদারল্যান্ডস-এ আগমন করার ফলে ওলন্দাজরা বিশেষভাবে লাভবান হয়। ফ্লান্ডার্স, আর্টোই ও ব্রাবান্ট থেকে আগত বস্ত্রনির্মাণ শিল্পীরাই সে-যুগের পৃথিবী বিখ্যাত লিডেন-এর সার্জ, হার্লেম-এর লিনেন এবং ইউটরেক্ট-এর মখমল তৈরি করত। অন্যান্য প্রধান প্রধান দ্রব্যের মধ্যে বিয়ার, টাইলস, চিনামাটির দ্রব্যাদি, মৃৎপাত্র ও কাগজ প্রধান ছিল। আমস্টার্ডামের বিশেষ খ্যাতি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নির্মাতা হিসাবে। ইউরোপের ধনীদের জন্য অলংকার এখান থেকেই সরবরাহ হত। মর্মরপাথর শিল্প, চামড়া শিল্প, সাবান ও চিনি শিল্প, করাত ও তেল কারখানার জন্যও আমস্টার্ডামের খ্যাঁতি ছিল জগৎজোড়া। এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস-এর সবচেয়ে প্রধান কারখানা ছিল জাহাজ নির্মাণ কারখানা। সারা ইউরোপের তুলনায় এ দেশে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক জাহাজ নির্মিত হত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে নেদারল্যান্ডস-এ বছরে দুহাজার জাহাজ তৈরি হত, যদিও জাহাজনির্মাণের প্রধান উপকরণ, লোহা, কাঠ, আলকাতরা, শণ সবই বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। শ্রমের সুষম বণ্টন ও বিশেষ কারিগরি দক্ষতা ছিল জাহাজনির্মাণ শিল্পের বিকাশের প্রধান কারণ। অন্যান্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে ও কম খরচে জাহাজ নির্মিত হত। জাহাজনির্মাণ শিল্পের পাশাপাশি গড়ে উঠল অন্যান্য শিল্প, যথা—দড়ি, পাল, নোঙর, জাল নির্মাণ ইত্যাদি শিল্প। বায়ুকলের (Wind Mill) সাহায্যে অধিকাংশ কারখানা চালিত হত। এটাও নেদারল্যান্ডস-এর শিল্পের বিকাশের সুবিধার কারণ। অসংখ্য খালের ভিতর জাহাজ চলাচলের সুবিধা থাকার দরুন একেবারে কারখানার দোরগোড়া থেকে জাহাজে মাল বোঝাই করা সম্ভব হত। ফলে, খরচও হত কম। এসব কারণে নেদারল্যান্ডস-এর জাহাজশিল্পটি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বেড়ে ওঠে।

স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধচলাকালীন নেদারল্যান্ডস-এর মৎস্যশিল্পের বিকাশ দ্রুততর হয়। প্রতি বৎসর মৎস্যশিল্প থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ পর্যটক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে লিখেছেন যে, একমাত্র ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড-এর সমুদ্রোপকূলে তিন হাজার ওলন্দাজ জাহাজ মাছধরার কাজে নিয়োজিত ছিল। এই তিন হাজার ওলন্দাজ জাহাজ তাদের কাজে

www.icsbook.info

সাহায্যের জন্য আরও নয় হাজার জাহাজ ও নৌকা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের কাজে দেড় লক্ষ লোককে নিয়োজিত করত।

স্পেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ নেদারল্যান্ডস-এর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিরও অন্যতম প্রধান কারণ। মধ্যযুগ থেকেই তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তার দ্রুত বাণিজ্যিক প্রসারতা ঘটতে থাকে। বড় বড় পেটমোটা ওলন্দাজ জাহাজের খোলে অন্যান্য দেশের জাহাজের তুলনায় বেশি মাল ধরত এবং অন্যান্যদের তুলনায় এসকল জাহাজ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ও দ্রুততার সাথে মাল পরিবহনে সক্ষম হত। উপরন্তু, নাবিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবসায়ীসুলভ ব্যবহার অন্যদের বন্ধুত্ব অর্জনে সহায়ক হয়। ফরাসিরা তাদের বহির্বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ওলন্দাজ জাহাজগুলোকে নিযুক্ত করত। ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যের একাংশ ওলন্দাজ জাহাজের সাহায্যেই সম্পন্ন করত। স্কটল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক ও নরওয়ের বাণিজ্যও মূলত ছিল ওলন্দাজ জাহাজ কোম্পানিগুলোর হাতে। পরবর্তীকালে পর্তুগাল ও স্পেনের বাণিজ্যও তাদের হাতে আসে, বাল্টিক সাগরের বন্দরগুলো (ড্যানজিগ, লিউবেক ও রিগা) থেকে ইউরোপের অন্যান্য বন্দরে শস্য পরিবহন ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। পূর্বে এটা হেনসিয়াটিক লীগের সদস্যদের দখলে ছিল। পনেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এটা ওলন্দাজদের অধিকারে আসে। সপ্তদশ শতক থেকে প্রায় সাত-আটশো ওলন্দাজ জাহাজ একাজে নিযুক্ত ছিল।

১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রায় কুড়িগুণ বেশিসংখ্যক ওলন্দাজ জাহাজ বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যে ও মাল পরিবহনের কাজে নিযুক্ত ছিল। ইউরোপের উত্তরের দেশগুলোতে ওলন্দাজরা মশলা, লবণ, মদ, চিনি, রেশম ও অন্যান্য বস্ত্র নিয়ে যেত ও ফিরতি পথে সেদেশগুলো থেকে নিয়ে আসত জাহাজ বোঝাই করে গবাদিপশু, জাহাজ নির্মাণের জন্য কাঠ, চামড়া, ফার, পশম, ক্যাভিয়ার (একপ্রকারের সামুদ্রিক মাছের ডিম), অস্ত্রশস্ত্র, লোহা, তামা, সিসা, আলকাতরা, মধু, চর্বি, মোম ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল কাঠ, কেননা ওলন্দাজরা শুধু নিজেদের জন্যই নয়, ফরাসি ও ইতালীয়দের জাহাজনির্মাণ কারখানায়ও কাঠ সরবরাহ করত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা তাদের বাণিজ্যের পরিধি বাড়িয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছুল। ফ্রান্স ও ইতালির শহরগুলো ছাড়াও তারা মরক্কো ও তুরস্কের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে, এ ছাড়া নদীপথে শেল্ট, মিউজ ও রাইন নদীর মধ্যে হামবুর্গ বন্দরের সাথে তাদের সর্বাধিক বাণিজ্য চলত। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে হামবুর্গ ও নেদারল্যান্ডস-এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার জাহাজ বাণিজ্যের কাজে নিয়োজিত ছিল।

ষোড়শ শতক থেকে ওলন্দাজরা পূর্বদিকের বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করে। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের লিসবন বন্দর বন্ধ না করা পর্যন্ত পর্তুগিজদের দ্বারা আনীত পূর্বদেশের পণ্যের ইউরোপীয় পরিবেশক ছিল ওলন্দাজরা। পর্তুগাল স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ফিলিপ তাঁর বিদ্রোহী ওলন্দাজ প্রজাদের লাভজনক

www.icsbook.info

বাণিজ্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের লিসবন থেকে বহিষ্কার করেন (১৫৮১ খ্রি.)। ওলন্দাজ নাবিকরা বাধ্য হয়ে তখন পূর্বদেশের দিকে ধাবিত হল। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কর্নেলিয়াস হাউটম্যানের অধীনে চারটি জাহাজ ভারত-মহাসাগরে উপনীত হল। আমস্টার্ডামের ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে অ্যাডমিরাল ভ্যান নেক ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাভা ও অন্যান্য দ্বীপের স্থানীয় শাসকদের সাথে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেন। ওলন্দাজরা এসকল স্থানে পর্তুগিজদের তাদের ঘাঁটিগুলো থেকে উৎখাত করে এবং তাদের নিজস্ব বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। দেশে ফিরে যাওয়ার সময় জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যায় মশলা ও রেশম। এদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরাও বাণিজ্যজাহাজ পাঠায়। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে প্রায় পঁয়ষট্টিটি জাহাজ পূর্বদিকের উদ্দেশে যাত্রা করে।

নেদারল্যান্ডস্-এর উপনিবেশ বিস্তার

বিভিন্ন ওলন্দাজ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেষপর্যন্ত সবগুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে একটি বৃহৎ কর্পোরেশন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৈরী হয় ডাচ পূর্ব-ভারতীয় কোম্পানী (The Dutch East Indies)। নেদারল্যান্ডস-এর সাধারণ পরিষদের কাছ থেকে কোম্পানি পূর্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করে। ওলন্দাজ সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানিকে যে-কোনো দেশে যুদ্ধঘোষণার, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের, যুদ্ধজাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েনের, উপনিবেশ স্থাপনের ও দুর্গ নির্মাণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু যে-কোনো সময়ে কোম্পানির সর্বময় ক্ষমতাগ্রহণের অধিকার সাধারণ পরিষদের থাকবে। কোম্পানির পরিচালক ছিলেন ষাটজন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা সতেরোজন প্রধান পরিচালক নিয়ে গঠিত Council of Seventeen-এর হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রতি বৎসর কখন, কী আকারের জাহাজ রওনা হবে, কোন্ কোন্ দ্রব্য নিয়ে আসবে এবং কোথায় সেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা হবে—সবকিছু ঠিক করত কাউন্সিল।

পূর্বদেশে কোম্পানির সরকারের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হল জাভা দ্বীপের বাটাভিয়াতে। সেখানে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বোচ্চ অধিকর্তা বা গভর্নর জেনারেল বাস করতেন এবং সেখান থেকে তিনি পূর্বদেশের ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে (সেলিবিস, এম্বোয়ানা, বান্দা, টার্নেট, মাকাসার, মালাক্কা, করোমন্ডল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ নিয়ে গঠিত) শাসন করতেন।

পরপর নিযুক্ত কয়েকজন উৎসাহী ও কর্মদক্ষ গভর্নর জেনারেলের নেতৃত্বে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও সুসংহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে এর পরিধি শুধুমাত্র মলাক্কাস বা মশলার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় রাজারা যেহেতু পর্তুগিজদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন, সেহেতু তাঁরা ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে পর্তুগিজদের তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। এক রক্তক্ষয়ী

www.icsbook.info

সংঘর্ষের মাধ্যমে পর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের উৎখাত করা হয়। ওলন্দাজরা এরপর থেকে পূর্ণোদ্যমে তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তারা পর্তুগিজদের নিকট থেকে বলপূর্বক মালাক্কা অধিকার করে এবং সেই সাথে পূর্বএশিয়ার বাণিজ্যের দখল লাভ করে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তারা পর্তুগিজদের সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) থেকে ও ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে বিতাড়িত করে। এভাবে ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের তাদের পূর্বদেশের প্রায় সকল অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরমোসা দ্বীপে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে তাদের ঘাঁটি তৈরি করে। এটা তাদের পূর্বদিকে আগমনের পথে মধ্যবর্তী স্টেশন হিসাবে কাজ করে। এখান থেকে তারা বিশুদ্ধ পানি, সবজি ও মাংস সংগ্রহ করত। ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা জাপানের সাথে তাদের বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু জাপান সরকার ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ শুধুমাত্র দেশিমা দ্বীপে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেয় এবং ওলন্দাজদের উপর নানাভাবে নিগ্রহ ও বিধিনিষেধ আরোপ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও জাপানের সাথে বাণিজ্যে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশেষ লাভবান হয়। প্রথমদিকে ওলন্দাজরা তাদের মলাক্কাস দ্বীপের বাণিজ্যে ইংরেজদের অংশীদার করতে রাজি হয়। কিন্তু নিজেদের সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর ওলন্দাজরা ইংরেজদের, পর্তুগিজদের ও স্পেনীয়দের সমভাবেই উচ্ছেদ করে। মশলার দ্বীপগুলো দখলের জন্য ইংরেজদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে এ দু-জাতির মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধের সূচনা করে। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজরা মলাক্কাসে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে এবং ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও তার আশপাশেই মূলত তাদের উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে তৎপর হয়।

প্রথম থেকেই ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক মুনাফা ও সেইসাথে সরকারের জন্য সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা। কাজেই প্রথমে থেকেই তারা মশলার সরবরাহ কম করে দাম বাড়ানোর দিকেই অধিক মনোযোগী হয়। এজন্য তারা শুধু উদ্বৃত্ত মশলা পুড়িয়েই ক্ষান্ত হত না, যে-সকল এলাকার উপর তাদের সহজ কর্তৃত্ব ছিল না সে-সকল এলাকার লবঙ্গ ও জায়ফল গাছগুলোকে তারা ধ্বংস করে দিত। এ-ধরনের উপায়ে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বলপূর্বক শ্রমে নিযুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির ডিরেক্টররা মশলা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। মশলা ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যসামগ্রী, যেমন— রেশম, তুলা, মূল্যবান পাথর, উৎকৃষ্ট কাঠ প্রভৃতি থেকেও তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন হত যে তারা প্রায় দুশো বছর যাবৎ বাৎসরিক ১২$\frac{১}{২}$ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ডিভিডেন্ড প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে।

www.icsbook.info

এ শতাব্দীর প্রথমদিকে হেনরি হাডসন নামে একজন ইংরেজ নাবিক ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরি নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমদিক দিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছুবার একটি পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যে নদী দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যান (পরবর্তীতে সেটা তাঁরই নাম অনুসারে হাডসন নদী নামে পরিচিত হয়) তার আশপাশের অঞ্চলকে ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের অধিকৃত অঞ্চল বলে দাবি করেন। পাঁচ বছর পরে ওলন্দাজরা মানহাটান দ্বীপে তাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। এটার নাম দেয়া হয় নিউ আমস্টার্ডাম। এর চতুর্পার্শ্বের এলাকা নিয়ে গঠিত হয় নিউ নেদারল্যান্ড। মূলত ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুকরণেই ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও এই দু'মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার এই কোম্পানিকে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এ কোম্পানির প্রচুর আয় হতে থাকে। এ আয়ের উৎস শুধুমাত্র বাণিজ্যিক মুনাফাই নয়, এর মূল আয় হত পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে চলাচলকারী পর্তুগিজ ও স্পেনীয় জাহাজ, বিশেষত স্পেনীয় সোনা ও রুপা বহনকারী জাহাজগুলোর উপর হামলা চালিয়ে, তাদের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করে। পনেরো বছরের মধ্যে নেদারল্যান্ডস পর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের ৫৪৫টি জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। ওলন্দাজদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পর্তুগিজদের নিকট থেকে ব্রাজিলের একাংশ জোর করে দখল করে নেয়। কিন্তু পর্তুগিজরা ১৬৫৪ সালে এ অংশটি পুনরায় অধিকার করে নিতে সমর্থ হয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রাজিল ও পর্তুগিজ আফ্রিকাতে বাণিজ্য করার জন্য পর্তুগালের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের পর থেকে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক দুর্গতির সূচনা হয়। এর একমাত্র কৃতিত্ব ছিল নিউ নেদারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে এটা ছিল ওলন্দাজদের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ। ১৬৬০ সালে এর লোকসংখ্যা ছিল দশ হাজার। এর রাজধানী নিউ আমস্টার্ডাম-এর জনসংখ্যা ছিল ষোলো শত। কিন্তু ইংরেজরা কখনও নিউ নেদারল্যান্ডের উপর ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তারা বলপূর্বক এটা ওলন্দাজদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং এর নাম রাখে নিউইয়র্ক। এর পরে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র এক দশক টিকেছিল। এর পতনের মূল কারণ এই যে, এটা ওলন্দাজ সরকারের কাছ থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সমর্থন পায়নি। উপরন্তু, ওলন্দাজরা তাদের নিজেদের দেশের সহজ জীবনযাত্রা ত্যাগ করে অর্ধসভ্য উপনিবেশগুলোর কঠোর ও বিপদসংকুল পরিবেশে গিয়ে বাস করতে রাজি হত না। উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অপ্রতুলতা আমেরিকায় ওলন্দাজ উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। নেদারল্যান্ডস-এর সরকারও মূলত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই তাদের বাণিজ্য বিস্তার করতে অধিকতর ব্যস্ত ছিল।

www.icsbook.info

নেদারল্যান্ডস প্রজাতন্ত্রের অবসান

ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতনই নেদারল্যান্ডস প্রজাতন্ত্রের অবসানের প্রথম সূচনা নির্দেশ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকেই এই পতন সূচিত হয় এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পরে সেটা দ্রুততর হয়। ওলন্দাজরা যখন তাদের বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করছিল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তখন ধর্মীয় ও গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ দু-দেশেই মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হয় এবং এ দু দেশের জনগণই তাদের অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উভয়ই ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে অবলোকন করছিল। তখন ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশই বিশ্ববাণিজ্যে তার তথাকথিত ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কাজে পূর্ণোদ্যমে লেগে গেল। তাদের প্রথম কাজ হল নিজেদের জন্য পণ্যবাহী জাহাজ তৈরি করা। ফলে, এতদিন ধরে যে-শিল্প ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডরূপে গড়ে উঠেছিল সেটার পতন ঘটতে শুরু করে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ নেভিগেশন এ্যাক্ট এ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করে। এ আইনে বলা হল যে ইউরোপের কোনো দেশের পণ্য ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজ দ্বারা ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড অথবা ব্রিটিশ অধিকৃত কোনো দেশে আমদানি করা চলবে না। এভাবে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস-এর মধ্যকার সৃষ্ট তিক্ততা শেষপর্যন্ত ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে এ দু দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত করল। দুবছর ব্যাপী স্থায়ী এ যুদ্ধে ওলন্দাজরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা আরও দু বছর ধরে চলে। যদিও নৌযুদ্ধে ওলন্দাজদের দক্ষতা কম ছিল না, তথাপি তাদের পরাজয় বরণ করতে হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সারাবিশ্বে ইংল্যান্ডেরই অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ওলন্দাজ-বাণিজ্যের দুর্গতি শুরু হয়। ইংল্যান্ড রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, পর্তুগাল ও ব্রাজিলের বাণিজ্যের সিংহভাগ করায়ত্ত করে। পূর্ববর্তী দুশো বছর ধরে পর্তুগালের সাথে নেদারল্যান্ডস যে বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল, তা শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডের হাতে গিয়ে পড়ে। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও পর্তুগালের মধ্যে সম্পাদিত মেথুয়েন চুক্তি (Methouen Treaty) দ্বারা পর্তুগালের বাজার ব্রিটিশ পণ্যের জন্য খুলে দেয়া হয়। বিনিময়ে ফরাসি ও জার্মান মদের তুলনায় পর্তুগিজ মদের উপর করভার এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেয়া হয়। বাল্টিক সাগর অভিমুখে যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যা ক্রমশ কমতে লাগল। একইভাবে প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ওলন্দাজদের যে হারে কমতে শুরু করে, ইংল্যান্ড ও অন্যান্যদের সে পরিমাণে বাড়তে থাকে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পরে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অতিকষ্টে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। যেহেতু এর অভিনব বুক কিপিং পদ্ধতি একমাত্র কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসারগণ ছাড়া আর কেউ অবগত ছিলেন না এবং বাজারে এর ঋণলাভের মত ব্যবসায়িক সুনাম তখনও ছিল, সেহেতু কোম্পানি অনেকদিন পর্যন্ত বিশাল অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করে উচ্চ মুনাফা দেখাতে পেরেছে এবং ১৭৪২ সাল পর্যন্ত ডিভিডেন্ট প্রদানে

www.icsbook.info

সক্ষম হয়েছে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের পর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কোম্পানির বিপুল ঋণের বোঝা শেষপর্যন্ত নেদারল্যান্ডস সরকারকেই বহন করতে হয়।

ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অন্য ক্ষেত্রেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ইউরোপের অন্যান্য জাতির আগ্রাসনমূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ওলন্দাজ-শিল্পের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। ওলন্দাজরা যেসব পণ্য আগে তাদের জন্য তৈরি করত, তারা এখন সেসব দ্রব্য নিজেরাই তৈরি করতে শুরু করল। উপরন্তু, তারা আমদানিকৃত সকল ওলন্দাজ-পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাল। ১৬৬৪ সালে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী কোলবার্ট-এর শুল্কনীতির ফলে অনেক ওলন্দাজ সামগ্রী ফ্রান্সে নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। এই পদ্ধতি অন্যরা অবলম্বন করার ফলে নেদারল্যান্ডস ক্রমশ তার পণ্যের বাজার হারাতে বসল। ইউরোপের দেশগুলো শুধু ওলন্দাজ-পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়েই ক্ষান্ত হল না, তারা ওলন্দাজ-পণ্যের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচামাল রপ্তানির উপরও কর আরোপ করল। এর ফলে কতকগুলো পণ্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কতকগুলো একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। ওলন্দাজ সরকার নিজেও নিজের শিল্প ধ্বংসের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাবদ অর্জিত জাতীয় ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য ওলন্দাজ সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসায়। কতক ক্ষেত্রে একই পণ্যের উপর কয়েকবার শুল্ক আরোপ করা হয়। যেমন, শস্য বিক্রির সময় একবার কর ধার্য করা হত, গম থেকে তৈরি ময়দা বিক্রি করার সময় আরেক দফা খাজনা আদায় করা হত এবং ময়দা থেকে তৈরি রুটির উপর আরও একবার বিক্রিকর বসানো হত। ফলে জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেত কয়েকগুণ। কোনো কোনো মাছ থেকে তৈরী সসের উপর ত্রিশবার কর বসানো হত। এই অবস্থায় দেশীয় উৎপাদিত সামগ্রীকে বিদেশী সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হত, কারণ ওলন্দাজ সরকার আমদানি পণ্যের উপর কোনো শুল্ক ধার্য করত না। ওলন্দাজ-শিল্প পুরোপুরি ধ্বংসের সম্মুখীন হল। এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে লিডেন-এ যেখানে তিন হাজার তাঁত চলত, সেখানে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দুশো তাঁত চালু ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে একমাত্র সেসব শিল্পই টিকে ছিল, যেগুলোকে বিদেশী শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হত না।

নেদারল্যান্ডস-এর অন্যতম মৎস্যশিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দু-দশকের মধ্যে এটা দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হল। তিমিমাছ শিকারে ইংল্যান্ড ও ডেনমার্ক হল প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যরা ওলন্দাজদের একচেটিয়াভাবে অধিকৃত হেরিং মাছের বাজারে মাছ চালান দিতে লাগল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হল সুইডেন। তবে অন্যান্যরাও কম ক্ষতি করেনি। ইংল্যান্ডের অর্ধলবণাক্ত বা ধোঁয়ায় ঈষৎ শুকানো হেরিং মাছ নেদারল্যান্ডস-এর তেলজাতীয় পদার্থে ভিজিয়ে রাখা হেরিং মাছ-এর চেয়ে খদ্দেরদের কাছে অধিক উপাদেয় বলে বিবেচিত হল। কোনো কোনো দেশে ডাচ হেরিং-এর উপর কর আরোপ করা হয় এবং কোনো কোনো দেশে এর আমদানি

www.icsbook.info

একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে দুশোর কম হেরিং মাছ ধরা জাহাজ সমুদ্রে মাছ ধরত। স্বাভাবিক নিয়মে জাহাজনির্মাণ ও তৎসংলগ্ন শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাহাজনির্মাণ শিল্পকে কেন্দ্র করে যে-সকল শহর গড়ে উঠেছিল তাদের কর্মব্যস্ততা দিনে দিনে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

ওলন্দাজরা একমাত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থাটাই টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্য ও শিল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত বিপুল মুনাফার দ্বারা তারা বৃহৎ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সর্ববৃহৎ ব্যাংক আমস্টার্ডামে গড়ে উঠল। নেদারল্যান্ডস-এ এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সুবিধা না-থাকায় ওলন্দাজরা এ টাকা বাইরে ধার দিতে শুরু করল। ইউরোপের প্রায় সকল দেশই নেদারল্যান্ডস-এর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। সুদের হার ছিল অনেক। কাজেই মুনাফাও হত প্রচুর। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষের দিক থেকে যে অর্থনৈতিক দুর্দশার সূত্রপাত হয় তার প্রভাব ব্যাংকগুলোর উপরও পড়ে। একে একে নেদারল্যান্ডস-এর ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং সর্বশেষে আমস্টার্ডাম ব্যাংকও তার অফিস গোটাতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক দুর্দশা নেদারল্যান্ডস-এর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকেও খর্ব করে। সপ্তদশ শতকের ইউরোপের সর্বোচ্চ শক্তি নেদারল্যান্ডস অষ্টাদশ শতকে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে পরপর কয়েকজন শক্তিশালী স্ট্যাটহোল্ডার বা শাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়ামের মৃত্যুর পর অরেঞ্জ রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে।

www.icsbook.info

নবম অধ্যায়
ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ

ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাস মূলত ধর্মীয় সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিবৃত্তে পরিপূর্ণ। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস (১৫১৫-১৫৪৭ খ্রি.) তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরগুলোতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এই আশায় যে স্পেনের শাসক ও পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ তিনি জার্মানির লুথারপন্থী রাজাদের এবং সুইজারল্যান্ডের জুইংলিপন্থী ক্যান্টনগুলোর নিকট থেকে সাহায্যলাভ করবেন। এই ধরনের নীতি অত্যন্ত স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল, কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক।

কনকরডাট-এর ফলাফল

১৫১৬ সালে পোপের সাথে সম্পাদিত চুক্তি (Concordat) ফ্রান্সের রাজাকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মযাজকদের নিযুক্তি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছিল। অতএব এ সময়ে ধর্মবিষয়ে গির্জার কোনো ধরনের সংস্কার রাজার ক্ষমতার উপর আঘাত হিসাবই গণ্য করা হত। উপরন্তু, ফ্রান্সিস নিজেই এক রাজা, এক ধর্ম, এক আইন (Une roi, Uni foi, Une loi)-এর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি এমন কোনো ধরনের সংস্কার-এর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, যা তাঁর দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অনৈক্যের জন্ম দিতে পারে। তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে প্রথম ফ্রান্সিস ধর্মীয় সংস্কার-এর লক্ষ্যে ধাবিত সকল আন্দোলনকে বলপূর্বক দমন করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে একের পর এক রাজনির্দেশ জারি হতে লাগল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপর প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ নির্মূল করার লক্ষ্যে। এর ফলে শুরু হল প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর অকথ্য নির্যাতন।

১৫৪৭ সালে ইনকুইজিশনের আদলে একধরনের ধর্মীয় আদালত (Chamber Ardente বা জ্বলন্ত আদালত) তৈরি করে তাকে পার্লিমেন্ট অব প্যারিস-এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হল। এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মদ্রোহীদের বিচার করে শাস্তি দেয়া। ইচ্ছামতো যে-কোনো ব্যক্তিকে ধর্মদ্রোহী অ্যাখ্যা দিয়ে তাকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করার বিধান নির্দেশ করে এই ধর্মীয় আদালতটি নিজ নামকে সার্থক করল।

www.icsbook.info

প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর নির্যাতনের এই নির্মম ধারা ফ্রান্সের পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় হেনরির (১৫৪৭-১৫৫৯) রাজত্বকাল পর্যন্ত বহাল রইল। দ্বিতীয় হেনরি ফ্রান্সে ইনকুইজিশন পর্যন্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পার্লিমেন্ট অব প্যারিসের প্রবল বিরোধিতার কারণে তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারেনি।

ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে দমন করার লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও ফ্রান্সে এই মতবাদ দ্রুত প্রসারলাভ করে। এর প্রবক্তারা ছিলেন ক্যালভিনপন্থী এবং এঁদের অনুসারীদের বলা হল হিউগনো (Huguenot)। নিবেদিতপ্রাণ হিউগনোরা অতি সংগোপনে একত্রে মিলিত হতেন এবং ক্যালভিন মতবাদসম্পন্ন গ্রন্থগুলো গোপনে বিক্রি ও প্রচার করতেন। এর ফলে ক্যালভিন প্রোটেস্ট্যান্টদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫৬০ সালে তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)-তে উপনীত হয়। উচ্চ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই মূলত এদের আগমন ঘটে। নিম্নশ্রেণীর লোকরা তাদের প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মকে আশ্রয় করেই টিকে রইল। স্বয়ং ক্যালভিন তাঁর অনুসারী সমস্ত হিউগনোদের একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলে সংগঠিত করলেন। তারা ধর্মীয় প্রচারের অধিকার এবং ধর্মীয় উপাসনার অধিকার দাবি করল এবং প্রয়োজনবোধে এর জন্য লড়াই-এর সংকল্প ঘোষণা করল। ক্যাথলিকরাও বসে রইল না। উভয়পক্ষের ধর্মীয় উন্মাদনা চরমে উঠল এবং ধর্মীয় মতভেদ ফ্রান্সে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করল।

১৫৫৯ সালে দ্বিতীয় হেনরি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র–দ্বিতীয় ফ্রান্সিস (১৫৫৯–১৫৬০), নবম চার্লস (১৫৬০–১৫৭৪) এবং তৃতীয় হেনরি (১৫৭৪–১৫৮৯) একে একে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সে-সময়ে ফ্রান্সের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী রাজার শাসন, যিনি শক্তহাতে দেশের দুটি প্রতিপক্ষ ধর্মীয় দলের ধর্মোন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল তিনজন দুর্বল রাজার শাসন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ছিলেন যুগের অনুপযোগী। ফলে ফ্রান্স পুরোপুরিভাবে নিমজ্জিত হল ধর্মোন্মাদনা, নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধের অতল তলে।

প্রথম রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস-এর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। তিনি বিয়ে করেছিলেন স্কটল্যান্ডের রানি মেরি স্টুয়ার্টকে, যিনি ধর্মে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। সিংহাসনে রাজাকে বসিয়ে রেখে রাজ্যশাসন করতেন তাঁর দুই পিতৃব্য—ডিউক অব গাইজ এবং কার্ডিনাল অব লরেন। অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সিংহাসনে আরোহণের মাত্র সতেরো মাস পরে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছোটভাই নবম চার্লস পরবর্তী শাসকরূপে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁর অভিভাবিকা ছিলেন রাজমাতা ক্যাথারিন দ্য মেডিসি—ইতালির প্রখ্যাত মেডিসি পরিবার-এর বংশোদ্ভূতা।

www.icsbook.info

অত্যন্ত ক্ষমতালোভী ছিলেন এই মহিলা। ফ্রান্সের সর্বময় ক্ষমতাকে হস্তগত করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর পিতার উদ্দেশে উৎসর্গিত মেকিয়াভেলি রচিত বিখ্যাত 'প্রিন্স' (The Prince) গ্রন্থ থেকে তিনি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা হল, রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করতে নীতিশাস্ত্রকে মেনে চলার কোনোই প্রয়োজন নেই। বরং যে-কোনো ধরনের হীনকৌশল প্রয়োগ, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় এক্ষেত্রে বৈধরূপে গ্রহণ করা চলে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার হীন পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন মহামান্যা রাজমাতা ক্যাথারিন এবং ক্ষমতালাভের পর এভাবেই আমৃত্যু (১৫৮৯ খ্রি.) সেটা টিকিয়ে রেখেছিলেন একই কৌশলে।

এ উদ্দেশ্যসাধনে তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো আদর্শ বা নীতিবোধ ছিল না। প্রথমে তিনি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়পক্ষকেই দলে টানতে চেয়েছিলেন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে। দুপক্ষই তাঁকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলে শেষপর্যন্ত তিনি ক্যাথলিকদের পক্ষে যোগ দেন। হিউগনোদের শক্তি বৃদ্ধি হলে তিনি তাদের বিরোধিতা করেন কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণেই নয়, তাঁর রাজশক্তির প্রতিবন্ধক হিসেবে। দিন দিন এদের প্রতি তাঁর ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৫৬২ সালে ফ্রান্সে প্রথম ধর্মযুদ্ধ শুরু হল ক্যাথলিক ও হিউগনোদের মধ্যে। এর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল রক্ষণশীল ক্যাথলিক দলের নেতা ডিউক অব গাইজ-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ভ্যাসির হত্যাকাণ্ড। একদা ডিউক ফ্রান্সের শ্যাম্পেন অঞ্চলের মধ্যদিয়ে অতিক্রমকালে দেখতে পান যে রাজনির্দেশ অমান্য করে প্রায় ছয়/সাতশত লোক একটি ভবনে এক সমাবেশে একত্রিত হয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মসংগীত গেয়ে চলেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের সমাবেশ ভঙ্গ করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টরা তা মানতে অস্বীকার করল। ডিউক ও তাঁর দলবল জোর করে সেই ভবনে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে সমাবেশের লোকজন তাঁদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। তার একটি ডিউকের গায়ে আঘাত করে। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত ডিউক-এর পক্ষের লোকজন প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ফ্রান্সের সর্বত্র হিউগনোরা তাদের নেতা প্রিন্স অব কন্ডে এবং অ্যাডমিরাল কলিগনির নেতৃত্বে অস্ত্রধারণ করল। তাদের দমন করার সর্ববিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হল পূর্ণ বিক্রমে। এ যুদ্ধে ডিউক অব গাইজ একজন প্রোটেস্ট্যান্ট আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং রাজমাতা ক্যাথারিন সর্বসম্মতিক্রমে ক্যাথলিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

যদিও হিউগনোরা এ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড শক্তির বিরোধিতা লাভ করে, তথাপি তাদের শক্তিও কম ছিল না। বরং দিন দিনই তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ

www.icsbook.info

চালিয়েও কোনো ফললাভ না-করায় ক্যাথারিন একধরনের সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেন। ১৫৭০ সালে তিনি সেন্ট জার্মেইন-এর নির্দেশ (Edict of Saint Germain) দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় উপাসনার অধিকার, সবধরনের চাকুরিতে তাদের নিযুক্তি ছাড়াও চারটি শহরকে নিজেদের বিশেষ নিরাপত্তার স্থান হিসাবে রাখার অনুমতি প্রদান করেন। অধিকন্তু, হিউগনোদের অত্যন্ত উঁচুদরের নৈতিক মনোবল ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী নেতা অ্যাডমিরাল কলিগনিকে রাজার কাউন্সিলের সভ্যরূপে গ্রহণের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়।

অ্যাডমিরাল কলিগনিও দেশের সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং রাজাকে আরও কাছাকাছি পাওয়ার জন্য নিজের অপর একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজার ভগ্নী মার্গারিট (Marguerite)-এর সাথে হিউগনোদের অপর নেতা (কলিগনির পরেই যাঁর অবস্থান) হেনরি অব ন্যাভারের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কলিগনির উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ফ্রান্সের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিরোধ মিটিয়ে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো। রাজা এতে সম্মত হন।

বিবাহের প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু রাজা চার্লস-এর উপর অ্যাডমিরাল কলিগনির প্রভাব লক্ষ্য করে রাজমাতা ক্যাথারিন দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর ফলে রাজার উপর তাঁর নিজের প্রভাব যে বিশেষভাবে কমে যাবে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কলিগনিকে তিনি পথের কাঁটা মনে করে চিরতরে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য মনে-মনে সংকল্প গ্রহণ করেন। রানির পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপনে ঘাতক অ্যাডমিরাল কলিগনিকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজা এটা জানতে পেরে কলিগনির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করে বলেন যে, যেভাবেই হোক তিনি এই হত্যার ষড়যন্ত্রকে উদ্ঘাটিত করবেন। রাজমাতা ক্যাথারিন তাঁর নিজের হাতে এই ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে ধরা পড়বেন ভেবে দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

তিনি এখন সকল প্রোটেস্ট্যান্ট নেতাদের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে চার্লস তাঁর মাকে এই ভয়ংকর প্রস্তাব কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান, কিন্তু তাঁর মায়ের উপর্যুপরি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষমিশ্রিত বাক্যে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এই শর্তে যে একজন হিউগনো যেন রাজার কাছে নালিশ জানানোর জন্য জীবিত না থাকে। এভাবেই সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের হত্যাকাণ্ডের সূচনা হল।

রানির পরিকল্পনামতো সবকিছুই অগ্রসর হল। মার্গারিট এবং হেনরি অব ন্যাভারের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্যারিসে সকল হিউগনো-নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছেন। অবশেষে ১৫৭২ সালের ২৪ আগস্টের মধ্যরাতে (সেন্ট

www.icsbook.info

বার্থোলোমিউ দিবস) গির্জায় ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের প্রতিটি হিউগনোর বাড়িতে আততায়ীরা আক্রমণ করল। ঘুমন্ত অবস্থায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল হিউগনোকে হত্যা করা হল। ডিউক অব গাইজ, হেনরি নিজে এই হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করলেন এই উদ্দেশ্যে যেন একজন হিউগনোও রক্ষা না পায়। হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে চলল লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ। অ্যাডমিরাল কলিগনিসহ প্যারিসের প্রায় সকল হিউগনোই মারা যান। একমাত্র ডিউক অব কন্ডে এবং রাজার ভগ্নীপতি হেনরি অব ন্যাভারে এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। প্যারিসের এই হত্যাযজ্ঞ সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বমোট কত প্রোটেস্ট্যান্ট এই হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন তা কখনোই জানা যাবে না। একটি সাধারণ হিসাব অনুসারে এর সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট নির্বিশেষে সারা ইউরোপ এই হত্যাযজ্ঞের সংবাদে আতঙ্কিত ও শিহরিত হয়। এমনকি পোপ পর্যন্ত এর নিন্দা করেন। একমাত্র যিনি এই নির্মম হত্যাযজ্ঞে আনন্দিত হয়েছিলেন— তিনি হলেন স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ।

এই নির্মম ঘটনার মাত্র দুবছর পরে নবম চার্লস মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। মৃত্যুশয্যায়ও তিনি নাকি এই নির্মম হত্যাযজ্ঞকে প্রত্যক্ষ করতেন মনশ্চক্ষে, ভয়াল ও বিভীষিকাময় দৃষ্টিতে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই হত্যাযজ্ঞ, সেটা সফল হল না। অ্যাডমিরাল কলিগনি নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর স্থলে শত শত হিউগনো-নেতার আবির্ভাব ঘটল। এই হত্যাযজ্ঞ হিউগনোদের মনোবল ভেঙে দেয়ার পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে দিল। তাদের শক্তি শতগুণ বেড়ে গেল। পরবর্তী রাজা তৃতীয় হেনরির শাসনকালেই শুরু হল তিন হেনরির যুদ্ধ (War of the Three Henrys)-(১) এর এক পক্ষে রাজা তৃতীয় হেনরি– উদারপন্থী ক্যাথলিক পার্টির নেতা, (২) অন্যপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিকদের নেতা এবং হোলি লীগ-এর সংগঠক হেনরি অব গাইজ এবং (৩) তৃতীয় জন ছিলেন হেনরি অব ন্যাভারে, হিউগনোদের নেতা।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের সাহায্য নিয়ে হেনরি অব গাইজ এত শক্তিশালী হলেন যে তাঁর অবস্থান ছিল রাজার উপরে। তাঁর হাত থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রাজা তৃতীয় হেনরি তাঁকে হত্যা করলেন (১৫৮৮ খ্রি.) । তারপরে ক্যাথলিক লীগের রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি হিউগনোদের নেতা হেনরি অব ন্যাভারের সাথে হাত মেলান। একত্রে তাঁরা লীগের প্রধান ঘাঁটি প্যারিস শহরটি অবরোধ করলেন। ১৫৮৯ সালে তৃতীয় হেনরি একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর হাতে নিহত হন। হেনরির মৃত্যুর সাথে সাথে ফ্রান্সে ভ্যালয় রাজবংশের অবসান ঘটে এবং বুরবঁ রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি তাঁর ভগ্নীপতি হেনরি অব ন্যাভারেকে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং ফ্রান্সের জনগণকে

www.icsbook.info

অনুরোধ করেন তাঁকে মেনে নিতে; সেইসাথে নতুন রাজাকে অনুরোধ করেন তাঁর ধর্মমত পাল্টে ফেলার জন্য।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি

সম্রাট তৃতীয় হেনরি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ন্যাভারের হেনরিকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করে যান। ন্যাভারের হেনরি সম্রাট হয়েই 'চতুর্থ হেনরি' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্রাট তৃতীয় হেনরি'র সাথে তাঁর কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। সম্রাট তৃতীয় হেনরি ছিলেন ভ্যালয় রাজবংশের তথা ভ্যালয়-অর্লি রাজবংশের শেষ সম্রাট। আর ন্যাভারের হেনরি বা চতুর্থ হেনরি ছিলেন বুরবঁ (Bourbon) রাজবংশের প্রথম সম্রাট।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি সিংহাসন লাভের আগে প্রোটেস্ট্যান্ট বা হিউগনো মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ফরাসি জনগণ ছিল ক্যাথলিক মতাবলম্বী। এ কারণেই সম্রাট তৃতীয় হেনরি তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসি জনগণের ধর্মমত অর্থাৎ ক্যাথলিক-ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাস্তবেও ন্যাভারের হেনরি 'চতুর্থ হেনরি' নাম ধারণ করলেও, তিনি ফরাসি জনসাধারণের এক ক্ষুদ্র অংশের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। অধিকাংশ ফরাসী জনগণ একজন বিধর্মী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতে অসম্মত হয়। আবার, স্পেনের সম্রাট ২য় ফিলিপও চাননি যে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট রাজা ফ্রান্সের সিংহাসনে বসবেন। তাই দ্বিতীয় ফিলিপ একদল স্পেনীয় সৈন্যকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেন চতুর্থ হেনরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

তবে, ফরাসি জনসাধারণ স্থায়ী গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ক্রমে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে সম্রাট চতুর্থ হেনরি যদি ক্যাথলিক ধর্মমত অবলম্বন করেন তাহলে ফরাসি জনগণ তাঁকে সাগ্রহে সম্রাটরূপে স্বীকার করে নেবে। এ অবস্থায়, ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই তারিখে সেন্ট ডেনিস গির্জায় গিয়ে চতুর্থ হেনরি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট মত ত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেন। সম্রাট চতুর্থ হেনরি ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করার সাথে সাথেই ফ্রান্সের নগরগুলো একের- পর-এক তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এমনকি প্যারিসের জনমতও তাঁর পক্ষে চলে আসে। প্যারিস নগরীর দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং চতুর্থ হেনরি বীরের বেশে প্যারিসে প্রবেশ করেন। চতুর্থ হেনরি প্যারিসের স্বীকৃতিলাভের পর প্রায় সমগ্র ফ্রান্সই তাঁকে সম্রাট হিসাবে মেনে নেয়। এ অবস্থায় প্যারিসে অবস্থানরত স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী প্যারিস থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। সম্রাট চতুর্থ হেনরিও স্পেনীয় দলকে নির্বিঘ্নে ফ্রান্স থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি দেন। অবশ্য ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আরো কয়েক বছর

www.icsbook.info

পরে—১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। এ সন্ধিপত্র ভারবিন্‌স্-এর চুক্তি নামে পরিচিত হয়েছে।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি অনেক রকম ব্যক্তিগত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহজ, সরল চালচলন এবং মানবিক গুণাবলীর জন্য প্রজারা তাঁকে ভালোবাসত। তিনি অসাধারণ বাকচাতুর্যের অধিকারী ছিলেন, তর্কবিতর্কের কালে তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিতে পারতেন এবং সরস ও কৌতুকপূর্ণ কথা বলতে পারতেন। তাঁর অনেক সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিপূর্ণ মন্তব্য পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তবে তাঁর আচরণে সূক্ষ্মতার অভাব ছিল। কিন্তু তাঁর প্রখর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রাণবন্ততা প্রভৃতি গুণ তাঁর দুর্বলতাগুলোকে ঢেকে রাখত। খেলাধুলা এবং শিকারে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নারীর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজে কোনো নারীকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তিনি দিতেন না।

শাসক হিসাবে সম্রাট চতুর্থ হেনরি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ষোলো শতকে ফ্রান্স অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ঐ শতাব্দীতে স্পেনই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে (মে মাসে) স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সাথে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্থ হেনরির সম্পাদিত ভারবিন্‌স্-এর চুক্তির (Treaty of Vervins) ফলে ফ্রান্স তাৎক্ষণিকভাবে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্তিলাভ করে। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দেই (এপ্রিল মাসে) 'নানটেস্ এর ঘোষণা' (Edict of Nantes) দ্বারা চতুর্থ হেনরি হিউগনোদের প্রতি ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার প্রদান করেন। এর ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। এরপর চতুর্থ হেনরি অনেকগুলো শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন করেন। এভাবে সম্রাট চতুর্থ হেনরি (রাজত্বকাল ১৫৮৯-১৬১০ খ্রি.) তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বকালে ফ্রান্সকে এক দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে সতেরো শতকে ফ্রান্স ইউরোপের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

চতুর্থ হেনরি ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে তিনি সমগ্র ফ্রান্সের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করতে সমর্থ হননি। পরিপূর্ণ রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করার পর থেকেই চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের দুঃখদুর্দশা দূর করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ইতিপূর্বে ৩০ বছর স্থায়ী গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ফ্রান্সের কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্যব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়েছিল। ডাকাতের দল গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করে বেড়াত, বড় বড় জমিদাররাও ডাকাত বনে গিয়েছিল। সড়কপথগুলো ডাকাতের উৎপাতের ফলে বিপজ্জনক হয়ে

www.icsbook.info

উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এককথায়, ফ্রান্সের জনজীবন সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল, আর ফ্রান্সের সমাজজীবনকে কলুষিত করেছিল ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ। ফরাসিদের এরকম দুর্গতির মূল কারণ ছিল— ঐ সময়ে দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সে কোনো শক্তিশালী রাজা বা সরকারের অস্তিত্ব ছিল না, যার মাধ্যমে ফ্রান্সে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হত। তাই চতুর্থ হেনরি সম্রাট হয়েই যে দুটো মূল দায়িত্বের মুখোমুখি হলেন তা ছিল– এক. সম্রাটের রাজকীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা; এবং দুই, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকে পুনর্বাসিত করা। এ দুটো কাজ চতুর্থ হেনরি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছিলেন।

এর আগে ফ্রান্সের সম্রাট একাদশতম লুই এবং প্রথম ফ্রান্সিস যে সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ফ্রান্সের দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ তথা ধর্মীয় যুদ্ধের দ্বারা সম্রাটদের সে ক্ষমতা অনেকাংশে খর্বিত হয়েছিল। এ সময়ে জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যারন বা বড় বড় জমিদাররা সম্রাটের সর্বময় ক্ষমতার দাবিকে অস্বীকার করতে শুরু করেছিল। চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করে সম্রাট ও রাজতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমে ছোট ছোট জমিদারদের উপর বলপ্রয়োগ করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। এর পর বড় বড় জমিদারদের অর্থ, খেতাব এবং নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এভাবে জমিদাররা যে ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তাঁরা তা সম্রাটের হাতে ফিরিয়ে দেন।

প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চতুর্থ হেনরি বৃথা চিন্তা করে কালক্ষয় করেননি। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন। জনসাধারণ ও অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত এস্টেট্‌স্ জেনারেল (Estates General) সম্রাটের ইচ্ছার বিরোধিতা করার কোনো সুযোগই পায়নি, কারণ সম্রাট চতুর্থ হেনরি তাঁর সমগ্র রাজত্বকালের মধ্যে একবারও এস্টেট্‌স্ জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করেননি। বিভিন্ন নগরের পার্লামেন্টগুলোর (Parlement) উপরও তিনি পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেমন, তুলোঁ শহরের পার্লামেন্টের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই আনুগত্য দাবি করব'। প্রকৃতপক্ষে, চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে যে একটি মাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা ছিল ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে রুয়েন শহরে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সভা। এবং এ সভা শুধুমাত্র দেশের অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধাসমূহের কথা সম্রাটকে জানানোর সুযোগ পেয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়।

www.icsbook.info

ডিউক অফ সালি

পুনর্গঠনমূলক কাজে সম্রাট চতুর্থ হেনরি কয়েকজন দক্ষ সহযোগীর সহায়তা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ডিউক অফ সালি (যাঁর আসল নাম ছিল ম্যাক্সিমিলিয়েন ডি বেথুন)। সালি নিজে ছিলেন ক্যালভিনপন্থী বা হিউগনো। কিন্তু তিনি অনেক আগে থেকেই বুরবঁ বংশীয় হেনরির সহচররূপে কাজ করেছেন এবং হেনরি যখন ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিক হন তখন দেশের স্বার্থে তিনি এ কাজে হেনরিকে উৎসাহিত করেন। সম্রাট চতুর্থ হেনরি রাজদরবারের সকলের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সালিকে প্রধানমন্ত্রী করেন এবং ঐ পদেই তাঁকে অধিষ্ঠিত রাখেন। সম্রাট চতুর্থ হেনরি এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী সালি এত ঘনিষ্ঠভাবে একযোগে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন যে তাঁদের দুজনের কাজকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব।

অর্থনৈতিক বিষয়ে সালি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী না হলেও তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। অল্পকালের মধ্যেই তিনি রাজকোষে অর্থ জমা করতে সক্ষম হন। চতুর্থ হেনরি যখন সম্রাট হন তখন রাজকোষ ছিল একেবারেই শূন্য এবং রাজ-সরকার ছিল গভীর ঋণে নিমজ্জিত। ইতিপূর্বেকার দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের কালে রাজকোষের অর্থ নিঃশেষিত হয়েছিল এবং বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া সম্রাট হওয়ার পর বড় বড় জমিদারদের বশ করার জন্যও প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়েছিল। আবার, ভারবিন্‌স্‌-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ফ্রান্সকে একটা বড় সৈন্যদল পুষতে হচ্ছিল যার ব্যয়ভার নিতান্ত কম ছিল না। এসব কারণে সম্রাট চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের নিঃস্ব কৃষকদের নিকট থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাজনা ও কর পেতেন তা দিয়ে সরকারের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হত না। সালি এ অবস্থার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন।

সালির অর্থ ব্যবস্থা

ডিউক অফ সালি নতুন কোনো কর আরোপ না করে পুরোনো ব্যবস্থারই সংস্কার সাধন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চুরি, ঘুষ এবং দুর্নীতি এত ব্যাপক হারে বিস্তারলাভ করেছে যে প্রজাদের থেকে প্রাপ্ত কর ও খাজনার সিকিভাগ মাত্র রাজকোষে জমা হয়। এ অবস্থা দূর করার জন্য তিনি এমন নিখুঁত হিসাব রাখার পদ্ধতি প্রচলন করলেন যেন কোনো কর্মচারী হিসাবে ফাঁকি দিলে তা সহজেই ধরা যায়। এ ছাড়া যেসব সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তিরা এর আগে কর প্রদানের দায় থেকে অযৌক্তিকভাবে অব্যাহতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের উপর কর আরোপ করা হল। সালি দেশের সর্বত্র গমন করে সরেজমিনে তদারকি করেন। তিনি প্রাদেশিক শাসকদের বলে দেন যে তাঁরা

www.icsbook.info

যেন নিজেদের ইচ্ছামাফিক অতিরিক্ত কর আদায় না করেন এবং প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব দুর্নীতি ঘটত তা দূর করেন। এভাবে প্রশাসনিক সংস্কারসাধনের মাধ্যমে সালি ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার এতদূর উন্নতিসাধন করেন যে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই জাতীয় ঋণের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হয় এবং রাস্তাঘাট, পুল, খাল, সরকারি ভবন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পরেও রাজকোষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা সম্ভবপর হয়।

প্রধানমন্ত্রী সালি ব্যয়সংকোচ নীতি অনুসরণ করেন এবং চতুর্থ হেনরি তাঁর এ নীতি সমর্থন করেন। পূর্ববর্তী রাজাদের প্রিয়পাত্ররা অনেকে অকারণে নিয়মিত ভাতা পেতেন; প্রধানমন্ত্রী সে সকল ভাতা বন্ধ করে দেন। অনেক শিল্পীর ভাতাও কমিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাট চতুর্থ হেনরির একটা বড় কৃতিত্ব হল, তিনি ফ্রান্সের বিশাল সেনাবাহিনীর আকার কমিয়ে আনেন এবং দেশের ভিতরে শান্তি রক্ষার জন্য এবং বিদ্রোহভাবাপন্ন জমিদারদের অবদমিত রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে অনুসারে একটি ক্ষুদ্র আকৃতির সেনাবাহিনী টিকিয়ে রাখেন। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ইউরোপীয় জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য 'ইউরোপীয় রাজাদের উচ্চাশা এবং পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঈর্ষার দরুন এ পরিকল্পনা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তখনকার যুগটাই ছিল যুদ্ধ ও রাজ্য দখলের যুগ। সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে যে-প্রস্তাব সম্রাট চতুর্থ হেনরি উত্থাপন করেছিলেন তাতে সে-যুগের তুলনায় অনেক বেশিরকম প্রাগ্রসর চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল, কিন্তু সে চিন্তা ঐ যুগে বাস্তবসম্মত ছিল না।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী সালি উভয়েই অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। ফ্রান্সের সমস্ত রাজাদের মধ্যে চতুর্থ হেনরিই সম্ভবত প্রজার সম্পদ বৃদ্ধি ও কল্যাণসাধনের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বুঝতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে প্রজাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়। সম্রাট ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী উভয়েই ফ্রান্সের কৃষিসম্পদ বৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিলেন। চতুর্থ হেনরি ১৫৯৫ সালে একটি প্রাচীন প্রথার পুনঃপ্রচলন করেন। এ আইনের দ্বারা ঋণগ্রস্ত কৃষকের নিকট থেকেও তার হালের গরু-ঘোড়া বা কৃষির যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়। কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদানই এ আইনের লক্ষ্য ছিল। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য চতুর্থ হেনরি একটি আইন করেন যার বলে ফ্রান্সের কৃষকরা, অভাবের সময় ছাড়া, সব বছরেই বিদেশে অবাধে শস্য রপ্তানি করতে পারত। এর ফলে ফ্রান্সের কৃষকরা যে-বছর ফলন বেশি হত, সে বছরও উপযুক্ত মূল্যে শস্য বিক্রি করতে পারত। প্রধানমন্ত্রী সালির তত্ত্বাবধানে জমি চাষের নতুন পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো হয় এবং অনেক জলাভূমিকে পরিষ্কার করে চাষের জমি বৃদ্ধি

www.icsbook.info

করা হয়। সালি গরু-ঘোড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সে রেশমগুটির চাষের প্রচলন করেন এবং রেশমগুটির খাদ্য হিসাবে মালবেরি গাছের চাষেরও প্রবর্তন করেন। এর ফলে ফ্রান্সে অল্পকালের মধ্যেই রেশমশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পের বিকাশের জন্য চতুর্থ হেনরি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলেই ফ্রান্সের অর্থনীতির দ্রুতবিকাশ ঘটেছিল। সম্রাট চতুর্থ হেনরির আমল থেকেই প্যারিস, লিয়ন্‌স্‌ এবং মার্সেই নগরীর অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য গতিবেগের সঞ্চার হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী সালি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই ফ্রান্সের সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব এবং শিল্প-বাণিজ্যকে বাদ দিয়ে হলেও কৃষির উন্নতিসাধন করতেন। এ বিষয়ে সম্রাট চতুর্থ হেনরি ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি কৃষি, শিল্প উভয়ের বিকাশসাধনেই আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি সালিকে কৃষির উন্নতিসাধনের কাজে নিযুক্ত রেখে নিজে শিল্পের বিকাশসাধনে তৎপর হন। সম্রাট চতুর্থ হেনরি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নিজের দেশেই কাচের শৌখিন দ্রব্য, চামড়া, মখমল, রেশম ও সূতি কাপড়ের তৈরী শৌখিন ও বিলাসদ্রব্য, সোনা ও রুপার তৈরী বিলাসদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিদেশ থেকে এসব দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ করেন। চতুর্থ হেনরির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশে বিলাসদ্রব্য উৎপন্ন করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করা।

শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারসাধনের কাজে সালি চতুর্থ হেনরিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। নতুন রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা হয়। সড়কপথে মাল পরিবহন ব্যয়সাপেক্ষ বলে খাল কেটে জলপথে ও নদীপথে মাল পরিবহনের পরিকল্পনা করা হয়। তবে এ পরিকল্পনা কখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপনিবেশ স্থাপন

চতুর্থ হেনরি বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তারসাধন এবং উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রাজকোষের অর্থ দিয়ে একটা ফরাসি বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে তোলা হয়েছিল। একটি ফরাসি নৌবাহিনীও গঠন করা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্পেন যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তা ভাঙতে শুরু করল। তারপর ফ্রান্স প্রথমে ওলন্দাজদের সাথে এবং তারপরে ইংরেজদের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। ভারতীয় উপমহাদেশে ফরাসি বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ হেনরি Champlain নামক এক ব্যক্তিকে আমেরিকা মহাদেশে প্রেরণ করলেন। এই অভিযাত্রী কানাডার কুইবেক নামক স্থানে

www.icsbook.info

প্রথম ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবে আমেরিকা মহাদেশে ফরাসি উপনিবেশ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হল।

চতুর্থ হেনরি প্রথমজীবনে হিউগনো বা প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী ছিলেন, সম্রাট হওয়ার সময়ে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রান্সের জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ তখনও হিউগনো মতের অনুসারী ছিল। ১৫৯৮ সালের এপ্রিল মাসে চতুর্থ হেনরি 'নানটেস-এর ঘোষণাপত্র' নামক আইনে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এ ঘোষণাপত্র দ্বারা তিনি হিউগনোদের প্রভূত পরিমাণে ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করেন। একমাত্র প্যারিস নগরী ও তার চারপাশের এলাকা ছাড়া ফ্রান্সের অনেকগুলো অঞ্চলে তাদের গির্জা স্থাপন করার ও প্রার্থনা করার অধিকার দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাদেরকে সরকারি পদে নিযুক্তির উপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। যেসব শহরে হিউগনোদের গির্জা স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে সেসব শহরে তাদের নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার অধিকারও দেওয়া হয়। আদালতে হিউগনোরা যাতে সুবিচার পায় সে উদ্দেশ্যে আইন করা হয় যে, যেসব মামলায় ক্যাথলিক প্রতিপক্ষ থাকবে সেসব মামলার বিচার পরিচালনা করবে বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনাল– যার বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ক্যাথলিক ও হিউগনো উভয় মতের বিচারক থাকবেন। হিউগনোদের এ অধিকারও দেওয়া হয় যে লা রশেল এবং আরো প্রায় ১০০টি সুরক্ষিত নগরীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের হাতে রাখতে পারবে। হিউগনোদের এ রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের ফলে কার্যত রাষ্ট্রের ভিতরে আরেকটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং রাজকীয় ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়।

সবদিক বিচার করলে দেখা যায় যে নানটেস্-এর ঘোষণাপত্র হিউগনোদের প্রভূত পরিমাণ সুযোগসুবিধা প্রদান করেছিল। ঐ সময়ে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পটভূমিতে বিচার করলে এ ঘোষণাপত্র ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে বিবেচিত হতে পারে। তথাপি, এ ঘোষণাপত্র প্রচারিত হওয়া মাত্র ক্যাথলিক ও হিউগনো উভয় দলই এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ক্যাথলিকরা বলে যে হিউগনোদের অত্যধিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে আর হিউগনোরা বলে যে তাদের অত্যন্ত অল্প সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ঘোষণাপত্র দেখে ক্যাথলিকরা ভাবতে শুরু করে যে চতুর্থ হেনরি আন্তরিকভাবে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেননি বলেই হিউগনোদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করছেন, আর হিউগনোরা মনে করে চতুর্থ হেনরি একজন প্রাক্তন হিউগনো হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আগের ধর্মভাইদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। চতুর্থ হেনরি অবশ্য মনে করেন যে এ ঘোষণাপত্র দ্বারা ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল এবং তিনি এর বিধানসমূহকে নিজ রাজত্বকালে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন। বাস্তবিকই এ ঘোষণাপত্র দ্বারা ফরাসি সম্রাট ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে।

www.icsbook.info

১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সম্রাট চতুর্থ হেনরির উন্নয়নমূলক কাজের সুফলগুলো ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগল। সারা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল এবং ফরাসি জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটল। দেশের সমৃদ্ধি ঘটামাত্রই সম্রাট চতুর্থ হেনরি স্থির করলেন যে ফ্রান্সের দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী সাম্রাজ্য স্পেন ও অস্ট্রিয়ার ক্ষমতা খর্ব করা দরকার। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি এ দুই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার জন্য নির্ধারিত দিবসের কয়েকদিন আগে তিনি এক ধর্মোন্মাদ আততায়ীর ছোরার আঘাতে নিহত হন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ফরাসি জনগণ একজন সুযোগ্য সম্রাটের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

www.icsbook.info

দশম অধ্যায়
চতুর্থ হেনরি-পরবর্তী ফ্রান্স

১৬১০ সালে চতুর্থ হেনরির মৃত্যুর পর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব তাঁর বিধবা স্ত্রী মেরি ডি মেডিসির হাতে চলে যায়। মেরি ছিলেন ইতালির ফ্লোরেন্সের মিডিসি পরিবার থেকে আগত। নিতান্ত অযোগ্য কিন্তু অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই ভদ্রমহিলা প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী সালিকে বরখাস্ত করেন। নিজের নবমবর্ষীয় পুত্র ত্রয়োদশ লুই-এর অভিভাবকরূপে দেশের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। রানি সবসময়ে পরিবৃত থাকতেন কয়েকজন অকর্মণ্য সভাসদদের দ্বারা। রানি এবং তাঁর সভাসদবৃন্দ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। ফলে হিউগনোরা (ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট) সবসময়েই তাদের সকলকে একাধারে ভয় ও ঘৃণা করতেন। অন্যদিকে তাদের ঘৃণা করতেন ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও অভিজাতশ্রেণী যাঁরা সকলেই নিজেদের ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

মেরি ডি মেডিসির শাসনকালে চতুর্থ হেনরি কর্তৃক সঞ্চিত সকল অর্থ ও সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল এবং ফ্রান্স শীঘ্র একটি অর্থসংকটের সম্মুখীন হল। উপায়ন্তর না দেখে রানি এস্টেটস্ জেনারেল (Estates General)-এর অধিবেশন আহ্বান করলেন (১৬১৪)। ১৪৬১ সালে, একাদশ লুই-এর সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ তাঁদের ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের প্রতিবন্ধকরূপে এই সংস্থাটিকে খুব কমই গুরুত্ব দিতেন। একমাত্র প্রবল সংকট বা প্রচণ্ড রকমের অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত না হলে তাঁরা এ সংস্থার অধিবেশন আহ্বান করতেন না।

১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে এ সংস্থাটিকে যদি ঠিকমতো গুরুত্ব দেওয়া হত, তাহলে এটা হয়তো সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারত এবং ফ্রান্সে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু এর গঠনতন্ত্র ও সদস্যবৃন্দ একে সফল হতে বাধা প্রদান করেন। এর তিনটি এস্টেট–ধর্মযাজক, অভিজাত ও সাধারণ সদস্যরা পৃথক কক্ষরূপে (Chamber) আলাদা আলাদাভাবে সভায় বসতেন। ধর্মযাজক ও অভিজাত সদস্যরা কোনো খাজনা দিতেন না বা সাধারণ সদস্য (Third Estate)-দের সাথে সহযোগিতাও করতেন না। Third Estate-এর (তৃতীয় শ্রেণী) অনেক সদস্যই ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট এবং প্রথম ও

www.icsbook.info

দ্বিতীয় শ্রেণীর (ধর্মযাজক ও অভিজাত) ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এমতাবস্থায় এটা স্বাভাবিক যে ১৬১৪ সালের এস্টেটস জেনারেল-এর অধিবেশন মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল এবং প্রহসনরূপে সমাপ্ত হয়েছিল। রানির নির্দেশে সভাভবনে তালা লাগিয়ে দেয়া হল এবং এবং সকল সদস্যকে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হল। বলা হল যে রানির নির্দেশে সেখানে একটি নাচসভার আয়োজন করা হয়েছে। এর ১৭৫ বছর পরে ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে পুনরায় এস্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন বসে।

১৬১৪ সালের উপরোক্ত ঘটনার পর ফ্রান্সের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদ শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। চতুর্থ হেনরির বৈদেশিক নীতিতে আসে পরিবর্তন। চতুর্থ হেনরি স্পেনকে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। তিনি শুধু দ্বিতীয় ফিলিপের ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাই বানচাল করেনি বরং স্পেনীয় হ্যাপ্স্বুর্গদের সাথে কোনোধরনের মৈত্রী স্থাপনের পরিকল্পনাকেও এড়িয়ে যান।

অন্যদিকে মেরি ডি মেডিসি ছিলেন স্পেনপন্থী। স্পেনের আপাতশক্তি দ্বারা তিনি মোহাবিষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে তিনি এটাও ভাবতেন যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁর সংকট কাটিয়ে উঠতে স্পেন তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। তিনি ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজ পুত্র ত্রয়োদশ লুই (ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট)-এর সাথে স্পেনের রাজা তৃতীয় ফিলিপের কন্যা অ্যান অব অস্ট্রিয়ার বিবাহ স্থির করেন।

এভাবে ফরাসি বুরবঁদের স্বার্থ স্পেনীয় হ্যাপ্স্বুর্গদের নিকট বিকিয়ে দেয়া হয়।

মেরি ডি মেডিসির স্পেনপ্রীতি ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামাল এবং ফরাসি অভিজাত ও প্রোটেস্ট্যান্টদের তাঁর বিরুদ্ধে নতুন বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাল। অবশেষে ত্রয়োদশ লুই রানির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই রাজ্যক্ষমতা আপন হাতে নিয়ে রানিকে অবসরে পাঠালেন।

অবশ্য এই নতুন রাজাও রাজকার্য বাদ দিয়ে শিকার ও বিলাসব্যসনে নিমগ্ন থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর শাসনকালে ফ্রান্সের অবস্থা আরও ভালো হত—একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, যদি তিনি তাঁর মায়ের আমলেরই একজন সুযোগ্য অমাত্যকে তাঁর পার্শ্বচর হিসেবে না পেতেন। ১৬২৪ থেকে ১৬৪২–এই আঠারো বছর ফ্রান্সের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মন্ত্রী কার্ডিনাল রিশল্যু।

কার্ডিনাল রিশল্যু

রিশল্যু ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের এক সাধারণ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মযাজকরূপে তাঁর জীবন শুরু করে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি লুকোন নামের একটি

www.icsbook.info

ধর্মীয় জেলার (ডায়োসেস) চার্চের বিশপ নিযুক্ত হন। এই লুকোন-এর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৬১৪ সালের এস্টেট জেনারেল-এর সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।

যদিও এই সভা ইতিহাসে কোনো অবদান রাখতে পারেনি, তথাপি এই সভাতেই রিশল্যু তাঁর অসামান্য বাগ্মিতার দ্বারা ফ্রান্সের রানি মেরি ডি মেডিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এস্টেটস্ জেনারেল-এর সভা ভেঙে দেয়া হল। সকল প্রতিনিধিকে যাঁর যাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হল, কিন্তু রানি মেরি তাঁকে রাজকীয় কাউন্সিলে একটি পদ দান করলেন এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল পদে নিযুক্ত করলেন।

রিশল্যু অত্যধিক কুশলতা ও চাতুর্যের সাথে ফ্রান্সের সমস্যাবলীর সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং প্রথমে রানি মেরি ও পরে তাঁর পুত্র ত্রয়োদশ লুই-এর হৃদয়ে নিজের আসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হলেন। এ কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। রাজকীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সের সকল ক্ষমতার শীর্ষে নিজেকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজা ত্রয়োদশ লুই যখন রানি মেরিকে অবসরে যেতে বাধ্য করলেন তখন তিনি রিশল্যুকেও বরখাস্ত করলেন। কিন্তু পরে তিনি রিশল্যুকে পুনর্বহাল করলেন। কেননা, রিশল্যু নিজেকে এমন অপরিহার্য করে তুলেছিলেন যে তাঁকে ছাড়া রাজকার্য অচল হয়ে যাচ্ছিল। ফলে, রাজা ত্রয়োদশ লুই রিশল্যুকে পছন্দ না করলেও তাঁকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হলেন।

ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়ে রিশল্যু ১৬৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির একমাত্র নিয়ন্ত্রকরূপে বিরাজ করেন। তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। এককথায় চতুর্থ হেনরির উত্তরাধিকারী ছিলেন রিশল্যু। তিনিই ছিলেন ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা, রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ফ্রান্স চলেছে তাঁরই নির্দেশে, যদিও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট ত্রয়োদশ লুই। ফ্রান্সের সর্বস্তরের জনগণ, ছোট ও বড়, রিশল্যুকে ঘৃণা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবসময়েই চলেছে ষড়যন্ত্র। কিন্তু সেগুলো কখনো সফল হয়নি। রিশল্যুর চর ছিল সর্বত্র। তারা এসব ষড়যন্ত্রকে উদ্‌ঘাটন করত এবং নির্মম হাতে রিশল্যু ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মূল করতেন। এ ব্যাপারে উঁচুনিচু কোনও ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোসহীন। তিনি ২৬ জন ডিউক ও একজন রাজপারিষদকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং নিরলস পরিশ্রমী রাষ্ট্রনায়ক। জাঁকজমক ও বিলাসিতার প্রতি তাঁর মোহ থাকলেও ফরাসি রাজতন্ত্রের সেবক হিসাবে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে তিনি কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

রিশল্যুর উদ্দেশ্য : রিশল্যুর উদ্দেশ্য ছিল দু-প্রকার : (১) ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতার শীর্ষে রাজতন্ত্রকে স্থাপন করা; (২) ইউরোপের শীর্ষস্থানে ফ্রান্সকে স্থাপন করা।

ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় রিশল্যুর বাধা ছিল দুটি— হিউগনো এবং অভিজাতদের আধিপত্য। রিশল্যু দক্ষতার সাথে উভয়কেই দমন করেন।

www.icsbook.info

হিউগনোদের দমন : রিশল্যুর প্রথম লড়াই ছিল ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট বা হিউগনোদের বিরুদ্ধে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল হলেও রিশল্যু যতখানি ধার্মিক ছিলেন, তার থেকেও বেশি ছিলেন রাজনীতিবিদ। ধর্মীয় উন্মাদনার যুগে বাস করলেও রিশল্যু কখনও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হননি। হিউগনোদের ব্যাপারটি তিনি কখনও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেননি। তাঁদের তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরূপে দেখেছিলেন, ধর্মীয় প্রতিপক্ষরূপে নয়। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ফ্রান্সের স্বার্থে বহির্বিশ্বে ক্যাথলিকদের পরিবর্তে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাহায্য করেছিলেন।

ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যান্টরা ছিল একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল। তারা রাষ্ট্রের ভিতরে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছিল। সর্বদাই তারা ছিল অনৈক্য ও বিভেদের উৎস। রাজা চতুর্থ হেনরির নিকট থেকে নান্টেস-এর চুক্তিবলে (Edict of Nantes) হিউগনোরা লাভ করেছিল নিজস্ব সংস্থা গঠনের অধিকার। তাদের ছিল নিজস্ব সরকারি আমলা, বিচারক। এমনকি তারা পেয়েছিল কতকগুলো শহর নিজস্ব দখলে রাখার অধিকার। এদের মধ্যে প্রধান ছিল লা রশেল-এর সুরক্ষিত শহর। এসবের দ্বারাই তারা ফ্রান্স-এর রাজশক্তিকে অমান্য করার দুঃসাহস পেত। দুর্বল করে দিত ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্যকে। বিভেদের বীজ মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

রিশল্যু যদিও হিউগনোদের ধর্মীয় অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চাননি, তবুও তিনি চেয়েছিলেন যে তারা অন্তত রাজার প্রতি অনুগত থাকুক। কিন্তু ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের হিউগনো বিদ্রোহ রিশল্যুকে নির্মম হতে বাধ্য করল। তিনি তাদের কঠোর হাতে দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য প্রেরিত ইংল্যান্ডের সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছাতেই পারল না। পনেরো মাস অবরোধের পর লা রশেল দুর্গ রিশল্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করল। নান্টেস-এর চুক্তি বাতিল করা হল।

নতুন অ্যালায়-এর চুক্তি (Edict of Alais) স্বাক্ষরিত হল ফরাসি রাজা ও ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে (১৬২৯)। এর দ্বারা ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় চিন্তা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হল। কিন্তু তাদের দুর্গ বানানোর অধিকার এবং রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। সরকারি অফিস তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হল এবং তাদের প্রতিনিধিরা আদালতের পদগুলো দখলে রাখার অধিকার লাভ করল। এর ফলে "সৎ হিউগনোরা জীবনরক্ষার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা তারা লাভ করল, কিন্তু উদ্ধত হিউগনোরা সরকারকে বিব্রত করার উপায় থেকে বঞ্চিত হল।"

অভিজাতদের দমন : অভিজাতদের দমন করার কাজটি ছিল অধিকতর কঠিন, যা করতে গিয়ে রিশল্যু প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অভিজাতবৃন্দ বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসক (গভর্নর)-রূপে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁরা প্রভুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের অধিনায়কত্ব করতেন। অধিকন্তু,

www.icsbook.info

তাঁরা রাজকীয় আদেশকে বারংবার অগ্রাহ্য করতেন। সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ ছিল অভিজাতদের সাতো (Chateaux) বা দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা। এগুলোর প্রহরায় থাকত জমিদারের সশস্ত্র বাহিনী। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা এবং রাজার নির্দেশ অমান্য করার কার্যসিদ্ধিতে এগুলোকে কাজে লাগানো হত। অবশেষে রাজার সভার পারিষদবৃন্দ রিশল্যুর উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এবং রানি মেরি ডি মেডিসি ও তাঁর অপর পুত্র ডিউক অব অর্লির চক্রান্তে প্ররোচিত হয়ে প্রতি পদক্ষেপে রিশল্যুকে বাধাদান করতে থাকেন। এমন অসহ্য পরিস্থিতিতেও রিশল্যু শান্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি একের-পর-এক তাঁদের ষড়যন্ত্রগুলো উদ্ঘাটন করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিদ্রোহের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে নির্মূল করে দেয়া হল এ ব্যাপারে বিদ্রোহীরা কে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করা হয়নি। কোনরূপ করুণা বা ভীতিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। অমোঘ নিয়তির মতো তাঁর দণ্ডাদেশ নেমে আসত দণ্ডিতের উপরে।

রিশল্যু শুধুমাত্র রাজসভাসদদের দমন করেই ক্ষান্ত হননি। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক আইন জারি করে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সব সুরক্ষিত দুর্গ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। এই আইন কার্যকর করার কালে তিনি দেশের কৃষকশ্রেণী ও নগরবাসীদের সহায়তা লাভ করেছিলেন, যারা দীর্ঘকাল ধরে এইসব জমিদারদের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়েছিল।

রিশল্যু দৃঢ়তার সাথে জমিদারদের সুরক্ষিত দুর্গগুলো ভেঙে ফেলেন। এখনো ফ্রান্সের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজমান ভাঙা দুর্গ রিশল্যুর কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করছে।

শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন : রিশল্যুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ফরাসি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করা। তিনি উদ্ধত ও স্বাধীনচেতা প্রশাসকদের নিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। তাদের সরিয়ে না দিয়ে তাদের হাত থেকে বেশির ভাগ ক্ষমতা সরিয়ে নিয়ে তিনি ইনটেনড্যান্ট (Intendant) নামের একধরনের সরকারি অফিসারদের হাতে অর্পণ করেন। মধ্যশ্রেণী থেকে আগত এসব অফিসার সরাসরি রাজার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। এঁদের কাজ ছিল রাজকীয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা আদায় করা, স্থানীয় পুলিশ বা মিলিশিয়াকে সংগঠিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আদালত পরিচালনা করা। এসব অফিসারদের চাকুরি সর্বাংশে নির্ভর করত রাজার অনুগ্রহের উপর। এদের উৎপত্তি হয়েছিল এমন এক শ্রেণী থেকে যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দীর্ঘদিন রাজানুগ্রহে লালিত হয়েছিল এবং রাজার প্রতি এদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ইনটেনড্যান্টরা নিয়মিতভাবে প্যারিসে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন পাঠাত এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করত। রিশল্যুর অগণিত

www.icsbook.info

চক্ষুরূপে এরা রাজ্যের সর্বত্র সবকিছু নিরীক্ষণ করত। ইনটেনড্যান্টদের ক্ষমতা যতটা বৃদ্ধি করা হল, অভিজাত প্রশাসকদের ক্ষমতা ততটাই কমিয়ে দেয়া হল। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাত প্রশাসকদের পদগুলো অবৈতনিক পদরূপে পরিগণিত হল, যদিও সেগুলো থেকে অর্থাগম হত প্রচুর।

ইনটেনড্যান্টদের নিয়োগ ছাড়া রিশল্যু সরকারে অন্য কোনো পরিবর্তন আনেনি। প্রকৃতপক্ষে ফরাসি রাজতন্ত্র পূর্বে যা ছিল, মোটামুটি তা-ই থাকল। সে-সময়ের অন্যান্য ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের তুলনায় খুব বেশি ভিন্ন রূপ এর ছিলনা। রাজা একচ্ছত্র ছিলেন শুধু নামেই, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র তাঁর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অর্থ ছিল রাজার নামে রিশল্যুর শাসনব্যবস্থা। পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় প্রদেশগুলো, পৌরসভা, গ্রামসমূহ, আইন পরিষদ, যাজকীয় জেলাসমূহ, আধা-সামন্ত ও আধা-রাজতন্ত্রীদের প্রশাসনিক এলাকায় ইনটেনড্যান্টদের স্থানীয় প্রশাসনব্যবস্থা চালু করা হল। তবুও একথা বলা যায় যে, রিশল্যু ফ্রান্সে শাসনব্যবস্থার মূলনীতি পরিবর্তন করে সামন্তব্যবস্থার স্থলে রাজকীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে নিজের মতো করে একে রাজার অধীনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে 'দ্বৈত আনুগত্যের প্রথা'কে উচ্ছেদ করেন। রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার উপর থেকে স্থানীয় বাধাগুলোকে অপসারণ করে অর্থনীতির ও সামরিক বাহিনীর উপর রাজার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন।

তিনি ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় এস্টেটস্ জেনারেলকে উচ্ছেদ করেননি, কারণ এর কাজ ছিল মূলত করব্যবস্থা নির্ধারণ করা। কিন্তু, তিনি এর অধিবেশন ডাকতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং একে একটি অকেজো সংস্থায় পরিণত করেন।

কয়েকটি প্রদেশে যেমন, ব্রিটানি, প্রোভেন্স, বার্গান্ডি, ল্যাঙ্গোয়েডক-এ রিশল্যু স্থানীয় সরকারকে টিকিয়ে রাখলেন, কিন্তু এদের কার্যকলাপ রাজার জন্য কর-আদায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকল।

প্রকৃতপক্ষে রিশল্যুর কৃতিত্ব হল যে তিনি হিউগনোদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অভিজাত শ্রেণীর সামরিক ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নেন। তিনি ফ্রান্সে শুধুমাত্র রাজ-কোষাগার রাখার ব্যবস্থা করেন, যেখানে পূর্বে প্রত্যেক জমিদারের ছিল নিজস্ব কোষাগার। ফ্রান্সের বহুধা-বিভক্ত সামন্তবাহিনীর স্থলে সৃষ্ট হল রাজকীয় সৈন্যবাহিনী। রাজা এখন থেকে কারও কাছে তাঁর কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ নন।

রিশল্যুর অভ্যন্তরীণ নীতি ফ্রান্সে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করল। ঠিক একই সময়ে ইংল্যান্ডে বিপ্লব আর রক্তপাতের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে খর্ব করে পার্লামেন্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। রিশল্যু শক্তিশালী রাজতন্ত্রের যে ভিত্তি ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফরাসি বিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত ফ্রান্সে সেটাই টিকে ছিল।

www.icsbook.info

রিশল্যুর বৈদেশিক নীতি

রিশল্যু ছিলেন একাধারে দেশপ্রেমিক ও বুরবঁ রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক। দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি ফ্রান্সকে ইউরোপে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী, সম্মানিত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি স্পেনের আধিপত্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন। স্পেন তার উপর নির্ভরশীল দেশসমূহ, যথা : নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স কঁতে (Franche Comte) এবং ইতালির উত্তরাঞ্চল দ্বারা ফ্রান্সকে ঘিরে রেখেছিল। ত্রয়োদশ লুই-এর বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে রিশল্যু ফ্রান্সের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের আধিপত্য হ্রাস করতে এবং ইউরোপে ফ্রান্সের বুরবঁদের আধিপত্য বিস্তর করতে চেয়েছিলেন। এই উভয় পথেই কার্ডিনাল রিশল্যু ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতিকে পরিচালনা করে তৎকালীন ইউরোপে সংঘটিত ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৬১৮-১৬৪৮) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রধান শত্রু অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌সবুর্গদের ধ্বংস করাই ছিল ফ্রান্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

এজন্য যদিও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রিশল্যু ফরাসি হিউগনো বা প্রোটেস্ট্যান্টদের শক্তি প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার্থে তিনি ইউরোপের ক্যাথলিক হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্রোটেস্ট্যান্ট শক্তিগুলোকে সাহায্য করার উদ্যোগ নেন। প্রথমদিকে রিশল্যু ইউরোপে শুধুমাত্র তাদেরই উপদেশ ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করছিলেন যারা অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের বিরুদ্ধে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, যেমন জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট শাসকবৃন্দ, সুইডিশ ও ওলন্দাজ শাসকগোষ্ঠী। যখন ১৬৩৫ সালে রিশল্যুর পরোক্ষ সাহায্য এসব শাসকদের সাফল্য অর্জনে কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হল, তখন তিনি অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সরাসরি ফ্রান্সকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেন। এরপর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কখনো একের-পর-এক ফরাসি বাহিনীকে সংগঠিত ও যুদ্ধে প্রেরণ করে, কখনো হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশীয় পবিত্র রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধেও, কখনোবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্পেনীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে, কখনো ওলন্দাজ, সুইডিশ ও জার্মান প্রোটেস্ট্যান্টদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে, ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ-বিরোধী ভূমিকাকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেছেন।

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত রিশল্যু জীবিত থাকেননি। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এর ছয় বছর পরে ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সতেরো বছর পরে পিরেনিজের চুক্তির দ্বারা স্পেনের সাথে ফ্রান্সের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু রিশল্যু দেখে গিয়েছিলেন কীভাবে ইউরোপের সামরিক আধিপত্যের গতিধারা স্পেনের দিক থেকে ফ্রান্সের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছিল।

www.icsbook.info

রিশল্যুর কৃতিত্ব . রিশল্যুর কৃতিত্বের ফলে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স স্পেনের থেকে মহাশক্তিধর এক সামরিক বাহিনীর অধিকারী হয়। এটা রিশল্যুরই দক্ষতার পরিচায়ক যে ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী তুরিন ও কন্‌ডে'র মতো কয়েকজন বিখ্যাত সামরিক অধিনায়কের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এসময়ে ফরাসিবাহিনীর অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের থেকে আলসেস প্রদেশ, স্পেনীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের থেকে রুসিলন ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এটা তখনি বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, এর সাফল্যের অধিকারী হবে ফ্রান্স ও তার বুরবঁ শাসকবৃন্দ। এর জন্য গৌরবের অধিকারী হবেন কার্ডিনাল রিশল্যু।

রিশল্যু ফ্রান্সকে গৌরবের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে চূড়ান্তরূপ- দান করা ছিল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রিশল্যুর লক্ষ্য। এজন্য ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের আধিপত্য তিনি খর্ব করেছিলেন, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে। ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য —এজন্য যদিও তিনি নিজে ছিলেন উচ্চপদস্থ ক্যাথলিক ধর্মযাজক (Cardinal), বহির্বিশ্বে ক্যাথলিক হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ শাসকদের ধ্বংসসাধনে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাহায্যার্থে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদানে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির আশ্রয় নেননি— এজন্য লক্ষ্য অর্জনে তাঁর অসফলতা আসেনি।

ম্যাজারিন

ফ্রান্সের প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী রিশল্যু'র মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য জুল্‌স্‌ ম্যাজারিন (১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে) ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ম্যাজারিন জন্মসূত্রে ছিলেন ইতালীয়। পোপের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রথমে ফ্রান্সে এসেছিলেন। ১৬৩৯ সালে রিশল্যুর অধীনে কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি ফরাসি নাগরিকত্ব অর্জন করেন এবং তার দু-বছর পরে রিশল্যুর পৃষ্ঠপোষকতায় গির্জা সংস্থার কার্ডিনাল পদ লাভ করেন। ম্যাজারিন এত ভালোভাবে রিশল্যুর রাজ্যশাসন ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যে, রিশল্যু তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে সম্রাটের কাছে ম্যাজারিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য একমাত্র উপযুক্ত লোক বলে অনুমোদন করেন। রিশল্যুর মৃত্যুর মাত্র পাঁচমাস পরে সম্রাট ত্রয়োদশ লুই মৃত্যুবরণ করেন। চতুর্দশ লুই মাত্র পাঁচবছর বয়সে সম্রাট হন। তাঁর অভিভাবক হন তাঁর মা অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা অ্যান। রানিমাতা অ্যান তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ম্যাজারিনকে রাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে ম্যাজারিন রিশল্যুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অগ্রসর হন। তবে তিনি রিশল্যুর মতো কঠোর হাতে শাসন করেননি। তিনি বাধা-বিপত্তি এড়ানোর জন্য কৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

www.icsbook.info

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, ম্যাজারিনের শাসনকালে ফ্রন্ড নামক বিদ্রোহ ঘটেছিল। প্যারিসের রাস্তার দুষ্টু ছেলেরা লোকের গায়ে চামড়ার ফালির সাহায্যে কাদামটি বা ঢিল ছুড়ে মারত। ঐ যন্ত্রটার নাম ছিল ফ্রন্ড। ফ্রন্ডপন্থী বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনধরনের জনগোষ্ঠী ছিল : (১) প্যারিসের পার্লামেন্ট, যার সদস্যরা বহুদিন ধরে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার দাবি জানিয়ে আসছিল; (২) উচ্চবংশীয় অভিজাতগণ, যাঁরা ক্ষমতাশূন্য হয়ে থাকতে চাইছিলেন না; (৩) করভারে জর্জরিত জনসাধারণ। এ তিন দলের লোকই ম্যাজারিনকে ঘৃণা করতেন, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিদেশী, তদুপরি তিনি ছিলেন বিদেশী রানির প্রিয়পাত্র। তা ছাড়া ম্যাজ্যারিন এমন একটা নীতি অনুসরণ করছিলেন, যা ছিল অভিজাতদের এবং প্যারিসের পার্লামেন্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরোধী এবং জনসাধারণের প্রতি উৎপীড়নমূলক। 'ম্যাজারিনকে ঘৃণা করা তখন একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।' ম্যাজারিনকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল ফ্রন্ড বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। এ বিদ্রোহকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্রন্ড —এ দুইভাগে বিভক্ত করা চলে।

প্রথম ফ্রন্ড বিদ্রোহ : প্রথম ফ্রন্ড বিদ্রোহের মূল উদ্যোক্তা ছিল প্যারিসের পার্লামেন্ট। এটা ছিল ফ্রান্সের সর্বোচ্চ আদালত (Judicial Tribunal)। ফ্রান্সের নথিবদ্ধ আইনের সরকারি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল প্যারিসের পার্লামেন্টের উপর। প্যারিসের পার্লামেন্ট সম্রাটের প্রবর্তিত আইনকেও নথিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সম্রাটের আইনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার একধরনের বাস্তব ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে দীর্ঘকাল ধরে দাবি করে আসছিল। এখন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সাফল্য দেখে প্যারিসের পার্লামেন্টও সম্রাটের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবির স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা শুরু করে। তবে প্যারিসের পার্লামেন্ট ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের মতো কোনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না; এটা ছিল কিছুসংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট-এর একটা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী—যাঁরা অর্থের বিনিময়ে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে বিচার করার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। এই পার্লামেন্ট জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সম্রাটের স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেনি, বরং নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য সম্রাটের বিরোধিতা করেছিল। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের পার্লামেন্ট সম্রাটের অভিভাবকের (regent) একটি দাবিনামা উপস্থিত করে। এতে দাবি করা হয় যে; '(১) পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া কোনো নতুন কর আরোপ করা চলবে না এবং নতুন কোনো সরকারি পদ সৃষ্টি করা চলবে না; (২) করদাতা কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করতে হবে; (৩) ইনটেনড্যান্টদের বিলোপ করতে হবে; কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না।' এরপর ম্যাজারিন যখন পার্লামেন্টের নেতাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন তখন প্যারিসের মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলে। বিবাদ ক্রমশ গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। প্রথমে প্যারিসের

www.icsbook.info

জনতা কয়েকটা খণ্ড-লড়াইয়ে জয়লাভ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেনাপতি কন্‌ডে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে জনসাধারণের প্রতিরোধ দমন করেন। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল এক চুক্তির মাধ্যমে দুই পক্ষের লড়াইয়ের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ড বিদ্রোহ : কিন্তু এ শান্তিচুক্তি স্থায়ী হয়নি। ফ্রন্ড আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ক্ষমতা থেকে ম্যাজ্যারিনের অপসারণ। এ লক্ষ্য অর্জিত না-হওয়ায় ঐ চুক্তি ফ্রন্ড বিদ্রোহীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই প্রথম ফ্রন্ড লড়াই শেষ হওয়া মাত্র উচ্চশ্রেণী অভিজাতদের মধ্যে নতুন ফ্রন্ডের দল গড়ে ওঠে। এ দলের প্রধান নেতা ছিলেন পূর্বোক্ত কন্‌ডে (Conde)। কন্‌ডে রাজসভায় উপযুক্ত পদ না-পাওয়ার ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে বিরোধীদের দলে যোগ দেন। প্রথম ফ্রন্ডের লক্ষ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধন, কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ডের লক্ষ্য তা ছিল না। সামন্ত অভিজাতরা ফ্রান্স রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করতেও চাননি। ফ্রান্সের ডিউক, কাউন্ট, মারকুইস প্রভৃতি সামন্ত ও অভিজাত পরিবারের সদস্যরা চাইছিলেন যে ম্যাজারিনকে অপসারিত করে প্রাদেশিক শাসকের পদগুলো এবং রাজকীয় বৃত্তিসমূহ নিজেরা ভোগ দখল করবেন।

দ্বিতীয় ফ্রন্ড বিদ্রোহের শুরু হয়েছিল ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। ঐ সময়ে ম্যাজারিনের নির্দেশে কন্‌ডে এবং অন্য দুই বিদ্রোহী দলীয় নেতাকে গ্রেফতার করার ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এ বিদ্রোহে প্যারিসের পার্লামেন্ট এবং প্যারিসের জনগণের একাংশ ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে অভিজাতদের পক্ষে যোগ দেয়। এভাবে ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিটি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রথমদিকে কন্‌ডে-র নেতৃত্বে ফ্রন্ড বিদ্রোহীরা কিছুকাল প্যারিসে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু কালক্রমে যখন জনসাধারণ বুঝতে পারে যে অভিজাতরা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই তৎপর রয়েছে তখন তাদের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে উৎসাহী হয়ে ম্যাজারিন অভিজাতদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ লড়াইয়ে জেনারেল তুরন ম্যাজারিনের সাহায্য লাভ করেছিলেন। সেনাপতি তুরন ফ্রন্ড বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করে ম্যাজারিনের পক্ষের অবলম্বন করেছিলেন। তুরন-এর সাহায্য গ্রহণ করে ম্যাজারিন অভিজাতশ্রেণীর পক্ষের শক্তির উপর চূড়ান্ত বিজয়লাভ করে। ইনটেনড্যান্ট প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিসের পার্লামেন্টকে এরপর থেকে কোনোরকম রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং প্যারিসের জনসাধারণকে প্যারিসের পৌর কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফ্রন্ড বিদ্রোহ ছিল এরপর থেকে এবং ফরাসি বিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফরাসি সম্রাটের স্বৈরতন্ত্রকে সীমিত করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা।

ম্যাজারিনের ব্যর্থতা

ম্যাজারিন ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রাজার অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দমন করতে সমর্থ হন এবং ইউরোপের চোখে ফ্রান্সের সম্মান বৃদ্ধি করতে

www.icsbook.info

সক্ষম হন। কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণের অবস্থা খুবই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ম্যাজারিন ফ্রান্সের বিদ্রোহ দমনে এবং রিশল্যুর পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন বা জনসাধারণের কল্যাণসাধনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময়ই পাননি। রিশল্যুর সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি যত খারাপ ছিল ম্যাজারিনের সময়ে তার আরো অবনতি ঘটে। এদিক থেকে বিচার করলে ম্যাজারিনের প্রশাসনকালে ফ্রান্সের অবস্থার আরো একধাপ অবনতি ঘটে এবং ফ্রান্স ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের পথে আরেক পা এগিয়ে যায়।

www.icsbook.info

একাদশ অধ্যায়
ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

ইউরোপের জার্মানিতে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট মতের খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধকে উপলক্ষ করে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশবছরস্থায়ী এক ধর্মযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এসময়ে একের-পর-এক চারটি যুদ্ধ ঘটেছিল। এ চারটি যুদ্ধকে ত্রিশবছরস্থায়ী যুদ্ধের চারটি পর্ব বলে বিবেচনা করা হয়। এ চারটি পর্ব হল : বোহেমিয়ান, ডেনিশ, সুইডিশ এবং ফরাসি পর্ব। ধর্মীয় বিরোধ এ যুদ্ধের মূল কারণ হলেও, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহও এক এক পর্যায়ে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

যুদ্ধের কারণসমূহ : ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত আউগ্‌স্‌বুর্গের চুক্তির বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়পক্ষের অসন্তোষের ফলেই ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রথম যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু একবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ধর্মীয় বিরোধ ছাড়াও অন্যান্য কারণে যুদ্ধ ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। যেমন, যুদ্ধের দ্বিতীয় বা ডেনিশ আক্রমণের পর্যায়ে জার্মান সম্রাট (পবিত্র রোমান সম্রাট) ফার্ডিনান্ড-এর পক্ষ অবলম্বনকারী জমিদার ওয়ালেনস্টিন ধর্মীয় বিরোধীতার বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে জার্মান সম্রাটের শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। যুদ্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে (সুইডিশ ও ফরাসি পর্ব) ডেনমার্কের সম্রাট গুস্তাভাস এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী রিশল্যু ও ম্যাজারিন অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের শক্তি খর্ব করে নিজেদের দেশের আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেন। এ সকল কারণেই ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রথমে বোহেমিয়াতে শুরু হলেও, অতিদ্রুত এ যুদ্ধ একটি ব্যাপক ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হয় এবং সবকটি পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের তিনটি প্রধান কারণ ছিল : (১) মূল কারণ ছিল ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের তীব্র বিরোধিতা— যার নিষ্পত্তিসাধনে আউগ্‌স্‌বুর্গের চুক্তি সক্ষম হয়নি : (২) দ্বিতীয় কারণ ছিল— পবিত্র রোমান সম্রাট কর্তৃক নিজেকে জার্মানিতে প্রকৃত সম্রাটে পরিণত করার ইচ্ছা; এবং (৩)

www.icsbook.info

ইউরোপের বিভিন্ন শাসকের, যথা, ফ্রান্সের রিশল্যু, ডেনমার্কের চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান এবং সুইডেনের গুস্তাভাস এডল্‌ফাস্‌-এর নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির উচ্চাশা।

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক ও লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে যে আউগ্‌স্‌বুর্গ-এর আপোস চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রথমত, এ চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে কোনো ক্যালভিনপন্থী রাজা উপস্থিত ছিলেন না। এ চুক্তিতে তাই শুধু লুথারপন্থীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ের পর থেকে ক্যালভিনপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল এবং লুথারপন্থী (লুথেরান) প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। ক্যালভিনপন্থীরা তাই জার্মানিতে আইনগত স্বীকৃতি দাবি করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আউগ্‌স্‌বুর্গের চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের পরে (অর্থাৎ পাসাউ চুক্তির পরে) যে-সমস্ত জমি চার্চের নিকট থেকে রাজারা হস্তগত করেছেন, তা চার্চের অধিকারের বাইরেই থাকবে। কিন্তু ঐ তারিখের (১৫৫২ খ্রি.) পরবর্তীকালে সম্পাদিত জমির হস্তান্তরের বিষয়টি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। প্রোটেস্ট্যান্ট রাজারা বলেন যে, তাঁদের রাজ্যে অবস্থিত চার্চের জমি তাঁরা যে-কোনো সময়ে দখল করতে পারবেন। আর ক্যাথলিকরা বলেন যে, ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের পরে যেসব জমি ক্যাথলিক চার্চের হাত থেকে নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে। এছাড়াও 'চার্চের অধিকার' (এক্‌লেসিয়াস্‌টিকাল রিজার্ভেশন) নামক নীতির বরখেলাপও ঘটতে থাকে। পোপের এ নীতিতে বলা হয়েছিল যে, কোনো ক্যাথলিক পাদ্রি প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে গেলে তিনি ক্যাথলিক চার্চের জমি ফেরত দেবেন। কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়ার পরে তাঁর হাতে ক্যাথলিক চার্চের যে জমি ছিল তা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতেন। এ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে এবং দু পক্ষই শক্তিপ্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১৬০৮ সালে 'প্রোটেস্ট্যান্ট লীগ' নামের একটি সমিতি গঠিত হয়, কিন্তু এতে শুধু রাইনল্যান্ডের ক্যালভিনপন্থী রাষ্ট্রগুলো এবং কয়েকটি ক্যালভিনপন্থী নগর যোগ দেয়। লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টরা এ সমিতিতে যোগ দেয়নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাভারিয়ার ম্যাক্সিমিলিয়ানের নেতৃত্বে একটি ক্যাথলিক সমিতি গঠিত হয়। জার্মানির ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এ দুই দলের মধ্যে যুদ্ধের পাঁয়তারা চলতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সূত্রপাত

বোহেমিয়ান পর্ব : যুদ্ধ শুরু হয়েছিল জার্মানির বোহেমিয়া রাজ্যে। বোহেমিয়া অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের অধীনস্থ রাজ্য ছিল। হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাট ম্যাথিয়ুস ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ডকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে বোহেমিয়ার

সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যালভিনপন্থী অভিজাতরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, কারণ ফার্ডিনান্ড ছিলেন উগ্র ক্যাথলিক। এ সময়ে কতকগুলো প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। প্রোটেস্ট্যান্টরা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েও কোনো প্রতিকার না-পাওয়ায় বিদ্রোহ করে। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাগের যে-ঘরে সম্রাটের প্রতিনিধিরা সভা করছিলেন, কয়েকজন বোহেমিয়ান অভিজাত সে-ঘরে প্রবেশ করে ঐ রাজপ্রতিনিধিদের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ৬০ ফুট নিচে ফেলে দেন। এ প্রক্রিয়াটি 'ডিফেনিস্ট্রেশন' নামে পরিচিত। বোহেমিয়ানরা ম্যাথিয়ুসকে তাদের রাজা হিসাবে মানতে অস্বীকার করে। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে সম্রাট ম্যাথিয়ুসের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড সম্রাট হন। কিন্তু ঐ বছরেরই শেষদিকে বোহেমিয়ান সংসদ (ডায়েট) ফার্ডিনান্ডকে বোহেমিয়ার রাজার পদ থেকে অপসারিত করে এবং ফ্রেডারিক নামক ক্যালভিনপন্থী নেতাকে বোহেমিয়ার রাজারূপে নির্বাচিত করে। ফ্রেডারিক ছিলেন প্যালাটিনেট রাজ্যের অধিবাসী এবং পবিত্র রোমান সম্রাটের অন্যতম নির্বাচক। সম্রাট ফার্ডিনান্ড অবশ্য খুব সহজেই ফ্রেডারিককে পরাজিত করেন (১৬২০ খ্রি.) এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের দমন করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

ডেনিশ পর্ব : বোহেমিয়ায় ফার্ডিনান্ডের সাফল্যে জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্টরা ভীত হয়ে পড়ে। এ সময়ে ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্টদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজে লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন, কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর অনেক ভূ-সম্পত্তি জার্মানিতে ছিল যেগুলো রক্ষা করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। ফলে ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়াও, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে, ডেনমার্কের রাজা ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রবেশ করলেন। এ সময়ে ইংল্যান্ডও তাঁকে, জার্মানি আক্রমণ করার শর্তে, মাসে ৩০ হাজার পাউন্ড দেওয়ার প্রস্তাব করল। ডেনমার্কের রাজা ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি আক্রমণ করলেন। কিন্তু ওয়ালেনস্টিন নামক একজন বোহেমিয়ান অভিজাত সম্রাটের পক্ষ হয়ে সৈন্যদল গঠন করে ডেনমার্কের রাজাকে জার্মানি থেকে বিতাড়িত করেন। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ডেনিশ-পর্বের অবসান ঘটে।

নিজের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সম্রাট দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দেই 'সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আদেশ' (এডিক্ট অফ রেস্টিটিউশন) নামে একটি নির্দেশ জারি করেন। এর দ্বারা ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের পরে ক্যাথলিক চার্চের যত জমিজমা প্রোটেস্ট্যান্ট রাজা-জমিদাররা গ্রহণ করেছিলেন তা ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর বছর আগে যেসব জমি, সম্পত্তি ও শহর প্রোটেস্ট্যান্টদের হস্তগত হয়েছিল, সেগুলো ক্যাথলিকরা ফিরিয়ে নিতে শুরু করল। এতে শুধু-যে জার্মানির অভিজাত প্রোটেস্ট্যান্টরা উদ্বিগ্ন হল, তাই না, সুইডেনের রাজা গুস্তাভাস এডলফাসও জার্মানির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এলেন। এভাবে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সুইডিশ পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটল।

www.icsbook.info

সুইডিশ পর্ব : সুইডেনের রাজা গুস্তাভাস এডলফাস (Gustavus Adolphus) জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্টদের মিত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্য বিস্তারেও আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে এডলফাস ডেনমার্ক, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার সাথে আঠারো বছর ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, এখন জার্মানির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রিশল্যুর প্ররোচনায় তিনি ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিকে আক্রমণ করলেন। রিশল্যু নিজে ক্যাথলিক হলেও ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থে তিনি জার্মানির ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চাইলেন। তিনি চাইলেন যে জার্মানি যেন কোনো ক্যাথলিকের নেতৃত্বেও ঐক্যবদ্ধ না হয়। সুইডিস রাজা এডলফাসকে তিনি এ শর্তে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন যে, এডলফাস জার্মানিতে ২৬ হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখবেন এবং জার্মানিতে ক্যাথলিক ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রোটেস্ট্যান্ট রাজা এডলফাস এ শর্তে ফ্রান্সের অর্থসাহায্য গ্রহণ করলেন। এভাবে রাজনৈতিক কারণসমূহ ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করল।

সুইডিশ রাজা জার্মান সেনাপতি টিলিকে পরাজিত ও আহত করলেন এবং টিলি এ আঘাতের ফলে মারাও গেলেন। তখন সম্রাট বরখাস্তকৃত সেনাপতি ওয়ালেনস্টিনকে আবার ডেকে আনলেন সুইডিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। যুদ্ধে সুইডিশরা জয়লাভ করলেও, রাজা গুস্তাভাস যুদ্ধে নিহত হলেন (১৬৩২ খ্রি.)। এরপর এ দীর্ঘস্থায়ী ধর্মযুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাগে ক্যাথলিকপন্থী সম্রাট এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের কিছুসংখ্যক রাজার মধ্যে একটা শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ফ্রান্স বাধা দেওয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। সম্রাটের শক্তি খর্ব করার জন্য রিশল্যু ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে ফরাসি সৈন্য পাঠালেন। এভাবে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সুইডিশ পর্ব শেষ হল।

ফরাসি পর্ব : ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষপর্ব বা ফরাসিপর্ব ১৬৩৫ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ফ্রান্সের বুরবঁ রাজবংশের রাজা শুধু অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশীয় রাজা এবং পবিত্র রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেননি, সম্রাটের মিত্র ও আত্মীয়বংশ অর্থাৎ স্পেনের হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশীয় রাজা চতুর্থ ফিলিপের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড-এর মৃত্যুর পর সম্রাট তৃতীয় ফার্ডিনান্ড পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ফরাসিরা স্পেনীয়দের পর্যুদস্ত করার পরে জার্মানিতে বেশি করে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে। এ অবস্থায় সাতবছর ধরে শান্তি আলোচনার পর ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধমান শক্তিগুলোর মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা 'ওয়েস্টফেলিয়ান চুক্তি' (Treaty of Westphalia) নামে খ্যাত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত স্থায়ী 'ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের' সমাপ্তি ঘটেছিল। এ যুদ্ধ ধর্মীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট ও

www.icsbook.info

ক্যাথলিকদের ধর্মীয় বিবাদ ছাড়াও, ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতকেও এই যুদ্ধের কারণ হিসাবে গণ্য করা চলে। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের দ্বিতীয় অর্ধাংশের প্রায় পুরোটাই (তেরো বছর) ব্যয়িত হয়েছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ (অস্ট্রিয়া ও স্পেনের) রাজবংশের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকপন্থী ফরাসি বুরবঁ সম্রাটের যুদ্ধ-অভিযানে। আর প্রথম অর্ধাংশের সতেরো বছরের বেশির ভাগ সময় ব্যয়িত হয়েছিল অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশীয় রাজা ও পবিত্র রোমান সম্রাট কর্তৃক নিজেকে জার্মানিতে সত্যিকার সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায়। তাই ত্রিশবর্ষব্যাপী ধর্মীয়যুদ্ধে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তিনটি কারণই কার্যকর হয়েছিল।

যুদ্ধের ফলাফল

(ক) ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি : ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির (১৬৪৮) মাধ্যমে।

এ চুক্তির দ্বারা অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গরা তাঁদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজ্যগুলো, যেমন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়া ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারালেন। এ চুক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো নীতিগত পরিবর্তন এনেছিল। যেমন 'রাজার ধর্মই হবে প্রজার ধর্ম' (Cujus regio ejus religio)—এই নীতিকে মেনে নিয়ে প্রত্যেক শাসককেই তাঁর রাজ্যের ধর্মসহ অন্যান্য সকল বিষয়ের অধিকর্তারূপে ঘোষণা করা হল। প্রজারা রাজার ধর্মকে মেনে নেবেন, অন্যথায় পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় খুঁজে নেবেন। জার্মানির প্রতিটি শাসক নিজের খুশিমতো সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকেই যে কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের অধিকারপ্রাপ্ত হলেন।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সীমান্ত সম্বন্ধে যে- রূপরেখা এ চুক্তির দ্বারা নির্ণীত হল, তা নিম্নরূপ :

(১) ফ্রান্স পেল মেজ, টুল ও ভার্দুন এবং মুক্ত শহর স্ট্র্যাসবুর্গ ব্যতীত সমগ্র অ্যালসেস প্রদেশ।

(২) সুইডেন পেল পশ্চিম পোমারেনিয়া এবং এভাবে লাভ করল ওডার নদীর প্রবেশাংশের উপর নিয়ন্ত্রণ। সে আরও পেল ব্রিমেন-এর বিশপরিক এবং এলব্‌ ও ওয়েডার নদীর সম্মুখভাগের উপর দখলদারি। এভাবে জার্মানির ভূখণ্ডে ফ্রান্স ও সুইডেনকে নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়ে জার্মান ডায়েট (Diet)-এ তাদের ভোটে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হল এবং একইভাবে জার্মানির ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপেরও সুযোগ করে দেওয়া হল।

www.icsbook.info

(৩) ব্রান্ডেনবুর্গকে দেওয়া হল পূর্ব পোমারেনিয়া এবং মাগডেবুর্গসহ কয়েকটি বিশপরিকের (বিশপ শাসিত রাজ্য) উপর নিয়ন্ত্রণ।

(৪) প্যালাটিনেট রাজ্যকে দু ভাগ করে ব্যাভারিয়ার ম্যাক্সিমিলিয়ান এবং সিংহাসনচ্যুত ফ্রেডারিক-এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। ব্যাভারিয়া ও প্যালাটিনেটকে এখন থেকে একটি রাজ্য বলে ঘোষণা করা হল এবং তাকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হল।

(৫) সুইজারল্যান্ডকে অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ এবং উত্তর নেদারল্যান্ডসকে স্পেনীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গদের অধীনতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ঘোষণা করে তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হল।

ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সেটা হল : (ক) ক্যালভিনপন্থীরা লুথারপন্থীদের সমতুল্য ধর্মীয় ও অন্যবিধ অধিকারপ্রাপ্ত হবেন। (খ) ১৬২৪ সালের প্রারম্ভের পূর্বে যে-সম্পত্তি যে ক্যাথলিক অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার দখলে ছিল, তারই দখলে থাকবে। (গ) সম্রাটের বিচারসভায় সমানসংখ্যক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিচারক অংশগ্রহণ করবেন।

এখানে আরও ঘোষণা করা হল যে এরপর ইউরোপের জনগণ ধর্ম নিয়ে আর কোনো যুদ্ধ করবে না। যদি যুদ্ধ একান্তই বাধে, সেটা হবে রাজনৈতিক কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়।

(খ) মূল্যায়ন : আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এটা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে কুখ্যাত ধর্মীয় যুদ্ধ। যদিও এটা প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার যুদ্ধ হিসাবে শুরু হয়েছিল, এর মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। এটা শেষ হয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ ও বুরবঁ রাজবংশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসাবে, যাঁরা উভয়েই ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এবং উভয়েই রাজনীতি নিয়েই ছিলেন অধিক আগ্রহী। যুদ্ধ চলাকালে যেভাবে ব্রান্ডেনবুর্গের একজন প্রোটেস্ট্যান্ট রাজা ক্যাথলিক জার্মান সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন, ঠিক একইভাবে ফ্রান্সের একজন ক্যাথলিক কার্ডিনাল শাসক (রিশল্যু) সাহায্য করলেন জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট রাজাদের। উভয় দৃষ্টান্তই প্রমাণ করল ধর্ম নয়, শেষপর্যন্ত রাজনীতিই ছিল সকল ঘটনার মূলে।

(গ) আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি : ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যবহারই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ শতকের ইতালির নগররাষ্ট্রের অধিপতিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির জন্ম হয় এবং ষোড়শ শতক থেকে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য রাজ্যের রাজারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে এ

www.icsbook.info

ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগান। কিন্তু যতদিন পবিত্র রোমান সম্রাট নিজেকে তত্ত্বগতভাবে এবং প্রকৃত অর্থে সকল রাজ্যের অধিপতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতেন এবং এ দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ততদিন এ ব্যবস্থা তেমন কার্যকর হয়নি। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ পবিত্র রোমান সম্রাটকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন, হল্যান্ড-এর রাজাদের সমস্তরে নামিয়ে দিলেই প্রকৃত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইউরোপে গড়ে ওঠে। সকল রাষ্ট্রই সমান এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম—এ নীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যদিও একথা সত্য যে, কোনো রাষ্ট্র ছিল বড়, কোনোটা বা ছোট। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রণয়নে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং তাদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ কংগ্রেসগুলোর যথেষ্ট অবদান ছিল। ওয়েস্টেফেলিয়ার চুক্তিই এ পথ দেখিয়েছিল।

(ঘ) আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম : ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আরেকটি বিশেষ অবদান হল আন্তর্জাতিক আইনের উৎপত্তি। এ যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষীদের যুদ্ধে অসামরিক জনগণের সর্বস্বান্ত হওয়া, তাদের বাড়িঘর পুড়ে যাওয়া, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করেও আগ্রাসী সেনাবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে হত বা আহত হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন বিখ্যাত ওলন্দাজ মানবতাবাদী হিউগো গ্রোটিয়াস। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *On the Laws of War and Peace* আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থ এবং এটি ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়েই লিখিত হয়। তাঁর নিজের দেশে ক্যালভিনের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৬১৯ সালে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে প্যারিসে যান এবং সেখানেই এই বইটি প্রকাশ করেন। যুদ্ধ ও শান্তিকালে আন্তর্জাতিক আইন কী হওয়া উচিত সে-বিষয়ে হিউগো গ্রোটিয়াস-ই ইতিহাসে প্রথম পথপ্রদর্শক।

উপরোক্ত দুটি বিষয়—আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম ছাড়াও ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের একটি প্রধান ফলাফল হল জার্মানির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি—রাজনৈতিক ও বিশেষ করে অর্থনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে জার্মানিতে পবিত্র রোমান সম্রাট একটি নগণ্য শক্তিতে পরিণত হলেন। ফলে, জার্মানি একটি চরম অনৈক্যের প্রতীকে পরিণত হল। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে জার্মানি নামেমাত্র টিকে রইল, যাদের রাজাদের পারস্পরিক ঈর্ষা, কলহ শুধুমাত্র তাদের বিদেশী শক্তিদের ক্রীড়ণকে পরিণত করল। জার্মানির একতাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি উনিশ শতক পর্যন্ত মুলতবি হয়ে রইল।

অর্থনৈতিকভাবে জার্মানির ক্ষতি হল অপরিসীম। একের-পর-এক বিদেশী সেনাদল এ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে পরপর অভিযান চালিয়েছে। এদের আগ্রাসনে গ্রামের-

www.icsbook.info

পর-গ্রাম, ফসলের মাঠ, শহর, জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এগুলো বাসস্থান হয়েছে শৃগাল ও নেকড়ের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নাম নিশানা মুছে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নিয়েছে ওলন্দাজ ও ফরাসিরা।

সবচেয়ে অবক্ষয় ঘটেছে নৈতিকতার দিক দিয়ে। যে দেশে বছরের-পর-বছর যুদ্ধ চলে, যে দেশের জনগণ বারবার বিভিন্ন সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের শিকার হয়, সে দেশের মানুষের নৈতিকতা বলে কিছু থাকে না। জার্মানিতে সেটাই ঘটেছিল।

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ জার্মানির জনগণের সকল মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে তাদের পরিণত করেছিল সামরিক শক্তির পূজারীরূপে। ফলে অতি সহজেই তারা প্রুশিয়ার সামরিক জঙ্গিবাদের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়।

www.icsbook.info